শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

ডেভিড্ হেয়ার শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণাগারের
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম.এ. (লণ্ডন),
এ.বি.পি.এস. (লণ্ডন)

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২
১৯৬১

প্রকাশক—শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
এম. আই. প্রেস
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫

উৎসর্গ

শ্রীমতি সুরুচি চৌধুরী
করকমলেষু।

ভূমিকা

বর্তমান কালে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা গতানুগতিকতার উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য-কারণ নির্ণয় করিয়া শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় পদক্ষেপ করিতে হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানগুলির মত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাকার্যে সংশ্লিষ্ট সকলেরই অন্ততঃ কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শিক্ষকদের পক্ষে ত ইহা অপরিহার্য।

জনৈক মার্কিন শিক্ষাবিদ্, তাঁহার অধুনা প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকায় সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরে প্রচুর পরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সামান্যতম মাত্র প্রয়োগ হইতেছে; ইহা গুরুতর অপরাধ (crime)। প্রয়োগ ত দূরের কথা, আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞানগুলি পর্যন্ত এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতিগুলির আলোচনা প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিতে করা হইত। অধুনা ঐ নীতিগুলির আলোচনা সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে করা হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন শিক্ষার মূল নীতিগুলিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এখনও শিক্ষানীতির আলোচনায় উপরোক্ত আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তাই যাঁহারা ভবিষ্যতে শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, যাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সরল ভাষায়, আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষাদান প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করণের মূলনীতি সম্বন্ধে একখানা পুস্তকের প্রয়োজন অনুভব করি। বিশ বৎসরের অধিক-কাল শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ এই প্রয়োজনের প্রতি আমার দৃষ্টি অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার পরম স্নেহাস্পদা ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তার সহযোগিতায় 'শিক্ষানীতি' নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রী মহলে সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা আমার আশানুরূপ হয় নাই। তাই নূতন নাম দিয়া শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে একখানি নূতন পুস্তক লিখিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আলোচ্য বিষয় মোটামুটি এক হইলেও পূর্বের পুস্তকখানি অপেক্ষা বর্তমান পুস্তকখানিকে সর্ববিষয়েই উৎকৃষ্টতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করিতেছি যে, শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং বি. এ. (এডুকেশন্) ক্লাসের ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। পিতা, মাতা বা অপর কেহ যদি শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া ভরসা করি।

পুস্তকখানি আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিরও বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করিতেছি। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কিউমিলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার জন্য এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। উভয়বিধ কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিয়া দেখিতেছি যে, কার্যকরী বিস্তারিত জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ঐ কার্য দুইটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। কিউমিলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করণ সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিস্তারিত কার্যকরী আলোচনা করা হইয়াছে ; ইহার সাহায্যে বিদ্যালয়গুলি উভয়বিধ কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১
লেক্‌প্লেস, কলিকাতা।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বলিতে কি বুঝি

শিক্ষার ব্যাপকতা—শিক্ষা সভ্যতার মতই প্রাচীন। শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ব্যবহারগত সাদৃশ্য থাকে (ঐ সাদৃশ্যই সমাজ-জীবনের ভিত্তি) তাহা প্রধানতঃ শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। কাজেই সমাজ-জীবনের আরম্ভ এবং শিক্ষার আরম্ভ একসঙ্গে হইয়াছে, একথা বলা চলে। অবশ্য প্রাচীনতম সমাজে এখনকার মত বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষালাভ বাস্তবধর্মী ছিল এবং অধিকাংশক্ষেত্রে মাতা-পিতাই সন্তানকে শিক্ষা দিতেন। সমাজের দিক ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তির দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, শিক্ষা মানুষের ব্যাপকতম কর্মের মধ্যে অন্যতম। মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষাকার্য চলিতে থাকে। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই হয় আমাদিগকে নূতন শিক্ষা দেয় আর না হয় ত পুরাতন শিক্ষাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে সাহায্য করে। সমগ্র মনুষ্য-জীবন শিক্ষারই ইতিহাস। শিশু জন্মগ্রহণ করে, হাসিতে শিখে, কাঁদিতে শিখে, ভালবাসে, ভয় পায় এবং একটু একটু করিয়া কথা বলিতে পারে ; কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ এসব জ্ঞানও তাহার কিছু কিছু হয় ; বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত বিভিন্ন কৌশল সে আয়ত্ত করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পরও শিক্ষার শেষ হয় না ; জ্ঞান সঞ্চয়ন, কৌশল আয়ত্তকরণ, চারিত্রিক গুণাবলীর পরিবর্তন প্রভৃতি সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই চলে। মোটকথা যতদিন মানুষের জীবনকাল ততদিনই তাহার শিক্ষাকাল। পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের দিক হইতে শিক্ষায় মানুষে মানুষে প্রচুর পার্থক্য থাকিলেও এমন কোন মানুষ নাই যে কখনও শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। যে কখনও বর্ণমালা চোখেও দেখে নাই তাহাকেও শিক্ষাহীন বলা যাইতে পারে না ; হয়ত সে অনেক গ্রন্থকীট অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার অধিকারী। আর একদিক দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, সংসারে এমন কোন মানুষ নাই যে কোন না কোন প্রকারে

অপরকে শিক্ষাকার্যে সাহায্য করে নাই। জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক আমরা সব সময়েই পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত করিয়া আসিতেছি; অনেক সময় জ্ঞাতসারেই আমরা উপদেশাদির দ্বারা অপরকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। শিক্ষা এত প্রাচীন এবং সর্বজনীন বলিয়াই হয়ত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক রহিয়াছে। তাই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইতে হইলে "শিক্ষা" শব্দটি বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি তাহা পর্যালোচনা করিয়া এসম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিতে হইবে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ—বিদ্যালয়ের কার্য এবং শিক্ষাকে অভিন্ন মনে করা আমাদের এক বড় ভ্রান্তি। সমাজের শুরুতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়) ছিল না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হওয়ার পর বিশেষ করিয়া "লেখা" ও "পড়া" এই দুইটি কৌশল শিখানোর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধি যত বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই সে তাহা (বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য) লেখ্য ভাষার সাহায্যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ছাপান পুস্তক সহজেই সকলের হাতে পৌছান সম্ভব হইল। বিদ্যালয় "লেখা" ও "পড়া" শিক্ষাদানের সঙ্গে ঐসব সঞ্চিত জ্ঞান (অভিজ্ঞতা) পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। বিদ্যালয়ে যেসব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়, বিশ্লেষণ করিলে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে, জ্ঞান (Knowledge) এবং কৌশল (Skill)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের কোথায় কোথায় তূলার চাষ হয় ইহা যখন আমরা পুস্তকে পড়িতেছি তখন আমাদের জ্ঞান সঞ্চিত হইতেছে, আবার আমরা যখন মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছি তখন একটি কৌশল আয়ত্ত করিতেছি। "লেখা" ও "পড়া" শিক্ষা, যোগ-বিয়োগ কষা শিক্ষা প্রভৃতিও কৌশল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিদ্যালয় ছাত্রদিগকে জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। বিদ্যালয় স্থাপনের পর সমাজে বিদ্যালয়ের মর্যাদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই আমরা শিক্ষা আখ্যা দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে আমরা বিনা দ্বিধায় অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকি। ইংরেজী 'এডুকেশন' (Education) শব্দের বাংলা অর্থ হইতেছে

শিক্ষা ; ইহা ল্যাটিন ভাষা হইতে আসিয়াছে ; ইহার বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করা। বিদ্যালয়ের কার্য এবং শিক্ষাকে অভিন্ন মনে করার দরুণই এডুকেশন শব্দের ঐ ধরণের অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করাকে শিক্ষা আখ্যা দিলে শিক্ষা শব্দটিকে যে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের নিকট শিক্ষা শব্দের অর্থ—নানাকারণে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুণ শিক্ষা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে সংকীর্ণতর হইয়া কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থিগণ শিক্ষালাভের জন্য তপোবনে গুরুগৃহে বাস করিতেন। তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং গুরুগৃহের সাধারণ জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন জীবনে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করিতেন। অধ্যয়ন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উভয়কেই শিক্ষালাভের উপায় বলিয়া জ্ঞান করা হইত। এইভাবে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান যখন জীবনের অংশরূপে পরিণত হইত গুরু তখন শিক্ষার্থীকে সমাবর্তন দিতেন—অর্থাৎ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সামাজিক জীবন-যাপনের উপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গুরু ঘোষণা করিতেন। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার অধঃপতনের ফলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর নিকট অর্থহীন হইয়া পড়ে ; শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ নষ্ট হইয়া যায় ; ঐ জ্ঞান দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের সহিতও সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন মুখস্থ বিদ্যায় পর্যবসিত হয়। "আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরীয়সী" কথাটাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

মুসলমানগণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়া ইসলামিক শিক্ষার (মক্তব ও মাদ্রাসা) প্রবর্তন করেন। কিন্তু ভারতের সমাজ-জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। রাজসরকারে চাকুরী লাভের এবং ইসলামধর্মের অনুশাসন-গুলি জানিবার জন্য লোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিত।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পরও এই অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইলেও তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের সহিত উহার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। চাকুরীলাভের আশায়ই লোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। তারপর বিশেষভাবে দেশীয় শিক্ষকগণের উপরই ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দিবার ভার পড়িল ; যাঁহাদের নিজেদেরই পাশ্চাত্য

জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা শিক্ষকরূপে কার্য করার ফলে ইংরেজী শিক্ষা আরও যান্ত্রিক হইয়া পড়িল। অপরদিকে ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা টোল বা মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা হইতে অনেক বেশী বিধিবদ্ধ; কোন্ কোন্ জ্ঞান ছাত্র-দিগকে অর্জন করিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া বিষয় (Subjects) অনুসারে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; বিদ্যালয়ের পাঠশেষে আশানুরূপ শিক্ষালাভ হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং ঐ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে কর্মপ্রার্থীকে কর্মে নিযুক্ত করা হইতেছে। একদিকে অর্থহীন শিক্ষা অপর দিকে তাহা আবার অত্যন্ত বিধিবদ্ধ (Systematic), এই অবস্থায় পড়িয়া আমাদের দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে তোতাবৃত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থহীন শিক্ষা এবং ছাত্রদের তোতাবৃত্তি (Parrot learning) করিবার অভ্যাসের অপকারিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা কি এক—শিক্ষার সংকীর্ণতম অর্থ হইতেছে পুস্তক হইতে নির্দিষ্ট জ্ঞান মুখস্থ করা। দীর্ঘদিনের সংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আজও শিক্ষাকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ-পদ্ধতি, শিক্ষা সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাকেই সমর্থন করে। কিন্তু নিছক জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষা একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। জীবনে যে জ্ঞানের প্রয়োগ নাই—তাহাকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। ধরা যাউক, স্বাস্থ্যবিদ্যার পুস্তক হইতে খাদ্য হিসাবে অধিক পরিমাণ আলু গ্রহণের অপকারিতা মুখস্থ করিলাম, কিন্তু প্রত্যেক বেলা আলু ছাড়া অন্য কোন তরকারী হয়ত আমি খাই না; ভূগোল পড়িবার কালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত সবগুলি স্টেশনের নাম হয়ত মুখস্থ করিলাম, কিন্তু কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে হইলে কোন্ স্টেশনে গিয়া টিকিট কাটিব তাহা স্থির করিতে পারি না। ইহাকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষা এক নহে; জ্ঞানার্জন শিক্ষালাভের একটি উপায় মাত্র; অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের পরিবর্তনই প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞানার্জন এক ধরণের অভিজ্ঞতা মাত্র; এই অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষার্থীর ব্যবহারের পরিবর্তন না ঘটিলে উহা শিক্ষা আখ্যা পাইতে পারে না। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউয়ী (John Dewey) দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, (ক) নিষ্ক্রিয় জ্ঞান এবং (খ) সক্রিয় জ্ঞান। তোতাবৃত্তি দ্বারা শুধু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানই অর্জন

করা যায় ; ঐ জ্ঞান মনকে ভারাক্রান্ত করে ; কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার করা চলে না। ফলে, ঐ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান আমাদিগকে "পণ্ডিত মূর্খে" পরিণত করে। সক্রিয় জ্ঞান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া পড়ে এবং জীবনের সব রকম প্রয়োজনেই তাহার ব্যবহার চলে ; ঐ ধরণের জ্ঞান আপনা হইতেই ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায়। ধরা যাউক, কোন শিক্ষক যদি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সক্রিয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন তবে তিনি আপনা হইতেই পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন। জ্ঞান উপলব্ধিগত হইলেই তাহা সক্রিয় হয়। আবার বলিতে হয়, জ্ঞানার্জন মাত্রেই শিক্ষা নহে ; ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অর্জন করা হয়।

কৌশল আয়ত্তকরণ (Acquiring Skill) ও শিক্ষা কি এক—জ্ঞানার্জন ব্যতীত নির্দিষ্ট কৌশল আয়ত্তকরণেও বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিয়া থাকে। যেসব কৌশল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও জ্ঞানার্জনের মত শিক্ষালাভের উপায় মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ে পঠন শিক্ষা দেওয়া হয় একটা নির্দিষ্ট পুস্তক পড়িবার জন্য নহে ; ভবিষ্যতে যে কোন লিখিত জিনিস হইতেই ছাত্র যাহাতে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে ইহাই পঠন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। কৌশল শিক্ষাদানেরও মূল উদ্দেশ্য ছাত্রের ব্যবহারের পরিবর্তন—জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে আয়ত্তীকৃত কৌশলের প্রয়োগ করিতে পারিলে তবে উহাকে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অর্জিত জ্ঞান যেমন নিষ্ক্রিয় হইতে পারে, আয়ত্তীকৃত কৌশলও তেমনি যান্ত্রিক হইতে পারে। যান্ত্রিকভাবে কৌশল আয়ত্ত করিলে তাহাতে ব্যবহারের পরিবর্তন হয় না এবং উহাকে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে না। ধরা যাউক, বিদ্যালয়ে ছাত্র যোগ অঙ্ক কষিবার কৌশল শিখিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া সে যদি ঐ কৌশলের সাহায্যে ধোপার বাড়ীতে একমাসে তাহাদের কতকগুলি কাপড় গিয়াছে তাহা বাহির করিতে না পারে, তবে যোগ অঙ্ক শিখিবার ফলে তাহার ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হইয়াছে বলা যায় না।

শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ—এতক্ষণ আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম তাহাতে মাত্র একটি বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—জ্ঞানার্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণকে শিক্ষা বলিয়া মনে করায় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছি। মুখস্থ করিয়া জ্ঞানার্জন এবং যান্ত্রিকভাবে কৌশল আয়ত্ত করিলে উহারা শিক্ষার পরিপোষক না হইয়া বরং পরিপন্থীই হয়। এই কারণেই মনীষী বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন যে,

বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন করাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। জন্ম হইতেই আরম্ভ হয় এই পরিবর্তন; শিশু ধীরে ধীরে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন হইয়া থাকে :—

১। স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ফলে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে নানারূপ ক্ষমতা স্বতঃই বিকশিত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকের সহিত তাহার তেমন যোগ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মনস্তাত্ত্বিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ব্যাঙাচির স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক ক্রিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘদিনের জন্য দমন করিয়া রাখিয়া অবশেষে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেও সে জন্মগত ক্ষমতাগুণে সাঁতার কাটিতে পারে। আবার, সুস্থ সবল শিশুকে জন্ম হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশের ফলে হাঁটিতে শিখিয়াছে।

২। মানুষের অধিকাংশ ব্যবহারের সৃষ্টিই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিদত্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা লইয়া মানুষ পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মধ্যে নূতন নূতন ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। জন্মের সংগে সংগেই মানুষের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনের তাগিদ পরিলক্ষিত হয় (ভালবাসার প্রয়োজন, ভাল আহার্যের প্রয়োজন ইত্যাদি)। ঐ প্রয়োজনগুলি নিবৃত্ত করিতে গিয়া মানুষ পারিপার্শ্বিকের সংগে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপন করে; এই পারস্পরিক সম্পর্কই তাহার পরিবর্তন ঘটায়। সে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জন করে, নূতন নূতন কৌশল আয়ত্ত করে এবং নূতন নূতন অভ্যাস গঠন করে; তাহার মধ্যে নূতন নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় এবং নূতন নূতন চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হয়। নবসৃষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে সে আবার নূতন পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয় এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে নূতন করিয়া তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন হয়। এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, পরিবর্তন, পুনর্গঠন, ইহাই প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য।

দ্বিবিধ কারণে মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যবহারের

স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনকে শিক্ষা আখ্যা না দিয়া স্বাভাবিক পরিণতি (maturity) বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু যে হাঁটিতে "শিখিল" (ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বলিয়া) ইহাকে শিক্ষা আখ্যা না দিয়া "স্বাভাবিক পরিণতি" আখ্যা দেওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আবার পারিপার্শ্বিকের সান্নিধ্যে আসিয়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু হয়ত জানিতে পারিল যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে--তারপর আগুন দেখিয়া সে সরিয়া বসিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে এই যে ব্যবহারের পরিবর্তন হইল ইহাই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপদবাচ্য।

শিক্ষা এবং জীবন একসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষালাভ পদ্ধতি ও মানব-জীবনের বিকাশের পদ্ধতি পৃথক নহে। মানব-জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জীবনের চাহিদা (needs) এবং পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টাই ইহার প্রধান অবলম্বন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পারিপার্শ্বিকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই প্রয়োজন নিবৃত্তির চেষ্টায় তাহার মধ্যে আবার নূতন প্রয়োজন জন্মায়; ঐ নূতন প্রয়োজনের তাগিদে সে আবার নূতন করিয়া পারিপার্শ্বিকের সান্নিধ্যে আসে। এইভাবেই জীবনের গতি প্রবাহিত হয়। শিক্ষার গতিও ইহা হইতে ভিন্ন নহে। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষের মধ্যে যে নূতন প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি হয় এবং তাহা নিবৃত্তি করার চেষ্টায় মানুষের মধ্যে যেসব জ্ঞান, কৌশল, অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে সেগুলিকেই শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে। যতদিন জীবন, ততদিনই শিক্ষা—তাই বলা হয়, "জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন" ("Life is education and education is life")। নান্ সাহেব (প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিক্ষাবিদ্) তাই শিক্ষাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমপর্যায়ে ফেলিয়াছেন। শিশু যে সব সম্ভাবনা লইয়া জন্মায় পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে তাহাদের পূর্ণ বিকাশেই শিক্ষার সার্থকতা। এই বিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বতঃপ্রণোদিত, স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাকার্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই—ইহা জীবনেরই ধর্ম। আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ জন ডিউয়ী পারিপার্শ্বিক কি করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি (Innate potentialities) সমাজ-

নিরপেক্ষ নহে। সামাজিক পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া তাহাদের বিকাশ ঘটে আবার সমাজ-জীবনের প্রয়োজন সাধনেই তাহাদের সার্থকতা। স্বকীয় অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এবং সমাজ লইয়াই মানুষের জীবন। পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে উভয়ের সংহত বিকাশকে আমরা শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি।

একবার কোন শিক্ষা গ্রহণ করিলে সমগ্রজীবনে সেই শিক্ষার আর কোন পরিবর্তন হইবে না ইহাও মনে করা ভুল। জীবনের এক স্তরের অভিজ্ঞতা অন্য স্তরের অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক হওয়ার দরুণ এক স্তরে লব্ধ শিক্ষা অপর স্তরে পরিবর্তিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে। ধরা যাউক, বাল্যকালে শিশুর ধারণা জন্মিল যে, রাত্রিবেলা সূর্য তাহারই মত ঘুমাইয়া থাকে, কিন্তু পরে বিদ্যালয়ে এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া রাত্রিতে সূর্যকে কেন আকাশে দেখা যায় না এ সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত শিক্ষা জন্মিল। আবার কোন ছাত্র হয়ত বিদ্যালয়-জীবনে খেলাধূলা এবং সাহিত্যচর্চা করিয়া অবসর বিনোদন করিতে অভ্যস্ত হইল, কিন্তু পরে সে হয়ত কারখানায় শ্রমিকরূপে ঢুকিয়া মদ্যপানকে অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিল। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অভিজ্ঞতা তথা শিক্ষার পরিবর্তন, পুনর্গঠন, নিয়ন্ত্রণ (Education & re-education) চলিতে থাকে।

শিক্ষাকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও লোকে শিক্ষালাভ করিতে পারে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে অধিক দিন লেখাপড়া না করিলেও তাঁহার মত শিক্ষিত লোক কয়জন জন্মিয়াছেন! বস্তুত পক্ষে জীবনের অধিকাংশ শিক্ষাই বিদ্যালয়ের বাহিরে হয়। শুধু তাহাই নহে অনেক শিক্ষা আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই হইয়া থাকে। কখন কোন্ অভিজ্ঞতার ফলে, কিভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তাহা সবসময় আমরা জানিতেও পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতায় ট্রামে-বাসে চলাচল করিয়া একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, আমার ভব্যতাবোধের পরিবর্তন হইয়াছে; বাস আসিলে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা সকলকেই নির্বিচারে ধাক্কা দিয়া ট্রামে বাসে উঠিয়া পড়িতে কোথাও আমার বিন্দুমাত্র বাধিতেছে না। জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে কিছুটা জ্ঞাতে, কিছুটা অজ্ঞাতে আমাদের যে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা (Informal Education) বলা হয়। অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের কোন উদ্দেশ্য আমাদের মনের মধ্যে থাকে না; কোনরূপ বিধিবদ্ধ (Systematic) অভিজ্ঞতালাভের চেষ্টাও

আমরা করি না। তথাপি শিক্ষালাভের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে, আমরা শিক্ষালাভ করি। ঐ ধরণের শিক্ষায় সবসময় যে বাঞ্ছিত পথে আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটায় এমনও নহে। আমাদের মধ্যে যে-সব অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও প্রধানতঃ শিক্ষারই ফল। ধরা যাউক, কোন মন্দ ছাত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপর কোন ছাত্র যদি নকল করিতে শিখে, বা কলিকাতার ট্রামে, বাসে উঠার অভিজ্ঞতার ফলে কাহারও ভব্যতাবোধ যদি হ্রাস পায় তবে উহাদের এক হিসাবে অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে।

অবশ্য শিক্ষা শব্দটি আমরা সাধারণতঃ ভাল অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি। অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তন হইলে তাহাকে আমরা কুশিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি। তাই বাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য সকল সমাজই বিধিবদ্ধ-ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে ; বিশেষ করিয়া অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্যই ঐরূপ চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিদ্যালয়ে ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোন্ অভিজ্ঞতার পর কোন্ অভিজ্ঞতালাভের ব্যবস্থা থাকিবে তাহা পূর্ব হইতেই অনেকটা নির্দিষ্ট থাকে। যুগযুগ ধরিয়া সমাজ যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, যে-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে এবং যে সব অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে তাহা নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করে। এইরূপ শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা (Formal Education) বলে। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকে ছাত্রকে শিক্ষালাভে সাহায্য করা আর ছাত্রের উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষকের সাহচর্যে ও পরামর্শে বাঞ্ছিত পথে নিজের ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু (পাঠ্যসূচীর সাহায্যে) পূর্ব হইতে নির্ধারিত থাকে এবং শিক্ষালাভ পদ্ধতিও (পঠন ও পাঠন) মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকে। ছাত্র, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অপরাপর কর্মিগণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিশেষ কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করা হয় (যেমন, বিদ্যালয় বসার এবং ছুটির সময় ইত্যাদি)। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিও করিতে

চেষ্টা করা হয় (লাইব্রেরী, খেলার মাঠ ইত্যাদি)। এইভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্রের প্রত্যক্ষ শিক্ষা চলিতে থাকে।

বর্তমানে বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই জীবনের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও লোকে যাহাতে প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই কার্যের জন্য অগ্রসর দেশগুলিতে বিশেষ ধরণের বিদ্যায়তন স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশের সমস্যা কিন্তু একটু অন্যরূপ। অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা না লইয়াও সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহাদের অন্ততঃ কিছুটা প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মত ঐসব কেন্দ্রও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে (যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি হইতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। এতদ্ব্যতীত জীবনের যে-কোন সময় অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলে লব্ধ সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকায় জীবনের কোন স্তরেই মানুষকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাই অধিকতর প্রগতিশীল দেশগুলিতে বয়স্কদের জন্য নানা ধরণের প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ঐসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নিজ নিজ আগ্রহের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন ও কৌশল আয়ত্তকরণের সুযোগ দেওয়া হয়; অনেকক্ষেত্রে নানা ধরণের সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলায় যোগদানের সুযোগ দিয়া, মানুষের ব্যক্তিত্বকে অধোগতি হইতে রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হইতে সাহায্য করা হয়।

সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষা চলিলেও অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে না করিলে শিক্ষা শব্দের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। তারপর, প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর অপ্রত্যক্ষভাবেই হউক, শিক্ষাকে জ্ঞান অর্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণের সংগে অভিন্ন ভাবাও উচিত নহে। তোতা-বৃত্তির দ্বারা জ্ঞানলাভ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৌশল আয়ত্ত করাকে শিক্ষা না বলিয়া কুশিক্ষা বলাই অধিকতর সঙ্গত। অধিকন্তু জ্ঞানলাভ ও কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া আরও অনেক রকম শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। বুঝিবার সুবিধার জন্য মানুষের শিক্ষাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

১। জ্ঞানলাভ—যথা, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান।

২। কৌশল শিক্ষা--যথা, পড়া শেখা, লেখা শেখা, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি কষার নিয়ম শেখা; জীবিকা-অর্জনের জন্য নানা ধরণের কার্যের কৌশল আয়ত্ত করা।

৩। অভ্যাস শিক্ষা—যথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ইত্যাদি।

৪। নানারূপ অনুভূতির উপলব্ধি এবং তাহাদের প্রকাশের ভঙ্গী শিক্ষা—যথা, ঘৃণা, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি।

৫। চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ—যথা, সত্যাচার, ন্যায়নিষ্ঠা শ্রমশীলতা ইত্যাদি।

মানুষের জীবনের সবরকম ব্যবহার পরিবর্তনকেই উপরোক্ত পাঁচ ভাগে আলোচনা করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম সংগ্রহ করিলে শিক্ষা শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়—

১। শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি শিক্ষা শব্দের অর্থ তাহা হইতে অনেক ব্যাপক। অভিজ্ঞতার ফলে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহাই শিক্ষা। শিক্ষা এবং জীবন অভিন্ন।

২। যদিও ব্যাপকতম অর্থে বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত উভয়পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই শিক্ষা আখ্যা দেওয়া চলে, প্রকৃত পক্ষে শুধু বাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই আমরা "শিক্ষা" পদবাচ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি; অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহারের পরিবর্তনকে আমরা "কুশিক্ষা" বলি। সামাজিক জীবনযাত্রার মাপকাঠিতেই সাধারণতঃ আমরা বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকি। যে ব্যবহার সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ এবং সফলজনক জীবনযাপন করিতে আমাদের সাহায্য করে উহাই বাঞ্ছিত ব্যবহার; অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐ ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহারই নাম শিক্ষা।

৩। বিদ্যালয়ের কার্যের সংগে শিক্ষাকে অভিন্ন ভাবিলে আমরা ভুল করিব। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দুইভাবে শিক্ষা হইতে পারে; বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। বর্তমানে বিদ্যালয় ব্যতীত প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য অন্যধরণের প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই শিক্ষাকার্য বিদ্যালয়ের কার্য হইতে বহুগুণে ব্যাপকতর।

৪। জ্ঞান অর্জন এবং কৌশল আয়ত্তকরণ শিক্ষা নহে ; তাহারা শিক্ষালাভের উপায় মাত্র। তোতাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞান এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৌশল আয়ত্ত করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহারা অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করে—ঐ ধরণের ব্যবহারের পরিবর্তনকে শিক্ষা না বলিয়া কুশিক্ষা বলাই অধিকতর সঙ্গত। তারপর জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্তকরণ ভিন্ন আরও নানাভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন হইতে পারে (অভ্যাস গঠন ইত্যাদি)।

এখন এক কথায় শিক্ষা বলিতে কি বুঝি তাহা বলিতে হইলে বলিব যে, **পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ (satisfying) এবং সার্থক (successful) জীবনযাপনে সাহায্য করে তাহাই শিক্ষা।**

পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ হইতে কি ধরণের অভিজ্ঞতালাভ করিলে বাঞ্ছিত পথে মানুষের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়, এ সম্বন্ধে ভ্রান্তির জন্যও অনেক সময় শিক্ষা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন যে, শিশুর উপর বয়স্কেরা প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিলেই, তাহাদের ব্যবহার বাঞ্ছিত পথে পরিবর্তিত হইতে পারে। শিশু যেন একতাল নরম মাটি, যে ছাঁচে তাহাকে ঢালা যাইবে সেই অনুকৃতিতেই সে গড়িয়া উঠিবে। বয়স্কেরা সমাজের প্রতিভূ; কাজেই সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তাহাদের অনুকৃতিতে গড়িয়া তোলার নামই শিক্ষা। বয়স্কেরা শিশুদের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের সংস্পর্শে শিশুদের ব্যবহারের পরিবর্তনও হয় বটে, কিন্তু এই সংস্পর্শের ফলে শিশুরা যে বয়স্কদের অনুকৃতিতে গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই। শিশুদের নরম মাটির সহিত তুলনা করা ভুল। কারণ নরম মাটির মত আকৃতিহীন হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে না। জন্মমাত্রই তাহারা সহজাত ক্ষমতা এবং প্রবণতার অধিকারী হয় ; ইহাদের বিপক্ষে তাহাদের প্রভাবিত করা কঠিন। তারপর বয়স্কেরা ছাড়া শিশুরা অন্যান্যদের সংস্পর্শেও (ছোট, সমবয়সী ইত্যাদি) আসে এবং তাহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তবে বয়স্কদের প্রভাব যে শিশুদের উপর কাজ করে না, এমন নহে। যাহাদের সহিত শিশুদের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, শিশুরা নিজেদের অজ্ঞাতেই তাহাদের অনুকরণ করে ; কিন্তু যাহাদের সহিত তাহাদের প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অনেক সময় তাহাদের

প্রভাব শিশুদের উপর বিপরীত কাজ করে। তারপর পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে শুধু যে শিশুরা প্রভাবিত হয় এমন কোন কথা নাই; শিশুদের সংস্পর্শে আসিয়া বয়স্কেরাও প্রভাবিত হন। শিক্ষা শিশু এবং বয়স্ক উভয়েই লাভ করে। সংক্ষেপে শিশুদের উপর বয়স্কদের প্রভাবের দ্বারা শিক্ষালাভ হয় ইহা আংশিক সত্য মাত্র।

আমাদের বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া "পড়া" এবং "পড়ানোর" দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনেকে শিক্ষাকে উহাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক উভয়েই ছাত্রের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত। পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যাখ্যা প্রভৃতি শ্রবণের মাধ্যমে ছাত্র উহাদের সংস্পর্শে আসে; ফলে তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন হয় এরূপ বিশ্বাস করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ ধরণের নীতিকে 'শূন্য কুম্ভ' নীতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রকে জ্ঞানহীন কুম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক উভয়কেই জ্ঞানপূর্ণ কুম্ভের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এক কুম্ভের জল যেমন অপর কুম্ভে পূর্ণ করা যায়, পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষকের নিকট হইতে তেমনি জ্ঞানও ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করা চলে। পুস্তকের জ্ঞান চক্ষুর মাধ্যমে এবং শিক্ষকের জ্ঞান কর্ণের মাধ্যমে ছাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, ছাত্র শূন্যকুম্ভ নহে; তাহার মধ্যে খুসীমত জ্ঞান ঢালিয়া দেওয়া চলে না। যে-কোন নূতন জ্ঞান তাহার পুরাতন জ্ঞানের অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত সে উহা গ্রহণ করিতে পারে না। তারপর চোখ বা কান কলসীর মুখের মত এমন কোন জিনিব নহে যে, যাহা খুসী ঢালিয়া দিলেই উহা ভিতরে প্রবেশ করিবে। চোখ দিয়া পড়া এবং কান দিয়া শোনা সত্ত্বেও ছাত্রের কোন বিষয়ে মর্মোপলব্ধি না হইতেও পারে; আবার মর্মোপলব্ধি হইলেও বাঞ্ছিত পথে ছাত্রের ব্যবহার পরিবর্তিত নাও হইতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষ শুধু আপন অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষালাভ করিতে পারে। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসাতেই তাহার অভিজ্ঞতা জন্মায় এবং আপন প্রয়োজন নিবৃত্তির তাগিতেই সে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে। অনেক সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ বা শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণে প্রবৃত্ত হয় না; ফলে অভিজ্ঞতা হিসাবে উহা তাহার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আবার অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। নিজে ব্যক্তিগতভাবে পারি-পার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয় তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আর

অপরের অভিজ্ঞতার কথা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা হয় তাহা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। পরোক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজে ব্যবহারের পরিবর্তনের আশা করা যায় না। পাঠ্যপুস্তক পাঠ বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনা ছাত্রের নিকট পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার মূল্য অল্প। কাজেই "শূন্যকুম্ভ" নীতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোতাবৃত্তিতে পরিণত হয়। তোতাবৃত্তিকে যে শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষা কিভাবে লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাকে একটি দ্বি-কেন্দ্রিক কর্ম (Bipolar process) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেখানেই শিক্ষালাভ হইতেছে সেখানেই দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকা অপরিহার্য ; ইহাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি এবং অপরটি নির্জীব (যথা পাঠ্যপুস্তক) হইতে পারে। পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ; ইহাদের মধ্যে একজন শিক্ষক এবং অপরটি শিক্ষার্থী হইতে পারেন। কিন্তু পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্জাত হইবে তাহাতে উভয়েরই ব্যবহারের পরিবর্তন হইবে। অবশ্য দুইজনের ব্যবহার দুইভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিয়া শুধু ছাত্র যে শিক্ষালাভ করিবে এমন নহে, ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষকও নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জন্মমাত্রেই মানুষের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজন (needs) পরিলক্ষিত হয়। পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই মানুষ পরস্পরের সহিত (যেমন শিশু ও মাতা) সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই সম্বন্ধের ফলে পরস্পর যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা হইতে দুইজনেরই ব্যবহারের পরিবর্তন হয়—নূতন জ্ঞান, নূতন কৌশল, নূতন অভ্যাস, নূতন চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। ফলে তাহাদের মনে আবার নূতন প্রয়োজনবোধ জন্মায়। সেই প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা আবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসে বা অপরের সংগে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া চলে প্রয়োজন নিবৃত্তির চেষ্টা এবং নূতন নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি ; ইহার সংগে সংগে চলে শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই পারস্পরিক সম্বন্ধে আজ যিনি শিক্ষক কাল হয়ত তিনিই ছাত্র এবং আজ যে ছাত্র কাল হয়ত সেই শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে ; অর্থাৎ মিলিত কার্যগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টায় আজ হয়ত একজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কাল আবার হয়ত নেতৃত্ব

অপরের হাতে চলিয়া যাইবে। সমগ্র জীবনব্যাপিয়া এই যে শিক্ষাকার্য চলিতেছে এসম্বন্ধে অনেক সময় আমরা হয়ত একেবারেই অবহিত নহি ; কখনও কখনও আবার সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করি। এইভাবে অপ্রত্যক্ষ (Informal) এবং প্রত্যক্ষ (Formal) শিক্ষা আমাদের জীবনের পাশাপাশি চলিতে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলাম তাহার আংশিক পরিবর্তন করিয়া নিম্নলিখিত সংজ্ঞায় উপনীত হইতে পারি।

শিক্ষা একটি দ্বি-কেন্দ্রিক পদ্ধতি (Biopolar process)। পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত সম্বন্ধ হইতে লব্ধ-অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সমাজে তৃপ্তিপূর্ণ (satisfying) এবং সার্থক (successful) জীবনযাপনে সাহায্য করে তাহাই শিক্ষা।

অনুশীলনী

1. Discuss the true meaning of the term "Education". Distinguish in this connection between "Formal" and "Informal" education. (উঃ পৃঃ ১—১১)

2. Critically examine any of the following definitions of education—(a) Education is acquisition of knowledge. (উঃ পৃঃ—১৩, ১৪) (b) Education is moulding the "young" after the "old". (উঃ পৃঃ—১২, ১৩)

3. "Education is a bipolar process." Discuss (উঃ পৃঃ—১৪, ১৫)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করার প্রয়োজন—পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত নূতন নূতন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদিগকে নূতন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া থাকে। কিন্তু সব শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য নহে। আমরা সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদিও শিক্ষারই ফল, কিন্তু উহাদিগকে সুশিক্ষা না বলিয়া আমরা কুশিক্ষা বলিয়া থাকি। কিন্তু কাহাকে সুশিক্ষা এবং কাহাকে কুশিক্ষা বলিব তাহা স্থির করা সহজ কথা নহে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল শিক্ষাকেই প্রায় কুশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হইত। যে ছেলে খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদিতে কিছুমাত্র আকর্ষণ প্রকাশ করিত, শিক্ষক কিংবা পিতামাতা তাহার আচরণের সংশোধনে তৎপর হইতেন। বর্তমানে কিন্তু ঐগুলিকে সুশিক্ষা বলিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। মোট কথা, কাহাকে সুশিক্ষা এবং কাহাকে কুশিক্ষা বলা হইবে তাহা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া আমরা শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।

প্রত্যক্ষ শিক্ষাকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি প্রভৃতি যে স্থির করিয়া লইতে হয়, এই আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা হইয়াছে। সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির না করিয়া লওয়ার জন্য আমাদের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি প্রভৃতি এত ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাদের মধ্যে সুশিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষাই বেশী হইতেছে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকার দরুণ আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের কার্য চালাইয়া যাইতেছি। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কার্য হয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল ফল প্রসব করিতেছে। অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে উভয় শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। ধরা যাউক, বিদ্যালয় জীবন (প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্র) যদি ছাত্র, শিক্ষক

সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে এবং সমাজ-জীবন (অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্র) যদি পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে যাপন করিতে হয় তাহা হইলে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা কোনটাই চারিত্রিক গুণ হিসাবে প্রকাশ পাইতে পারিবে না। অধিকন্তু এই অবস্থার ফলে মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হইয়া মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবে। তাই প্রত্যক্ষ শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এইজন্য প্রাচীন ভারতে এমন নজির আছে যে, রাজা শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিরোধী আইন প্রণয়ন করিলে ব্রাহ্মণ (শিক্ষক) তাঁহাকে ঐ আইন প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। সংক্ষেপে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রের (সমাজ-জীবনের) অভিজ্ঞতাগুলিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আর একটি কথা শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল সংগে সংগে উপলব্ধি করা যায় না। আজ যাহাকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে ১২।১৪ বৎসর পরে সে যখন সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে তখনই শুধু তাহার শিক্ষার ভালমন্দ বিচার করা যাইতে পারে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে প্রতিপদ অগ্রসর হইবার পূর্বে আমাদের প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করা যাইতে পারে। এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা শিক্ষাদান প্রচেষ্টার অপরিহার্য অঙ্গ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে জীবনদর্শনের স্থান—শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য অভিন্ন। মানুষের জীবনদর্শনই তাহার জীবনের সব কিছুর ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি; শিক্ষার ভালমন্দ বিচারের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনদর্শন কথাটি খুব গালভারি সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞাতে হউক বা অজ্ঞাতে হউক মানুষের সামান্যতম কার্যও তাহার জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হাক্সলি (Aldous Huxley) বলিয়াছেন—"মানুষ আপন জীবনদর্শন—জগৎ সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী জীবনযাপন করিয়া থাকে। একেবারে চিন্তাহীন লোক সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। জগতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধারণা ব্যতীত জীবনযাপন সম্ভব নহে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনদর্শন থাকিবে কিনা ইহা বিচার্য বিষয় নহে, তাহার জীবনদর্শন ভাল হইবে কি মন্দ হইবে ইহাই বিচার্য বিষয়।" চার্বাক বা ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে একরূপ, আবার জৈনধর্মের জীবনদর্শনের

উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনদর্শন লইয়া মানুষে মানুষে এমন কি সমাজে সমাজে গুরুতর পার্থক্য আছে; ফলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমাদের মধ্যে গুরুতর মতদ্বৈধ দেখা যায়। এরিষ্টটল্ (Aristotle) লিখিয়া গিয়াছেন—"তরুণরা কি শিক্ষা করিবে এ সম্বন্ধে কোন মতৈক্য নাই, শিক্ষাদানের কালে আমরা বুদ্ধির বা চরিত্র বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিব ইহা স্থিরীকৃত হয় নাই।" শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরিষ্টটলের কালে যেরূপ মতদ্বৈধ ছিল আজও প্রায় সেইরূপই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়া এবং আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বর্তমানে ভারতে আমরা সমাজ পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হইয়াছি; স্বভাবতই সংগে সংগে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে—সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আমাদের মনস্থির করা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দর্শনশাস্ত্র—মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করা কঠিন। আবার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে দৃশ্যমান জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি তাহা অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ এবং জগতের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া প্রধানতঃ তিনটি দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে—ঐ সব মতবাদকে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) আখ্যা দেওয়া হয়।

জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ (Idealism) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদীরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জীবনের সমস্যাগুলির বিচার করিয়া থাকেন।

১। জড়জগৎ হইতে মানসিক বা অধ্যাত্ম জগৎ অধিকতর সত্য ইহাই ভাববাদের গোড়ার কথা। সমগ্র জগৎসৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন ভগবান বা এক ভাবময় সত্তা—একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আমাদের চতুর্দিকের জড়-জগৎ আসলে অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

২। মানুষের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মার সন্ধান পাই তাহা ভগবানেরই প্রকাশ—জীবাত্মা পরমাত্মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পরমাত্মা সত্য, শিব এবং

সুন্দরের প্রতীক। জীবাত্মাতে ভগবদ্ গুণাবলী প্রতিফলিত হওয়াতেই তাহার সার্থকতা।

৩। জীবাত্মার মধ্যে অন্তরাত্মার অনুভূতির নামই আত্মদর্শন (Self realisation)। আত্মদর্শনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মদর্শন ঘটিলেই মানুষ জড়জগতের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তাহার মধ্যে ভগবদ্ গুণাবলীর প্রকাশ হয় এবং সে আদর্শ জীবনযাপন করিতে সক্ষম হয়।

৪। ভগবানের গুণাবলী শাশ্বত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপরিবর্তনীয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে জীবনের উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য হয় না। মানুষ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে থাকিলেও সকলেরই শেষ পরিণতি এক এবং অভিন্ন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের প্রভাবের ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) রূপে জন্মলাভ করে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে আধুনিকতম বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও এই ভাবধারার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—ইউরোপে সভ্যতার বিকাশ হয় সর্বপ্রথম গ্রীসদেশে। গ্রীক মনীষীদের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারা আজও ইউরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সোফিষ্ট (Sophist) নামে প্রাচীন গ্রীসে একদল শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। ইহাদের মতে মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নিজ বুদ্ধির দ্বারা মানুষ সৎ-অসতের পার্থক্য নির্ণয় করিতে সক্ষম। কাজেই সোফিষ্টদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে, মানুষকে বাধামুক্ত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সাহায্য করা। উপরি-উক্ত ভাবধারা এক সময়ে গ্রীসের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। সোফিষ্টদের মুখপাত্র সক্রেটিস্‌কে তাই সমাজদ্রোহী ঘোষণা করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। সোফিষ্টদের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা (এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থাই ইউরোপের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে) সাধারণতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অনুগামী ছিল। এরিষ্টটল, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিগণ এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিলেন। এরিষ্টটল্ লিখিত পলিটিকস্ (Politics) এবং প্লেটো লিখিত রিপাব্লিক (Republic) গ্রন্থদ্বয় আজও

শিক্ষাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় গ্রন্থ বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। ভাববাদী দর্শনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এথেন্সবাসীরা স্থূল এবং বাহ্যজীবন অপেক্ষা মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মানসিক বা আধ্যাত্মিক দিকে মনুষ্য জীবনের চরমবিকাশকে তাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মধ্যে এরিষ্টটল বিশেষ করিয়া "সত্যম", "শিবম্" এবং "সুন্দরম"-এর উপর জোর দিতেন। ঐগুণগুলির উপলব্ধি-করণের ক্ষমতা মনুষ্য-প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত। এই ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের নামই আত্মানুভূতি বা আত্মদর্শন (Self-realisation)। কাজেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা আত্মানুভূতিই প্রাচীন এথেন্সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "জিমনাস্টিক্" (Gymnastic)-এর সাহায্যে শরীরের এবং "মিউজিক" (Music)-এর সাহায্যে মনের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা হইত। অবশ্য মানসিক বিকাশের দিকেই অধিকতর জোর দেওয়া হইত ; তাই শিল্প, চারুকলা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা স্বভাবতই অধিক পরিমাণে করা হইত। শিক্ষা সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর রুচি অনুযায়ী হইত। নিজ রুচি অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজ শিক্ষক এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু বাছিয়া লইত। বিদ্যালয় রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত হইত না। শিক্ষকগণই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক দেশ এবং তাহার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নবজাগরণের (Renaissance ; পঞ্চদশ খৃঃ) সূচনাতে মানবতাবাদিগণ (Humanists) ইউরোপের সকল দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। একথা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও চিন্তাধারার পুনঃ-প্রবর্তনই ছিল নবজাগরণ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। মানবতা-বাদিগণ ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শানুযায়ী মানবতাবাদিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকিবে ছাত্র নিজে। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তখনকার যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের সংগে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মনুষ্য-প্রকৃতির বিকাশ বলিতে তাঁহারা সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের মত অতিন্দ্রিয় কিছু মনে করিতেন না। মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশকেই তাঁহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ঐ সময় ইউরোপে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফেকাল্টি সাইকোলজির

(Faculty Psychology) প্রাধান্য ছিল। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মনুষ্য মনের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে। মানবতাবাদিগণ ঐ শক্তিগুলির বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং ব্যাকরণ পাঠের দ্বারা ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই বাস্তবক্ষেত্রে ছাত্রকে শিক্ষার কেন্দ্রে না রাখিয়া মানবতাবাদিগণ গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বরং ব্যাহত হইত।

আধুনিককালে জার্মানিতে ফ্রবেল (Froebal) কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) নামে এক বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতে বিদ্যালয়কে একটি বাগান এবং ছাত্রদের চারাগাছের সহিত তুলনা করা যায়। প্রত্যেক গাছ যেমন নিজ নিজ বীজ অনুসারে বিকাশ লাভ করে, প্রত্যেক ছাত্রও তেমনি তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী অনুসারে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই বিকাশে সাহায্য করা। বিভিন্ন মানুষ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে থাকে বলিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে; ফলে সকলের শিক্ষা এক ধরণের হইতে পারে না। মানবতাবাদীদের মত ফ্রবেল অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতামাত্র বুঝিতেন না। তাঁহার মতে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এক কথায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের দ্বারা আত্মানুভূতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ফ্রবেল মনে করিতেন। তাঁহার চিন্তাধারা সমগ্র ইউরোপের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও ইহার প্রভাব রহিয়াছে। সুইস্ শিক্ষাবিদ্ পেষ্টালজী এবং ইটালীয় শিক্ষাবিদ্ মণ্টেসরী উভয়েই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে শিক্ষার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে নান্ সাহেব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। মানুষই সকল শিক্ষা প্রচেষ্টার কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিবে বলিয়া তিনি দৃঢ়মত পোষণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক মতামত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে আত্মোপলব্ধিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত। সে যুগে জ্ঞানকে "পরা" ও "অপরা" দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অধ্যাত্মজ্ঞান

বা "পরা" জ্ঞানলাভ করাকে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হইত। জড় বা ''অপরা'' জ্ঞানকে অবহেলা না করা হইলেও সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্বনিয়ন্তা বা ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন— জীবাত্মা পরমাত্মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বেদ, উপনিষদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য পালন এবং অন্যান্য ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়া গুরুগৃহে ছাত্রেরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিত। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি (অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা Self-realisation) ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতার বিভিন্নতা অস্বীকার করা হইত না। মানুষ ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। তাই অধিকারী ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হইত। নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রবণতার বিভিন্নতা হিসাবে বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইত। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। সমাজে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সব জ্ঞানের প্রয়োজন (পরা জ্ঞান) তাহা প্রাসঙ্গিকভাবে দেওয়া হইত—শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইত না।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতনের পর সংস্কৃত শিক্ষা যে শাস্ত্রজ্ঞানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করিয়া মুখস্থ করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। মক্তব এবং মাদ্রাসার শিক্ষার উদ্দেশ্যও ভিন্ন ছিল না। ইংরেজ আমলে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হইল, তখনও ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মানবতাবাদীদের প্রাধান্য ছিল। ফলে, তাঁহাদের অনুকরণে মানসিক ক্ষমতাগুলির বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইল। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় মানসিক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হইবে এই আশায় ঐগুলিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের জীবনের সংগে ঐ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় বাস্তবক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করাই ঐ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ভারতের চিন্তা নায়কগণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন নাই এমন নহে। তাঁহারা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ বা আত্মোপলব্ধিকেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বামী

বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমরা যাহা চাই তাহা হইতেছে পরিপূর্ণ মানুষ করার শিক্ষা ("The aims of education is to make man grow. It is man-making education all round that we want.")। আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি এবং চরিত্র গঠন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য একথা স্বামীজী তাঁহার বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ বলিয়া গণ্য করা হয়। গুরুদেবের শিক্ষাদর্শনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিকেই গুরুদেব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। তোতাবৃত্তির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, কারণ ইহা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বাধা দেয়। নৃত্য, গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের বিকাশে সাহায্য করে বলিয়া গুরুদেবের শিক্ষা-ব্যবস্থায় উহারা বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। জীবনে সত্যম, শিবম্ এবং সুন্দরম্-এর উপলব্ধিই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া গুরুদেব মনে করিতেন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলনীতি—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করার পর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সর্বপ্রথম কথা হইতেছে যে, ব্যক্তি-জীবনের গৌরবকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ; মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর কোন কিছুই অগ্রাধিকার পাইতে পারে না ("Human personality is of supreme value and constitutes the noblest work of God"—Ross)। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন গ্রীসে সোফিষ্টগণও অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রত্যেক মানুষকেই ভগবানের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য জীবনের মূল্য এবং তাহার গৌরব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিতেন। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক নান্‌সাহেবের মতে মানুষের স্বাধীন কর্ম ব্যতীত মনুষ্য জগতে কোন কিছু ভাল প্রবেশ করিতে পারে না ; এই সত্যের কথা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে (…that nothing good enters into the human world except in and through the free activities of individual men and women, and that educational practice must be shaped to accord

with that truth)। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে ; নিজ নিজ দেহ-মন-অনুভূতি লইয়া প্রত্যেক মানুষই এক একটি পৃথক সত্তা। সমাজ, সংস্কৃতি যাহা কিছু মানুষ সৃষ্টি করুক না কেন সব কিছু তাহারই প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং সে উহাদের হইতে স্বতন্ত্র। নান্ সাহেব প্রত্যেক মানুষকে এক একটি দ্বীপের সহিত তুলনা করিয়াছেন ; সে তাহার নিকটতম প্রতিবেশী হইতেও স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র রূপটির উপলব্ধি মানুষকে পরিপূর্ণতা (perfection) প্রদান করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান কর্তব্য।

(The main task of education is to foster the realisation of that perfect pattern in each individual life) প্রাচীন ভারতে এবং গ্রীসে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের রূপের ধারণা করার চেষ্টা করা হইত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বকে ভগবৎ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন। নান্ সাহেব অবশ্য প্রাণিবিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্য ব্যক্তিত্বের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—জীবন বিবর্তনের ফলে প্রত্যেক মানুষ বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে (নান্ সাহেব ইহাকে হর্মি আখ্যা দিয়াছেন); ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ রূপ। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের স্ব-রূপে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য (The aim of education is to enable each one to become highest truest self)। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সর্বদেশে সর্বকালে আত্মোপলব্ধি (self-realisation) কে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের তৃতীয় কথা এই যে, মানুষের জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হইলেই তাহার ব্যক্তিত্বের স্ব-রূপ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতীয় দর্শনে আত্মার ক্রমবিকাশ এবং আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানে জীবনের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব অনুসারে জন্মমাত্রেই প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রবণতার অধিকারী হয়। উহাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of individual potentialities). আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে,

স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মগত ক্ষমতা ও প্রবণতাগুলির বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা এই বিকাশকে সাহায্য করে মাত্র। ইহাদিগকে রুদ্ধ বা পরিবর্তিত করিতে গেলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতি হইবার সম্ভবনাই বেশী। ফ্রবেল সাহেব তাই বিদ্যালয়কে বাগান, শিক্ষককে মালী এবং ছাত্রকে ফুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিজ নিজ বীজের পার্থক্যের জন্য ছাত্রেরা কেহবা গোলাপ কেহবা গন্ধরাজ কেহবা জবা হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। শিক্ষক মালীর মত তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করিয়া থাকেন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাপদ্ধতি—শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারেই শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির হইয়া থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিকট যে সব বিষয় ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষভাবে সাহায্য করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের মূল্যই অধিক। প্রাচীন ভারতে বেদাদি শাস্ত্র এবং প্রাচীন গ্রীসে দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিষয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এই ধারণা হইতেই শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে "অধিকারত্ব" বিবেচনা করিয়া কে কোন্ বিষয়ে শিক্ষা করিবে তাহা স্থির করা হইত। প্রাচীন রোমের শিক্ষা-ব্যবস্থা 'লিবারেল' (liberal) আখ্যা পাইয়াছিল। কারণ তাহার উদ্দেশ্য ছিল মনকে স্বাধীন বা (liberate) করা। দর্শন, চারুকলা ইত্যাদি বিষয়ের চর্চার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এই ধারণা হইতে ঐসব বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। নবজাগরণ আন্দোলনের পর ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চা মনকে স্বাধীন (liberate) করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্চাশ্রমের (পরে পাঠভবন) প্রতিষ্ঠা করেন তখন 'আত্মাকে' মুক্ত করিবার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার (liberal education) প্রচলন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই পাঠ্যস্থচীতে বিজ্ঞানের উপর ততটা জোর না দিয়া সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প, চারুকলা ইত্যাদিকে তিনি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। মোট কথা পাঠ্যস্থচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা বাস্তব জীবনে কার্যকরী হইবে একথা না ভাবিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করিবে বা "মনকে" মুক্ত করিতে সাহায্য করিবে একথাই অধিক বিবেচনা করেন। ছাত্রকে নিজ নিজ পছন্দ অপছন্দ অনুসারে নিজের

পাঠ্যবস্তু নির্ধারণে কতকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাত্রের স্বভাবদত্ত ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুসারে স্থির করাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নীতি।

শিক্ষার বিষয়বস্তুর মত শিক্ষার পদ্ধতিও উহার উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে ছাত্রগণ শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের অন্তরে জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিত। অন্তরের উপলব্ধিই মানুষকে আত্মদর্শনের (self-realisation) পথে অগ্রসর করে ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। অধ্যয়ন, আবৃত্তি, মনন এবং বাস্তবজীবনে লব্ধজ্ঞানের অভ্যাসই ছিল শিক্ষালাভের পদ্ধতি। আধুনিককালে ছাত্র নিজ ইচ্ছায় নিজের কার্যের মাধ্যমে গৃহীত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিশ্বাস করেন।

প্রকৃতিবাদ--প্রকৃতিবাদ আর একটি শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন। ফরাসী মনীষী রুশোর নামের সহিত ইহা বিশেষভাবে জড়িত। রুশো যেভাবে প্রকৃতিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে উহাকেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মত ভাববাদী দর্শনের ফল বলিয়া গণ্য করিতে হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, মানবতাবাদিগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হইলেও ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা বিকাশের নামে ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য এবং ব্যাকরণ পাঠ তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের নিকট ঐসব বিষয় পাঠ ছিল অর্থহীন। বাস্তবক্ষেত্রে উহা মানসিক বিকাশে সাহায্য না করিয়া বরং উহার প্রতিকূলতাই করিত। মানবতাবাদিগণ কর্তৃক অর্থহীন পুস্তক-পাঠের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বদানের প্রতিবাদ হিসাবেই রুশো তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিতে রুশো ছিলেন বিদ্রোহী। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান। তদানীন্তন ফরাসী সমাজের গ্লানিকর আবহাওয়ায় বাস করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনে অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে মানুষের সৃষ্ট-প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিরাট বিদ্রূপ মাত্র, ("Human institutions are one mass of folly and contradiction") ভগবান সব জিনিষকেই ভাল করিয়া সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহারা মন্দ হইয়া যায়। ("God makes all things good, man meddles with them and they become evil.") তাই রুশো মনে করিতেন যে, শিক্ষার দ্বারা আমরা মানুষ গড়িব, না নাগরিক গড়িব তাহা প্রথমেই স্থির করিতে হইবে; মানুষ এবং নাগরিক একসঙ্গে গড়া চলে না ("...you must make your choice

between the man and the citizen ; you cannot train both".) রুশোর উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহার 'এমিল' (Emil) নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার মানস-সন্তান এমিলের শিক্ষা বর্ণনা করিতে গিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে নিজের ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। রুশো মনে করিতেন যে, শিক্ষাকে "বিশেষ শিক্ষা" (positive education) এবং "অবিশেষ শিক্ষা" (negative education) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। রুশোর নিজের ভাষায় বলিতে গেলে "বিশেষ শিক্ষা" মনকে উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই গড়িয়া তুলিতে চায় এবং শিশুকে বয়স্কদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চেষ্টা করে ("I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man.") যে শিক্ষা মানুষের শিক্ষা লাভের যন্ত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তাহাকে "অবিশেষ শিক্ষা" এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ("I call a negative education, one that tends to perfect the organ that are the instruments of knowledge before giving this knowledge directly"). "অবিশেষ শিক্ষা" মানুষের মনে যুক্তির পথকে প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ অভিজ্ঞতার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে ("Negative education endeavours to prepare the way for reason by the proper exercise of senses"). রুশোর মতে "বিশেষ শিক্ষা" অপেক্ষা "অবিশেষ শিক্ষার" মূল্য অধিক। তিনি মনে করিতেন যে, জন্ম হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত মনুষ্যজীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটকাল ("the most dangerous period in human life is between birth and the age of twelve") তাই ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত "সবিশেষ শিক্ষার" কোন চেষ্টাই না করিয়া শিশুকে "অবিশেষ শিক্ষা" দিতে হইবে। শিশুকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলেই সে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাইতে পারে। শিশুর ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুস্তক ব্যবহার ক্ষতিকর হইবে বলিয়া রুশোর ধারণা। ইহার পর পুস্তক পাঠ চলিতে পারে। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। বয়ঃসন্ধি-কালে পদার্পণ করিবার পূর্বে শিশুকে কোনরূপ সামাজিক শিক্ষাদানের চেষ্টা তাহার স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। শিশুকে অভ্যাসের দাস করিতে চেষ্টা করা

উচিত নহে। উহাতে তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। রুশো লিখিয়াছেন—শিশুকে একটি মাত্র অভ্যাস গঠন করিতে দিবে, তাহা এই যে, তাহার যেন কোন অভ্যাস না থাকে ("the only habit the child should be allowed to contract is that of having no habits.") শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের কোন স্থান আছে বলিয়া রুশো বিশ্বাস করিতেন না। বিদ্যালয়ের আবহাওয়াকে তিনি অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া মনে করিতেন। এক হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ শিক্ষার (Formal education) বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-কার্যে গৃহশিক্ষকের সাহায্যগ্রহণ তিনি সমর্থন করিতেন। রুশোর মানস-সন্তান এমিল কখনও বিদ্যালয়ে যান নাই। আর একটি কথা, রুশোর মতে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা বিভিন্ন হওয়া উচিত। পূর্বোক্ত এমিল গ্রন্থে "সফিয়া" নামে একটি মেয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা রুশো পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এমিলের উপযুক্ত স্ত্রী হইতে সমর্থ হওয়া। পুরুষের শিক্ষা প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও মেয়েদের শিক্ষায় সামাজিক অনুশাসনকেই কিন্তু তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

রুশোর শিক্ষা বিষয়ক মতবাদ তাঁহার পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিলেও প্রকৃতিবাদকে কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ এডাম্‌স (Adms) বলেন যে, যে সব শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং পুস্তকের উপর বেশী নির্ভর না করিয়া শিক্ষার্থীর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উপর বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ প্রকৃতিবাদী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতিবাদের প্রভাবেই শিক্ষা প্রথম মনস্তত্ত্বঘেঁষা হইতে আরম্ভ করে। ফ্রয়েড, ম্যাগডুগেল প্রভৃতি যেসব মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে (Instincts) মানুষের ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন তাহারা প্রায় সকলেই প্রকৃতিবাদের সমর্থক। শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা, প্রবণতা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইতে হইবে—শিক্ষার বিষয়বস্তু অপেক্ষা শিক্ষার্থীর উপর আমাদের অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, এইসব নীতি প্রকৃতিবাদের প্রভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছে। মোটকথা "শিশুকেন্দ্রিক" (Child-centred) শিক্ষার প্রবর্তন অনেকটা প্রকৃতিবাদের অবদান বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে শিশুকে ভাল করিয়া

জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে; শিক্ষাকার্যে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পুস্তক, শিক্ষার বিষয়বস্তু সকলের মধ্যে শিক্ষার্থীরই অগ্রাধিকার। শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে খর্ব করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিবে না। বস্তুতঃপক্ষে-শিক্ষার উদ্দেশ্য অপেক্ষা শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে প্রকৃতিবাদের অবদান বেশী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যে জ্ঞান-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং পুস্তকপাঠের অভিজ্ঞতা যে অনেক সময়েই ছাত্রকে প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে পারে না এ-কথা রুশো বারবার বলিয়া গিয়াছেন ("Give your scholar no verbal lessons : he should be taught by experience alone"). খেলার মনোভাব লইয়া শিশু শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইবে, শিক্ষা পদ্ধতির এই নীতির দিকেও প্রকৃতিবাদীরাই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এক কথায় বর্তমানে যতগুলি প্রগতিমূলক আন্দোলন চলিতেছে তাহাদের অনেকের সংগেই প্রকৃতিবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। রুশোর প্রত্যক্ষ উত্তরসাধক দু-একজন এখনও বর্তমান আছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের নেল (A. S. Neill) সাহেবের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষভাবে প্রকৃতিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর কোন দেশেই বর্তমানে শিক্ষাকার্য চলিতেছে না। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাশ্রয়ী-দর্শন হিসাবে ইহার কোন স্থান নাই।

রুশো কর্তৃক ব্যাখ্যাত প্রকৃতিবাদ ছাড়াও আর এক ধরণের প্রকৃতিবাদ শিক্ষা-ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রকৃতিবাদ ভাববাদী জীবনদর্শনের ঠিক বিপরীত জড়বাদী জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। জড়বিজ্ঞানের প্রভাবেই ইহার সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে অতিন্দ্রীয় কিছু আছে বলিয়া ইহা বিশ্বাস করে না—জন্মকালে মানুষের মন পুস্তকের শূন্য পৃষ্ঠার মতই থাকে; ক্রমে জীবনের অভিজ্ঞতার ফল তাহাতে লিখিত হইতে থাকে। মানুষের জন্মগত শক্তি বা প্রবণতায় এই ধরণের প্রকৃতিবাদ বিশ্বাসী নহে। পারিপার্শ্বিক হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। এই মতবাদ হইতেই ব্যবহারবাদী (Behaviourist) মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্বের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জড়বাদী জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের আলোচনা অধিকতর সুষ্ঠু হইবে মনে করিয়া প্রথমে জড়বাদ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হইল।

জড়বাদ—দর্শন হিসাবে জড়বাদ ভাববাদের সংগে চিরদিনই প্রতিযোগিতা করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতে চার্বাক জড়বাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন—

তাহার মতে "সুখে থাকাই" জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; মৃত্যুর পর আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বর্তমান কালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জড়বাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে—জড়প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বের ফলে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। পূর্বে যেসব বস্তু নৈসর্গিক বলিয়া অনুমান করা হইত তাহা বর্তমানে প্রাকৃতিক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ফলে, কোন কিছুই ইন্দ্রিয়াতীত বা নৈসর্গিক বলিয়া বিজ্ঞানীরা স্বীকার করিতেছেন না। মন, আত্মা সব কিছুই জড়প্রকৃতিরই প্রকাশ বলিয়া ইঁহারা মনে করিতেছেন। জড়বাদ কোন ভাবসত্তায় বিশ্বাস করে না, দৃশ্যমান জড়জগৎকেই শুধু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই জানা সম্ভব; ইন্দ্রিয়াতীত কোন কিছু জানিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কাজেই ইহসংসারের মধ্যেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত—সার্থক এবং তৃপ্তিপূর্ণ জীবনযাপনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সু ও কু, ভাল ও মন্দ ইহাদের বিচার পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ভিত্তিতেই করিতে হইবে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন না হইয়া পারে না। জড়বাদের প্রভাব শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মানুষের অন্তরের মধ্যে নিহিত দেখিতে পায়, সমাজতন্ত্রবাদও তেমনি উহাকে সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করে। বাস্তব জীবনে একক মানুষের কোন অস্তিত্বই নাই; সমাজের মধ্যেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষ বলিতে যেসব গুণাবলী বুঝায় ঐগুলি সমাজই তাহার মধ্যে সৃষ্টি করে। জন্মকালে মানুষের মন পুস্তকের শূন্য পৃষ্ঠার মত থাকে এবং তাহার মধ্যে পরে যাহা কিছু লিখিত হয়, সমাজই তাহা লিখিয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু নিজস্ব বলিয়া মনে করি, তাহার সব কিছুই আমাদের সমাজের নিকট হইতে পাওয়া। মানুষ তাহার জীবনের সার্থকতা এবং তৃপ্তি সমাজের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। সমাজ হইতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। সমাজ-জীবন ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা ব্যাপকতর। সমাজের উন্নতিতেই ব্যক্তির উন্নতি। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে সে উপযুক্তভাবে

সমাজের সেবা করিতে পারে—সামাজিক জীবনে মানুষের উপর যেসব কর্মভার পড়িবে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই শিক্ষা গ্রহণ করা। তাই সামাজিক কর্তব্য পালনে সুদক্ষ ব্যক্তি (socially efficient) গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম বাগলে মত-প্রকাশ করিয়াছেন। সামাজিক কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মধ্যেই মানুষ তাহার নিজের জীবনের সার্থকতা ও পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইবে। ধরা যাউক, আমি যদি সমাজের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জন করি, আমি যদি উত্তম স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র বা কন্যারূপে পরিগণিত হইতে পারি, আমার যদি সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধতর করিবার যোগ্যতা থাকে, আমি যদি সুনাগরিক এবং উত্তম সমাজসেবক হইতে পারি তবে একদিকে সমাজ যেমন উপকৃত হইবে তেমনি আমিও জীবনে সার্থকতা এবং তৃপ্তির পথ খুঁজিয়া পাইব। প্রকৃতপক্ষে সমাজজীবন এবং ব্যক্তি-জীবন একসূত্রে গাথা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শিক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে কোথায় অতিন্দ্রীয়বাদের স্থান নাই।

শিক্ষা ব্যতীত সমাজ যে স্থায়ী হইতে পারে না সেদিকেও সমাজতান্ত্রিকবাদীরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এক সমাজের সভ্যদের পরস্পরের ভাষা, আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ঐক্যই সমাজকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। সমাজ শিক্ষার সাহায্যে তাহার সভ্যদের মধ্যে এইরূপ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন বিদ্যালয় ছিল না, তখনও পরিবার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ তাহার ভবিষ্যৎ সভ্যকে সমাজজীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ নিজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে প্রধানত সামাজিক স্থিতিবিধান।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদীরা শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ অবহেলা না করিলেও সামাজিক প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। অনেক সময় সমাজজীবনে মানুষকে যেসব কার্যে লিপ্ত হইতে হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদনুরূপ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হয়। সমাজ-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ করিতে সক্ষম বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার নীতি সমাজতন্ত্রবাদীরা অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সমাজই শিশুর আদর্শ পুস্তক।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা এই যে, শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলেই শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ সমাজরূপে গ্রহণ করিয়া সভ্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা সমাজতান্ত্রিকগণ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে যখন প্রধানতঃ সামাজিক শিক্ষাদানের চেষ্টাই করা হয়, তখন উহা সমাজের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের মাধ্যমে যত হইবে ততই ভাল। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালেই ছাত্রদের কিছু না কিছু সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রাচীনতম মতবাদের অন্যতম। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মতের সমর্থন করিত—এথেন্স ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী আর স্পার্টা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া নিজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল। রাষ্ট্রের সেবায়ই যে জীবনের সার্থকতা এ-কথায় স্পার্টানগণ বিশ্বাস করিত। মানুষের কোন স্বতন্ত্র জীবন বা সুখ-দুঃখ থাকিতে পারে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না। রাষ্ট্রের সেবার জন্য শিশুকে প্রস্তুত করাকেই স্পার্টানগণ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। জন্মমাত্র শিশুকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। বিকলাঙ্গ বা অন্য কোন কারণে যেসব শিশুর ভবিষ্যতে সমাজের বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহাদের পৃথিবী হইতে সরাইয়া ফেলা হইত। যেসব শিশু বাঁচিয়া থাকিত, সাত বৎসর বয়স হওয়ার সংগে সংগে তাহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইত। তারপর রাষ্ট্রের উপর পড়িত শিশুকে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। তখনকার দিনে সৈন্যবাহিনীর উপর রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি নিভর করিত বলিয়া, স্পার্টান শিশুদের বিশেষভাবে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত—শ্রেষ্ঠ সৈনিক হইবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষাদান এবং যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এমন কি, যে-সব ব্যবহার বর্তমানে আমরা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি, সৈনিকজীবনে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া, স্পার্টান শিশুদের ঐ-সব ব্যবহারে উৎসাহিত করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, স্পার্টান শিশুকে অনেক সময় উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইত না; উদ্দেশ্য থাকিত যে, প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করিবার কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিবে। সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন প্রভৃতি মানসিক উন্নতিমূলক কোন বিষয়ের চর্চায় কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইত

না। প্রতিটি স্পার্টান শিশুকে মোটামুটি একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত।

স্পার্টা ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। বর্তমান জগতে গণতন্ত্রের প্রসারের সংগে সংগে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব এবং তাহার আনুষঙ্গিক শ্রমবিভাগ (Division of labour) গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গ সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র একজনও যদি তাহার কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না করে, তবে তাহার ফলে অপরাপর সকলের কার্য অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফলে কাজে-কাজে গুরুত্বের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কাজের মূল্য যে একজন সাধারণ শ্রমিকের কাজের মূল্য অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী এসম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। সকল মানুষই যে মোটামুটি সমান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই যে মানুষের জীবন সার্থক ও তৃপ্তিপূর্ণ হয়, এই ধারণা দিন-দিনই দৃঢ়মূল হইতেছে। উপরোক্ত অনুভূতিগুলির ভিত্তিতেই পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র প্রসারলাভ করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের কাল হইতে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের যুগ চলিতেছে একথা-বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। গণতন্ত্র আবার ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য—ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

অপরদিকে সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান হইতেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যবহারবাদী (Behaviourist) মনস্তাত্ত্বিকগণ পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার ভিত্তিতে মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইকের (Thorndike) মতে যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি তাহা কতকগুলি স্টিমুলাস্ (stimulus) এবং রেস্পনসের (response) মধ্যে গ্রন্থিগঠনের (bond) ফলে সৃষ্ট হয়। কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার পারি-পার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। সমাজবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণের (Social psycho-logists) মতেও মানুষ বিশেষ করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিকেরই সৃষ্টি—তাহার

আদর্শ, ভালমন্দের বিচার, চিন্তা, কল্পনা, প্রয়োজনবোধ, মানসিকভাব সব কিছুই পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলাফল। এই ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহাই শিক্ষাপদবাচ্য। আধুনিককালে বিজ্ঞানহিসাবে সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। সমাজের যে পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তির মত সমাজও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তাহারও উন্নতি-অবনতি, ধ্বংস ইত্যাদি আছে একথা অস্বীকার করা চলে না। নৃতত্ত্ব (Anthropology) হইতেও সমাজবিজ্ঞানের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। এক কথায় সকল দিক হইতেই বর্তমানে সমাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রবাদের অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়া প্রভৃতি কমিউনিষ্ট (Communist) দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে গঠিত। কমিউনিষ্টগণ সম্পূর্ণরূপে জড়বাদে বিশ্বাসী। "আদর্শ" সমাজব্যবস্থা গঠনই তাহাদের মতে মনুষ্য-জীবনের পরমার্থ। তাঁহারা বিপ্লবের দ্বারা নিজেদের আদর্শানুযায়ী সমাজব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত ঐ সমাজব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। তাই বিপ্লবের সফলতার সংগে সংগেই তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করিয়া শিক্ষার সাহায্যে মানুষের চিন্তা এবং ভাবধারা নিজেদের আদর্শের অনুকূলে আনিতে চেষ্টা করেন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক প্রস্তুত করাই তাঁহাদের নিকট শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভারত চিরদিনই ভাববাদের দেশ। এদেশে জড়বাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহাত্মা গান্ধীকেই ভারতের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ্ বলা যাইতে পারে। এক বিশেষ ধরণের সমাজ-ব্যবস্থার (স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান গ্রামসমাজ) পরিপূরক হিসাবেই তিনি তাঁহার "বুনিয়াদী" শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জীবন, পাঠ্য-সূচী এবং শিক্ষাপদ্ধতি "আদর্শ" সমাজে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কথা স্মরণে রাখিয়াই মহাত্মাজী স্থির করিয়াছিলেন। শিক্ষার সংগে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধন করাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান নীতি। কিন্তু মহাত্মাজী গোঁড়া ভাববাদী ছিলেন। আদর্শ মানুষ প্রস্তুত

করাই তাহার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। আদর্শ সমাজ ব্যতীত আদর্শ মানুষ জীবনে সার্থকতালাভ করিতে পারে না বলিয়াই মহাত্মাজী শিক্ষা পরিকল্পনায় আদর্শ সমাজের কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকে। একদল ব্যক্তিত্বের বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, অপরদল শিশুকে সামাজিক আদর্শে গড়িয়া তুলিবার নীতি সমর্থন করেন। একদল মনে করেন যে, শিক্ষা সমাজের রীতি-নীতি, চিন্তাধারা ইত্যাদির উর্ধ্বে থাকিবে (মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজ অপেক্ষা উর্ধ্বে) এবং শিক্ষার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই সমাজেরও উন্নতি হইবে। অপরদলের ধারণা এই যে, ব্যক্তি কখনও সমাজকে অতিক্রম করিতে পারে না: শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সমাজীকরণের (Socialisation) ফলে সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির (potentialities) পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে যুগ যুগ ধরিয়া সমাজ যে জ্ঞান সঞ্চয় ও যে কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে এবং যে ভাবধারা এবং আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে শিশুমনে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকটা অতীন্দ্রিয়বাদের ভিত্তিতে গঠিত; উহার সবটা যেন ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাহিরে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের কোন স্থান নাই; উহার সবটাই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে সমাজের সহিত শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে; শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে সমাজের অনুকরণ করিয়া স্থির করিলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এই যে, সমাজজীবনের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন কিছুকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত নহে। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত এই যে, ছাত্রকে যথাসম্ভব নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে; সমাজের সংগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের ফলে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে সমাজ হইতে দূরে তপোবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত

হইত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে দূরে শান্তিনিকেতনে তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা কিন্তু বিপরীত—সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ব্যতীত শিক্ষাকার্য চলিতেই পারে না। এমন কি বিদ্যালয়কে একটি ছোটখাটো সমাজরূপে গড়িয়া তুলিয়া উহার সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে উহারা শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অবদান— পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কাহারও অবদান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষক এবং বিষয়-কেন্দ্রিক (Subject-centred) প্রতিষ্ঠান হইতে শিশু-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের জন্য আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বীকরণের (Psychologise) নীতিও আমরা উপরোক্ত মতবাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শিক্ষাকার্যে মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকমের যুগান্তকারী পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হইতেছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। পূর্বে শৃঙ্খলারক্ষা অর্থে আমরা শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে দমন করাই বুঝিতাম। স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও শ্রেণীতে ছাত্রগণ জড়বৎ চুপ করিয়া থাকিবে, শিক্ষকের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক তাহা অনুধাবন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, ইহাই ছিল আমাদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিশু-প্রকৃতিকে দমন করার প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না; আগ্রহের অনুকূলে কাজের সুযোগ পাইলে শিশু নিজ হইতেই প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলারক্ষা করিয়া চলিবে। নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া শিক্ষকের বক্তব্য শুনা অপেক্ষা কর্মচঞ্চল হইয়া নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা করিলেই শিশু প্রকৃত শিক্ষা পাইবে, এই ধারণার ফলে পাঠদানকালে আমাদের শ্রেণীকক্ষগুলির রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। ইহাও অনেকখানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা এবং আগ্রহের অনুকূলে তাহার শিক্ষা পরিচালিত হইবে এই নীতিও বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইতেই প্রাপ্ত। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ঐ সব বিদ্যালয়ে সকল ছাত্র এক বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে পৃথক পৃথক বিষয় শিক্ষার সুযোগ পাইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের অবদানও খুব অল্প নহে। শিক্ষা যে বর্তমানে অধিকতর বাস্তবধর্মী হইয়াছে এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যে শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে ইহা প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রবাদেরই অবদান। মানুষকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে না পারিলে তাহার শিক্ষা যে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যাইবে—এই স্বীকৃতি সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের ফল। বর্তমানে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন-গঠনের জন্য যে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির উপর যে জোর দেওয়া হয় তাহা সমাজতন্ত্রবাদের প্রত্যক্ষ অবদান। সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ যে অনেকাংশে শিক্ষার ফল, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, চারিত্রিক গুণাবলী, আদর্শবাদ প্রভৃতি যে শিক্ষার সাহায্যে পরিবর্তন করা সম্ভব এই বিশ্বাস সমাজতন্ত্রবাদই আমাদিগকে দিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান—শিক্ষা সম্বন্ধে সকলে একমত পোষণ করিবে ইহা আশাও করা যায় না এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। আমরা যাহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাহারা সকলকে এক ছাঁচে গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী নহি; তাই আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার পক্ষপাতী। তথাপি শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুতর মতদ্বৈধ থাকাও উচিত নহে। একই কার্যে ব্রতী বিভিন্ন লোকের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য না থাকিলে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। একই বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যদি পরস্পর-বিরোধী ধারণা থাকে তবে একের কার্যের প্রভাব অপরের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। বিশেষ করিয়া আমরা যখন আমাদের সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তখন ঐ সমাজব্যবস্থার গঠনের তথা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একমত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোনটাকেই আমাদের অবহেলা করা চলে না; শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়বাদেরই যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তারপর কোন বাদের সমর্থক লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। তাই বাস্তবক্ষেত্রে এই দুই বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কিনা চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়—যাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরস্পর-বিরোধী ব্যবহারেরও সৃষ্টি না হয়।

ব্যক্তি যদিও সমাজ দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত তথাপি নিতান্ত একদেশদর্শী না হইলে, সমাজ হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। একই সমাজে একই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করিয়াও মানুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। সমাজজীবনের উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবনে পৃথক উদ্দেশ্যও বর্তমান থাকে। সে সমাজের অংশ হইয়াও স্বতন্ত্র। তাহার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা সমাজের সঙ্গে এক হইয়াও ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই যে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায় এ-কথা কোন আধুনিক বিজ্ঞানই আজ পর্যন্ত অস্বীকার করিতে পারে নাই। সমাজদ্বারা প্রভাবিত হইলেও প্রত্যেক মানুষের জন্মগত গুণাবলী তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। তারপর ব্যক্তি যে সমাজের উর্ধ্বে উঠিয়া নিজ চেষ্টায় সমাজের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে ঐরূপ উদাহরণ কোন দেশেই বিরল নহে। উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী ব্যতীত অপর সকলেই উপরোক্ত বাস্তব সত্যগুলিকে স্বীকার করেন।

অপরপক্ষে সমাজকে ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র মনে করিলে ভুল করা হইবে। সমাজ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ; তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিণতি বিদ্যমান। মৃত্যু বা দেশত্যাগের ফলে সমাজের সভ্যের পরিবর্তন হইলেও সমাজের পরিবর্তন হয় না। সমাজ আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে আপন নিয়মে বিকাশলাভ করিতে পারে। ব্যক্তির বিকাশ এবং সমাজের বিকাশে যে পার্থক্য রহিয়াছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহাও সত্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের মত সমাজে সমাজেও পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব গঠন ও বিকাশভঙ্গী আছে এবং উহাদের দ্বারা সমাজের সভ্য-মাত্রেই প্রভাবিত হয়। মানুষ যে অনেকখানি সমাজেরই সৃষ্টি এ-কথা আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। সমাজজীবনের মধ্যেই ব্যক্তি নিজ জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পায়। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিত্বের কল্পনা করা অবাস্তব। উপরোক্ত বাস্তব সত্যগুলিও সর্বজনস্বীকৃত।

ব্যক্তি এবং সমাজ কাহারও স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না; উভয়কেই আমাদের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককে উপেক্ষা করিয়া অপরের উপর সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা সঙ্গত নহে। বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একের উন্নতি অপরের বিনিময়ে সম্ভব নহে। ব্যক্তি

এবং সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—একের উন্নতি স্বাভাবিক নিয়মেই অপরের উন্নতির নিয়ামক এবং একের অবনতি একই নিয়মে অপরের অবনতির কারণ। আদর্শ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে তাহা অবশ্যই সমাজকে উন্নততর করিবে আবার সমাজ-ব্যবস্থা উন্নততর হইলে তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হইবে। যেখানে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করা হয় সেখানে উভয়েরই পতন হয়। প্রাচীন এথেন্সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়া দেশের পতন ঘটাইয়াছিল। প্রাচীন স্পার্টায় সমাজের সংকীর্ণ প্রয়োজনে ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করার ফলে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের কৃষ্টির বিকাশলাভ ঘটে নাই; ফলে দেশের সামরিক শক্তিও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলিলে উভয়েরই মঙ্গল।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমাজ সব সময়ে হাত মিলাইয়া নাও চলিতে পারে। পরস্পরের প্রয়োজনেই হয়ত সাময়িকভাবে একের বিকাশ অপেক্ষা অপরের বিকাশের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বর্তমানে শিল্পবিপ্লবকে দ্রুততর করার নিমিত্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অধিক সংখ্যক কারিগরের প্রয়োজন। এই কার্যে সফল হইলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই মঙ্গল। কাজেই বিশেষ প্রচার দ্বারা এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দ্বারা আমরা যদি অধিক সংখ্যক লোককে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করি, তবে তাহাতে সমাজকে প্রাধান্য দেওয়া হইলেও, শেষ পর্যন্ত উহার ফলে ব্যক্তিরও মঙ্গল হইবে; দেশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করিবে। সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে কখন কাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে তাহা বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে স্থির করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব এবং সমাজ উভয়ের বিকাশের কথাই একসংগে ভাবিতে হইবে। তাই এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আমরা নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি—**সমাজের সভ্যরূপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য** (The aim of education is the highest development of the individual as a member of the society).

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ (Pragmatism)—ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার যে নীতি উপরে আলোচিত

হইয়াছে তাহার দার্শনিক সমর্থন পাওয়া যায় প্রয়োগবাদের মধ্যে। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে সামঞ্জস্য বিধানই—এই মতবাদের প্রধান নীতি। প্রয়োগবাদের জন্ম আমেরিকায়। পরিবর্তনশীলতা (Dynamism) এবং আপেক্ষিকতা (Relativity) এই মতবাদের ভিত্তি স্বরূপ। জীবন প্রগতিশীল ; আজ যাহা সত্য কাল তাহা সত্য নাও থাকিতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই হউক আর শিক্ষার উদ্দেশ্যই হউক পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখা সম্ভব নহে। জীবনের পথে চলিতে চলিতেই তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হইবে, শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে। কর্ম এবং তাহার উদ্দেশ্যকে পৃথক করা চলিবে না। আবার কোন কিছুরই উদ্দেশ্য স্থির থাকিতে পারে না—জীবনের চলার পথে বার বার তাহার উদ্দেশ্য নূতন নূতন রূপে দেখা দিবে—শিক্ষা গ্রহণকার্য অগ্রসর হওয়ার সংগে সংগে প্রতি পদে তাহার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটিবে। তাই প্রয়োগবাদের ঋষি ডিউই শিক্ষার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করেন নাই। তাঁহার মতে প্রতি স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহার পরের স্তরের শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সর্বকার্যে প্রগতিই একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যতিক্রমের কোন কারণ নাই।

আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে কোন কিছুই দেশ, কাল পাত্র নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এক সমাজের পক্ষে যাহা সত্য অপর সমাজের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে ; আজকের সত্য কাল মিথ্যা প্রতিভাত হইতে পারে ; একজনের পক্ষে যাহা ভাল অপরের পক্ষে তাহা হয়ত ভাল নহে। তাই প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক সমাজের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। প্রয়োগবাদ "সর্বজনীন" শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী নহে।

প্রধানতঃ বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রয়োগবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রয়োগবাদের মতে ভালমন্দের বিচার পূর্ব হইতে করা চলে না—প্রয়োগের দ্বারাই (Experiments) ভালমন্দ বিচার করিতে হয়। কখনও হয়ত সমাজের বিকাশের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিলে বাস্তবে অধিক লাভবান হওয়া যায়, আবার কখনও হয়ত ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে বাস্তব ফল ভাল হয়। সংক্ষেপে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা অবলম্বন করাই প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব। জীবনদর্শন হিসাবে প্রয়োগবাদের প্রভাব খুব বেশী না হইলেও শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহা প্রায় সর্বজন সমাদৃত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে

কার্যকরী সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষমতাই রহিয়াছে ইহার মূলে। উপরোক্ত উভয় মতবাদী লোকেরাই ইহাতে নিজ নিজ মতের সমর্থন দেখিতে পান। শিক্ষাবিদ্ রাস্কের (Rusk) কথায় প্রয়োগবাদ "নয়া আদর্শবাদ" সৃষ্টির একটি স্তর মাত্র ; এই আদর্শবাদ বাস্তবকে তাহার যথাযথ স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় না। উহা পার্থিব এবং অধ্যাত্ম আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং সার্থক সংস্কৃতির সৃষ্টি করিবে (Pragmatism is merely a stage in the development of a new idealism......an idealism that will do full justice to reality, reconcile the practical and spiritual values and result in a culture which is the flower of efficiency and not the negative of it.) প্রয়োগবাদ মানুষকে কোথাও খর্ব করে নাই ; এবং সোফিষ্টদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তাহার কার্যের দ্বারা নিজের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিবে ইহাই প্রয়োগবাদের মত। অপরদিকে প্রয়োগবাদীরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, মানুষের ভালমন্দের বিচার সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের প্রধান মুখপাত্র ডিউই অনেক ক্ষেত্রেই সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। তিনি তাঁহার "ডেমোক্রেসি এণ্ড এডুকেশন" (Democracy and Education) গ্রন্থে সমাজের স্থিতিকরণ (Perpetuation of Society) যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ডিউই-এর "এক্সপিরিয়েন্স এণ্ড এডুকেশন" (Experience and Education) গ্রন্থের একমাত্র প্রামাণ্য বিষয়বস্তু হইতেছে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব তাহার নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সৃষ্ট হয় এবং সমাজজীবনই অভিজ্ঞতালাভের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। বিদ্যালয়ের জীবন সমাজজীবনের অনুসরণে গঠন করার নীতি প্রয়োগবাদীরাই প্রচার করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে বিশেষভাবে উহাকে সমর্থন করিবার জন্যই যেন প্রয়োগবাদের সৃষ্টি।

"করে শিখো" (Learn by doing) আধুনিক শিক্ষার এই নীতি প্রয়োগবাদের আর একটি অবদান। এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষার বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে "প্রজেক্ট মেথড্" (Project Method) সমাদৃত হইয়াছে। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশকালে আমরা যে উহাকে একটি দ্বি-কেন্দ্রিক কার্য (Bipolor process) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি তাহাও বিশেষভাবে প্রয়োগবাদেরই ফল। তারপর

সাধারণভাবে এক কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় না করিয়া বর্তমানে আমরা শিক্ষার স্তর হিসাবে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সমাজে সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে বিভিন্ন হইবে এ সম্বন্ধে তো কোন কথাই উঠিতে পারে না। সামাজিক পারিপার্শ্বিকের বিভিন্নতার জন্য সমাজে সমাজে ব্যক্তির চাহিদা (needs) বিভিন্ন হইবে। ঐ চাহিদা পূরণের ভিতর দিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে সকল সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও সমাজে সমাজে বিভিন্নতা দেখা যাইবে এবং ঐসব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শিক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করিতে হইলে সমাজে সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ণে উপরোক্ত নীতিগুলিকে আধুনিকতম নীতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নীতিগুলি বিশেষ করিয়া প্রগতিবাদেরই অবদান।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য মত—শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণ নানাপ্রসঙ্গে নানা মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐসব মতামত সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং প্রয়োগবাদ হইতেই তাহাদের প্রেরণা পাইয়াছে; উহাদিগকে স্বাধীন মতবাদ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

সম্পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য—রুশোর প্রকৃতিবাদ যখন শিক্ষাকে বাস্তবতা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, মানবতাবাদ যখন শিক্ষার নামে পুস্তকের কতকগুলি অর্থহীন বুলি মুখস্থ করাইতেছে বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার তখন শিক্ষাকে বাস্তবতামুখী করার নীতি প্রচার করেন। তাঁহার মতে "সম্পূর্ণ জীবন" যাপনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করিলে এবং কোন্ কোন্ চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হইলে সম্পূর্ণ জীবনযাপনের উপযুক্ততা জন্মায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্পেন্সার পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—১। শরীরতত্ত্বের জ্ঞান, ২। সন্তান পালনের দক্ষতা। জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা, ৪। সুনাগরিক হওয়ার যোগ্যতা, ৫। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পেন্সারের উপরোক্ত

মত সমাজতন্ত্রবাদধর্মী চিন্তাধারা-প্রসূত। সামাজিক জীবনে আমাদের যে সব প্রধান প্রধান দায়িত্ব (মাতা-পিতার দায়িত্ব, জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব, নাগরিকের দায়িত্ব) পালন করিতে হয় তাহাদের জন্য প্রস্তুতিকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করিয়া তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশকেও যে শিক্ষা অবহেলা করিতে পারে না সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু "সম্পূর্ণ জীবনের" প্রস্তুতির জন্য তিনি যে বিষয়বস্তুর তালিকা দিয়াছেন তাহা সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী উভয়ের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হইবে। বস্তুতপক্ষে স্পেনসারের মতবাদকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ক্রমবিকাশের একটি স্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ব্যাপকতর অর্থে "সম্পূর্ণ জীবন" উক্তিটির সাহায্যে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়কেই আমরা "সম্পূর্ণ জীবনের" অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি এবং উভয় জীবনের জন্য প্রস্তুতিকেই আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

সঙ্গতিবিধানই (Adjustment) **শিক্ষার লক্ষ্য**—শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষ করিয়া মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ত্ব বায়লজি (Biology) দ্বারা প্রভাবিত হয়; ফ্রয়েড্, ম্যাকডুগেল প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকগণ মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা (instincts) তাহার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যদিও সমাজই এই প্রবণতা-গুলির পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র তথাপি ইহারা প্রকৃতিতে আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজবিরোধী। মানুষের, নিজের জন্য বস্তু সংগ্রহের (Acquisitive instinct) প্রবণতাকে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাউক। সমাজ হইতেই নিজের প্রবণতার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, অথচ যথেচ্ছভাবে মানুষ যদি এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করে তবে সমাজ স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে মানুষকে সমাজ বা পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের প্রবণতার সঙ্গতিবিধান (Adjustment) করিয়া চলিতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান সমাজের জন্য যতখানি প্রয়োজন, মানুষের নিজের জীবনের জন্যও ততখানি প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজের প্রবণতার সঙ্গতিবিধান না করিতে পারিলে মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্ব (mental conflict) দ্বারা পীড়িত হয়: এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছাইলে মানসিক

বিকৃতি ঘটে। অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষের প্রবণতা এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সঙ্গতি ঘটিয়া থাকে। ফলে মানুষ পুরাতন আচরণ পরিত্যাগ করে এবং নূতন আচরণ গ্রহণ করে। সমগ্র জীবনব্যাপীয়াই চলে এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। শিক্ষা এবং সঙ্গতি বিধান প্রায় সমার্থবাচক। শুধু সামাজিক পারিপার্শ্বিক কেন প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের সহিতও মানুষকে সঙ্গতি বিধান করিয়া চলিতে হয়। মানুষের দেহযন্ত্র আপন স্বভাবেই তাহা করিতে চেষ্টা করে। তারপর মানুষ নিজেও প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা করে—প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টার ফলে সামাজিক অভ্যাস, আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু "সঙ্গতি বিধান" এই উক্তিটি মাত্র শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। কোন্ কোন্ প্রবণতার সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করা হইবে, ঐ চেষ্টাই বা কি ভাবে করা যাইবে, কি ধরণের সঙ্গতি বিধান আদর্শ সঙ্গতি-বিধান বলিয়া গণ্য হইবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এই উক্তি হইতে পাওয়া যায় না। ইহা শিক্ষাকার্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনায় ইহার ব্যবহার সমীচীন নহে।

তারপর, যে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তিতে এই উক্তি করা হইয়া থাকে আজ কাল তাহা সর্বজন স্বীকৃত নহে। মানুষের জন্মগত প্রবণতা যে স্বভাবতই সমাজ-বিরোধী হইবে ইহা সত্য নহে। ব্যক্তি এবং-সমাজ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, তাহাদের মধ্যে সব সময়ই দ্বন্দ্ব চলিবে ইহা অনেকেই অস্বীকার করেন। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা "অসৎ" না হইয়া "সৎ" হওয়াই বেশী স্বাভাবিক, কারণ মানুষ সৃষ্টির অংশ, ভগবানের প্রতীক। কাজেই সঙ্গতি বিধানের প্রশ্ন না তুলিয়া বিকাশের প্রশ্ন তোলাই অধিকতর সঙ্গত। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সঙ্গতি ঘটিবে এই ধারণার পরিবর্তে পারি-পার্শ্বিকের সংস্পর্শ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে উহাদের বিকাশ ঘটিবে এই ধারণা পোষণ করা অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

বৃত্তি সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য—কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বৃত্তি সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকেই (vocational efficiency) শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আদর্শবাদ প্রভাবিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতবাদ বৃত্তি-সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকে কখনও বিশিষ্ট স্থান দেয় নাই। কিন্তু কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই কখনও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতেও পারে নাই। প্রাচীন ভারতে

বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকে যজন-যাজন ইত্যাদি বৃত্তির জন্য এবং ক্ষত্রিয়কে সৈনিক বৃত্তির জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্তমানে শিক্ষা যত সার্বজনীন হইতেছে বৃত্তিশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা ততই অধিক অনুভূত হইতেছে। প্রাচীন এথেন্স বা রোমে "নাগরিকেরাই" (Citizens) শিক্ষাগ্রহণ করিতেন এবং দাসেরা (Slaves) তাহাদের জন্য (কৃষি, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা) জীবিকার্জন করিত। ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনায় জমিদারগণ এবং ব্যবসায়ীরা সামাজিক মর্যাদার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেন। জীবিকা অর্জনের জন্য ইহাদের কাহারও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তাই বৃত্তি সংস্থানের জন্য প্রস্তুত না করিয়া শিক্ষা ছাত্রদের মানসিক উন্নতির (liberate the mind) দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় সকলকেই ভবিষ্যতে অন্ন সংস্থানের কথা চিন্তা করিতে হয়। তারপর দিনদিনই বৃত্তিগুলি জটিল হইয়া পড়িতেছে। পূর্বের মত শিক্ষানবিশী করিয়া তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। প্রায় সকলবৃত্তির জন্যই দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষা (formal education) গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি অনেক সমাজেই (বিশেষ করিয়া আমাদের সমাজে) বর্তমানে বেকার সমস্যা প্রবল-ভাবে দেখা দিয়াছে। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে জীবিকা সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি না দিলে শিক্ষা যে অনেকখানি অর্থহীন হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতেই জীবিকা-সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। জীবিকার্জন মানুষের সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান কার্য। কিন্তু জীবিকার্জন ব্যতীত সমাজজীবনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মানুষকে লিপ্ত হইতে হয় (যথা, মাতা বা পিতার কর্তব্য পালন, নাগরিকের কর্তব্য পালন ইত্যাদি) শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে ঐগুলির উল্লেখ না করিয়া শুধু বৃত্তিসংস্থানের যোগ্যতা অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে শিক্ষার লক্ষ্য যে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিসংস্থান মানুষের তথা সমাজজীবনের উদ্দেশ্য নহে ; উহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে পারিলেই মানুষের জীবন সার্থক হয় না ; শুধু সম্পদ সৃষ্টির দ্বারাও কোন সমাজের

কৃষ্টির উন্নতি হয় না। মানুষ অর্থোপার্জনের যন্ত্রমাত্র নহে। মানুষকে ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে, তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নহে ; আর ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট বিকাশ না হইলে শিক্ষা যে অনেক খানিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথাযথ ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে না পারিলে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত উভয় জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির ফলে অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা অধিকতর বৃত্তিমুখী হইয়া পড়িতেছে এবং অতি অল্প বয়স হইতেই আমরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছি। ফলে আমরা একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছি। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার দরুণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হইতেছে—পূর্ণ মানুষ হইয়া আমরা গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রকম শিক্ষায় বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিষয়ের (General subject) শিক্ষার উপরও গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে। সম্পূর্ণরূপে বৃত্তি শিক্ষার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিও (Polytechnique, Medical College ইত্যাদি) এই নীতি অনুসরণ করিতেছে।

অবশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তিসংস্থান সমাজজীবনে যত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই হোক না কেন অন্ততঃ বয়সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত শিশুর এই সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা থাকে না। তাই শিক্ষাকে যদি শিশুর চাহিদা (needs) অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় তবে বৃত্তিশিক্ষা দানকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

সুনাগরিক গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে সুনাগরিকতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনের প্রতি স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে হইলে উহার নাগরিকদের উহা পরিচালনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভোটদানের দ্বারাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উহার পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত উপরোক্ত দায়িত্ব দুইটি প্রতিপালন করা সহজ নহে। ভারত একটি নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ; ভারতের সমাজব্যবস্থা এখনও এমনভাবে গঠিত হয় নাই যাহাতে সমাজজীবনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করা যায়। তাই উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিবার বিশেষ দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ না করিলে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

স্থাপনের চেষ্টা হয়ত সফল হইবে না। সমাজ গণতান্ত্রিক নীতিতে গঠন করিয়া ছাত্রদের গণতান্ত্রিক শিক্ষাদানের সুযোগও প্রচুর পরিমাণে আছে।

সুনাগরিক গড়িয়া তোলাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করার মূলেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু সুচারুরূপে নাগরিকের কর্তব্য পালন মানুষের সমাজজীবনের চাহিদার অন্যতম মাত্র। রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ব্যতীত মানুষের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও আছে এবং ঐসব জীবনের জন্য প্রস্তুতিও শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

তারপর ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি সমাজ জীবন ব্যতীত ও মানুষের স্বতন্ত্র জীবন আছে। সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে লাগুক আর নাই লাগুক মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে। কাজেই কেবলমাত্র সুনাগরিক গড়িয়া তোলাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকে।

অনুশীলনী

Q. 1. "A complete and generous education is that which gets a man to perform justly, skilfully and magnanimously, all the offices both public and private. Critically examine the statement."

(B.T- C.U. 1960)

Ans. (পৃঃ ২৯—৪১)

Q. 2. What do you understand by the individualistic and socialistic aims of education? Which would you advocate and why?

(B.A. Edc. C.U. 1959)

Ans. (পৃঃ ২৩—৪১)

Q. 3. The general aim of education should be to offer the fullest possible scope to individuality while keeping in view the claims and needs of society.

(B.T. C.U. 1956)

Ans. (পৃঃ ১৯—৪১)

Q. 4. How can the demands of personal development and the needs of society be met by education in a democratic society?

(B.T. C.U. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৯—৪১)

Q. 5. Education teaches social adjustment. Consider the definition and attempt a more comprehensive definition of education.

(B.T. Edu. C.U. 1957)

Ans. (পৃঃ ২৯—৪১)

Q. 6. The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to nature or of the social environment.

(B.T. C.U. 1952)

Ans. (পৃঃ ৪৩—৪৬)

Q. 7. Since the child is destined to live out his life not as an abstract individual but as a member of the community we may consistently define education as the making of the good citizen.

Develop the idea of the aim of education keeping the above aspect in mind. (B.T. C.U. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৯—৪১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষালাভের কয়েকটি ক্ষেত্র

প্রতিষ্ঠান শব্দের অর্থ—মানুষ যখন পরস্পরের চাহিদা (needs) মিটাইবার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখনই হয় সমাজের সৃষ্টি। প্রত্যেক সমাজেই এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ "মিলনক্ষেত্র" গড়িয়া উঠে। ঐ মিলনক্ষেত্রগুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান (social institution) আখ্যা দেওয়া হয়। ধরা যাউক, পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষের পারস্পরিক চাহিদার (needs) ভিত্তিতে ইহা প্রথম সৃষ্টি হয়। সন্তান-সন্ততির জন্মের পর হইতে ইহার পরিধি বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সকল সভাই পরস্পর পরস্পরের কোন না কোন চাহিদা নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। "ক্লাব"কে আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা যাইতে পারে—এখানে মোটামুটি একই ধরণে অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে সভ্যরা পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের চাহিদা নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করেন। সকল সমাজে যে একই ধরণের "মিলনক্ষেত্র" বা প্রতিষ্ঠান থাকে এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সকল সমাজে পরিবারের গঠনভঙ্গী একরূপ নহে (মাতৃপ্রধান, পিতৃপ্রধান পরিবার ইত্যাদিতে বিভিন্নতা রহিয়াছে)। সমাজ নিজ প্রয়োজনে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া থাকে,—যেমন কিছুদিন পূর্বে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠান হিসাবে "ক্লাবের" অস্তিত্বও ছিল না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা—প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্জাত হয় তাহা হইতেই আমরা শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। কাজেই প্রত্যেকটি সামাজিক মিলনের ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা-লাভের ক্ষেত্রও বটে। সুশিক্ষাই হউক আর কুশিক্ষাই হউক মানুষ যখন পরস্পরের প্রয়োজনে পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহার শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া নিষ্কৃতি নাই। ধরা যাউক "বাজার" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান; এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা একত্র মিলিত হইয়া (নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত) সহজেই দরকষাকষি শিক্ষা করিয়া থাকে। সমাজের সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার

উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করিলেও ইহাদের মধ্যে কয়েকটির উপর সমাজ তাহার সভ্যদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়—এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিদ্যালয় সর্বাগ্রগণ্য। বিদ্যালয়ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা কেবল্ শিক্ষার চাহিদা নিবৃত্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীনতম সমাজে যে বিদ্যালয় ছিল না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সমাজের অন্যান্য প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান (পরিবার, ধর্ম ইত্যাদি) সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাদের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করা যাইত। পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হওয়ার পর বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সমাজের অগ্রগতি এবং জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে সভ্যতা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, বিদ্যালয় ব্যতীত ইহার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। প্রতি সভ্য দেশেই কত রকম উদ্দেশ্য লইয়া কত রকম বিদ্যালয় যে স্থাপিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে প্রথমেই শিক্ষার স্তর হিসাবে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া লইতে হয়। শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই তিন স্তরে সাধারণতঃ ভাগ করা হয়। যাঁহারা সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যও "সমাজকেন্দ্রে" বা বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে (জনতা মহাবিদ্যালয়) প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ফলে বর্তমানে তিন স্তরের পরিবর্তে চারি স্তরে (সমাজস্তর সহ) প্রত্যক্ষ শিক্ষার আয়োজন করা হইয়া থাকে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য সাধারণতঃ এক ধরণের বিদ্যালয়ই স্থাপিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—সমাজে জীবন যাপন করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং কৌশল এবং চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা করাই প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর তাহাকে এমনভাবে প্রস্তুত করিবে যাহাতে সাধারণ সমাজ-জীবন যাপন করার কালে সে নিজ চেষ্টায় তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারে। প্রাথমিক স্তরে সকলকে মোটামুটি একই ধরণের বিদ্যালয়ে একই ধরণের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—সকলে অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া একই ধরণের শিক্ষা পাইলে সমাজ-জীবন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিক হইতে

বিবেচনা করিলেও শিক্ষার প্রথম স্তরে সকলের একই ধরণের সুযোগ পাওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ না দিলে সমাজে কখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ কেবলমাত্র আমাদের দেশেই প্রাথমিক স্তরে "সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়" এবং "বুনিয়াদী বিদ্যালয়", এই দুই রকমের প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। সুখের বিষয় এই যে, দিন দিনই এই দুই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে। অগ্রসর দেশগুলি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে বহুদিন হইতে বাধ্যতামূলক করিয়া ফেলিয়াছে। সমাজে বাস করিতে হইলে এই স্তরের শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা লওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই, রাষ্ট্রই ইহার ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসরের মধ্যে ভারত প্রাথমিক শিক্ষা (১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, কিন্তু আজও তাহা সম্ভব হয় নাই। এদিকে অগ্রসর দেশগুলি দিন দিনই বাধ্যতামূলক শিক্ষার কালকে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। ব্রিটেনে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অনেকে হয়ত সোজাসুজি জীবনে প্রবেশ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে উহাদের জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে আরও কিছুদিন আংশিক সময়ের জন্য (part time) প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। যেসব ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়া ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য; সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিশেষ ধরণের শিক্ষা (Specialised education) দেওয়ার চেষ্টাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যাহারা সমাজে প্রবেশ করিবে তাহারাই হইবে সমাজের মেরুদণ্ড। সর্বক্ষেত্রে সমাজের স্থিতি ও অগ্রগতি ইহাদেরই উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র, সমাজের প্রবেশপত্র মাত্র, কারণ ঐ শিক্ষার সাহায্যে সমাজকে সমৃদ্ধ করার উপযুক্ত ক্ষমতা জন্মায় না। এমন কি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন (Specialised qualifications) যেসব লোকের প্রয়োজন তাহাদিগকেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে না। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা অনেকেরই থাকে না। সমাজের সাধারণ কার্য-পরিচালনার জন্য ঐ শিক্ষার প্রয়োজনও হয় না। সমাজের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বিশেষভাবে গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ করার

নিমিত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন। স্বভাবতই সমাজ মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কোন-না-কোন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী মোটামুটি সমাজের সকল কার্যেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে সমাজের মেরুদণ্ড বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও বলিতে হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যক্তিকে তাহার জীবনের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দিতে না পারিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার উপর নির্ভর না করাই উচিত। তাই সমাজের অধিকাংশ লোকই যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ :—

১। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে নাগরিক হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন (training of character to fit the students to participate creatively as citizens in the emerging social order).

২। ছাত্রগণ যাহাতে দেশের সম্পদবৃদ্ধির কার্যে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য বাস্তব এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা ("improving their practical and vocational efficiency, so that they may play their part in building up the economic prosperity of the country.")

৩। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে সাহিত্য, চারুকলা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহ জাগাইয়া তোলা ("developing their literary artistic and cultural interests which are necessary for self-expression and for the full development of human personality.")

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করিতে গিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উভয় মতের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উপরে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুইটি বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীরা এবং শেষেরটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমর্থন করিবেন।

কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধিত করিতে হইলে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক ধরণের হইলে চলে না। মানুষের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিভিন্নতার কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার দিন দিনই আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের জন্য সাধারণভাবেও যদি কিছুটা প্রস্তুতি করাইতে হয় তাহাতেও বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই। আমাদের দেশে বর্তমানে যেসব বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এইসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিন বৎসর পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত গ্রাম অঞ্চলেই ঐ ধরণের বিদ্যালয় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থের অপ্রতুলতার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রথমে নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি খোলা হয় এবং আশা থাকে যে পরে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি খুলিয়া উহাকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা যাইবে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি ব্যতীতও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থায় নিজস্ব স্থান রহিয়াছে। বর্তমানে সমাজ-জীবন যেরূপ জটিল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া) শেষ করিয়া সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবার কোনরূপ যোগ্যতা জন্মায় না। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে (সাধারণ শিক্ষা বা general education) আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য না থাকার দরুণ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোন বিভিন্নতা থাকে না— সকল ছাত্রই এখানে একই ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে এই স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে ঐরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা নিজ নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করা যায়। আবার কেহ কেহ বা সোজাসুজি সমাজ জীবনেও প্রবেশ করিতে পারে।

পলিটেকনিক (Polytechnic) বা ঐ জাতীয় বিদ্যালয়—নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের নিম্নতর কোর্স

(trade course) গুলিতে যোগ দিতে পারে। ঐ ধরণের কোর্স সাধারণত তিন মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে। বৃত্তি শিক্ষাদানই ইহাদের উদ্দেশ্য। ছুতার (Carpenter), কামার (Blacksmith), প্যাটার্ণমেকার (Pattern-maker), মোল্ডার (Moulder), মেসিনিষ্ট (Machinist) ইত্যাদি বৃত্তির জন্য প্রস্তুতির নিমিত্ত ঐ ধরণের কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। যন্ত্র-সভ্যতার প্রসারের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঐসব বৃত্তি গ্রহণে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় নিম্ন মাধ্যমিক পাঠ শেষ করিয়া ঐসব কোর্সে প্রবেশ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যাহা হউক একথা মনে রাখিতে হইবে যে, পলিটেকনিক বিত্থালয়গুলি সাধারণ যন্ত্রপাতির কাজের শিক্ষাই দিয়া থাকে। যন্ত্রপাতি ব্যতীত, কৃষি, চারুশিল্প, কুটির-শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ছোটোখাটো বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৃৎশিল্প (Pottery), তাঁতশিল্প (Weaving), মৌমাছি-পালন (Bee-keeping), পশুপালন (Poultry) ইত্যাদি কার্যের প্রস্তুতির জন্য কোর্সের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ট্রেড্ কোর্সগুলি পরি-সমাপ্তির পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষার্থীদিগকে তাহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে "সার্টিফিকেট" (Certificate) দেওয়া হয়।

পলিটেকনিক বিত্থালয়গুলিতে উচ্চতর ধরণের যেসব কোর্স থাকে তাহাতে কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পাশ না করিলে প্রবেশ করা যায় না। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর এক বৎসর বা দুই বৎসরের জন্য ঐসব কোর্স গ্রহণ করিতে হয়। ঐসব কোর্সের শিক্ষা বিশ্ববিত্থালয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহাদিগকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Draughtsmanship, Overseer, Licentiate in Civil Engineering ইত্যাদি কোর্সের উল্লেখ করা যায়। পলিটেকনিক বিত্থালয় ব্যতীত কৃষিবিত্থালয় প্রভৃতিতেও উচ্চ ধরণের বৃত্তি শিক্ষার কোর্স আছে। পলিটেকনিক বা ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হইলেও ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষা (General Education) একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

উচ্চ বুনিয়াদী বিত্থালয় (Senior Basic)—যে নীতির ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই নীতিরই ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ঐ ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই অল্প।

সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সেগুলি ছাড়া কোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই। তবে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই সুনাগরিকতার জন্য প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদি উদ্দেশ্যগুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করিতে চেষ্টা করে। ফলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে কুটিরশিল্প শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকতর বাস্তবধর্মীও বটে। পাঠশেষে প্রায় সকল ছাত্রই সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে তাহারা গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Rural University) (পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত ঐ ধরণের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে) প্রবেশ করিবে ইহাই অধিকতর সমীচীন। কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ঐসব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাধারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও কোন বাধা নাই। আশা করা যাইতেছে যে, ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ বুনিয়াদীর স্থান সম্বন্ধে আমাদের মনে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবে। গ্রামের জীবন এবং সহরের জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে যদি পার্থক্য কমিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে মোটামুটি একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দুই ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলি মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের বৃত্তিশিক্ষাদানমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে পারে। গ্রামীন বিদ্যালয়ে ঐসব বৃত্তিশিক্ষার কাজ উচ্চতর স্তরে চলিতে পারে। বর্তমান অবস্থায় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মোটামুটি একই ধরণের শিক্ষাদানের চেষ্টা করার নিমিত্ত নানারূপ বিভ্রান্তি এবং অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে।

জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুল (Junior Technical School)—এই ধরণের বিদ্যালয় এখনও পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে অনেক-গুলি জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অষ্টম শ্রেণীর পর তিন বৎসরের জন্য টেক্‌নিকেল বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। পলিটেকনিক হইতে এইসব বিদ্যালয়ের পার্থক্য এই যে, ইহাতে ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর এইরূপ বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের কোর্স নাই, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মত ছাত্রকে ঐসব বিদ্যালয়েও তিন বৎসরের জন্য

পাঠ করিতে হয়। তারপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগে সংগে "সাধারণ শিক্ষার" দিকেও পলিটেকনিক অপেক্ষা ঐসব বিদ্যালয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জুনিয়ার টেক্‌নিকেল স্কুলের পাঠশেষে (পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইলে) ছাত্রেরা পলিটেক্‌নিকের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে।

দশম শ্রেণী মাধ্যমিক বিদ্যালয়—নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে আরও দুই বৎসর অগ্রসর করিয়া "ইণ্টারমিডিয়েট" (Intermediate) স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়াই ঐসব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে "ইণ্টারমিডিয়েট" স্তর আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি কৃত্রিম সৃষ্টি—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিবেচনা করিলে ঐ ধরণের স্তরসৃষ্টির কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া ঐ ধরণের কৃত্রিম স্তর সৃষ্টির ফলে, আমাদের দেশের মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্তরের শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাই স্থির করা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর দশম শ্রেণী বিদ্যালয় থাকিবে না। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পর এক সংগে তিন বৎসরের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। দশম শ্রেণী বিদ্যালয়গুলির আর-একটি ত্রুটি এই যে, তাহারা একমুখী (Single track); ছাত্রেরা তাহাদের জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে পায় না। সমাজে নানা ধরণের বৃত্তির যেসব সুযোগ আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও ঐসব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করা হয় না। ফলে একদিকে যেমন অকৃতকার্য (Unsuccessful) ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে. অপর দিকে যেসব ছাত্র পাঠশেষে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে বা ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে পৌঁছিতেছে এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রকৃত কোন স্থান নাই।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা—নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও তিন বৎসর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়াই এই স্তরের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা শেষে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিলেও ছাত্রদের পক্ষে যাহাতে উন্নত ধরণের জীবিকা গ্রহণ সম্ভব হয়, সেদিকেও ইহারা দৃষ্টি দিয়া থাকে। দশম শ্রেণী বিদ্যালয়গুলির মত উচ্চ মাধ্যমিক

স্তরের বিদ্যালয়গুলি একমুখী নহে। ছাত্রদের জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় পাঠের সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তুই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র একটি বিশেষ বিষয় (Special Subject) পড়িবার সুযোগ থাকে আবার কোনটিতে একাধিক "বিশেষ বিষয়" (Special Subjects) পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ধরণের বিদ্যালয়কে "উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" এবং দ্বিতীয় ধরণের বিদ্যালয়কে "বহুমুখী বিদ্যালয়" বলা হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উভয় ধরণের বিদ্যালয়ই উচ্চ মাধ্যমিক পদবাচ্য। এই তুই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে মাত্র একটি বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি ঐ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র "সাহিত্য"ই বিশেষ বিষয়রূপে পাঠের সুযোগ আছে; এবং শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একাধিক বিষয়ের মধ্যে (সাধারণতঃ তুই, তিন বা চারিটি) যে-কোন একটি বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা সাহিত্য (Humanity), বিজ্ঞান (Science), বাণিজ্য (Commerce), চারুকলা (Fine arts), কৃষি (Agriculture) এবং গার্হস্থ্য বিদ্যা (Home Science)—এই ছয় রকমের বিশেষ বিষয়ের মধ্যে একটি পাঠ্য হিসাবে বাছিয়া লওয়ার সুযোগ পায়। এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শেষ অধ্যায়ে করা হইবে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ (Senior Cambridge) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এখনও পশ্চিমবঙ্গে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলি ছাত্রদের ব্রিটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ সব বিদ্যালয় বিশেষ করিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের (Anglo-Indian) জন্যই স্থাপিত এবং উহাদের শিক্ষার মাধ্যম হইতেছে ইংরেজী। কিন্তু বর্তমানে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতীত আরও অনেকে (বিশেষ করিয়া ধনিসম্প্রদায়) এই শিক্ষার সুযোগ লইতেছেন। এই শিক্ষাকে বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা বলা যাইতে পারে। এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিলে ছাত্র ভারতীয় যে-কোন বিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের দ্বিতীয় বর্ষে (2nd year) ভর্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রথম বিভাগে পাশ না করিয়া অন্য কোন বিভাগে পাশ করিলে ঐ পরীক্ষার ফল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সমতুল্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

পাব্লিক্ স্কুল (Public School)—ইংলণ্ডের পাব্লিক্ স্কুলের অনুকরণে ভারতেও কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় পাব্লিক্ স্কুল সমিতির সভ্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত পাব্লিক্ স্কুলগুলি আবাসিক বিদ্যালয়— ছাত্র এবং শিক্ষক একসঙ্গে বিদ্যালয়ের এলাকায় বাস করেন। শিক্ষার্থীর চরিত্রবিকাশের উপর ঐ ধরণের বিদ্যালয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। যে-সব ছাত্র ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহারা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে ঐরূপ আশা করে। অনেক পাব্লিক্ স্কুল সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে। পাব্লিক্ স্কুল পাঠের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। বর্তমানে ভারত সরকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র যাহাতে পাব্লিক্ স্কুলে পঠের সুযোগ পায় তন্নিমিত্ত প্রতি বৎসর কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের কথা পর্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারে :—১। এখনও আমাদের দেশের প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী—দশম শ্রেণীর বিদ্যালরই হউক আর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই হউক সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করিতেছে। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে অন্ততঃ ¾ অংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া প্রত্যক্ষ জীবনে প্রবেশ করে। পলিটেকনিক প্রভৃতি যেসব বিদ্যালয় ছাত্রদের প্রত্যক্ষ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছে—তাহাদের সংখ্যা এখনও খুব অল্প। তারপর উহারা এখনও যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা অর্জন করিতে পারে নাই। সহজে কোন ছাত্রই ঐ ধরণের বিদ্যালয়ে যোগ দিতে চায় না। ২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বহুমুখী করিবার চেষ্টা করা হইলেও এখনও যথেষ্ট সংখ্যক "বহুমুখী বিদ্যালয়" স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। অধিকাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র "সাহিত্য" বিশেষ বিষয়রূপে পড়িবার সুযোগ আছে, কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে "বিজ্ঞান" পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু সাতটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে অপর পাঁচটি পড়িবার সুযোগ খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই আছে। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও বহুমুখী হয় নাই। ৩। মাধ্যমিক শিক্ষাকে আমরা যে নূতনরূপ দিতে চেষ্টা করিতেছি তাহাতে দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ের কোন স্থান নাই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ই একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারিয়াছে। আর বহুমুখী বিদ্যালয় না হইয়া শুমাত্র একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় হওয়া সঙ্গত নহে—তাহাতে

বাস্তবক্ষেত্রে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা পাইবার সুযোগ প্রসারিত না হইয়া সঙ্কুচিতই হইয়া থাকে। ৪। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখনও আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় রহিয়াছে (যেমন সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)। ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি ব্যাহত করিতেছে। আর একটি কথা, ছেলের মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ এখন তাহার পিতার আথিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার নীতি এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে (বৃত্তি-মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) চালু হয় নাই।

বিদ্যালয় এবং সমাজ—বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে কি ধরণের সম্বন্ধ থাকিবে এ বিষয়ে আলোচনা প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া আসিতেছে, ইহাদের কিছু কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনাকালে আমরা জানিতে পারিয়াছি। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি হইবে এই লইয়া মতদ্বৈধই যে, ঐসব আলোচনার মূলে রহিয়াছে তাহাও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। পারস্পরিক সম্বন্ধের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়, এক যে অপরের পরিপূরক ইহা অনুভব করিলে আপাতদৃষ্টিতে দুই বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে-কোন অসামঞ্জস্য নাই তাহাও আমরা আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যালয় এবং সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধনির্ণয়ে একই নীতি আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে।

বিদ্যালয় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান—সমাজ যে নিজ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকালে কোন বিদ্যালয় ছিল না। সমাজ জীবন জটিলতর হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয় সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয়। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ব্যতীত সমাজের স্থিতি সম্ভব নহে। পারস্পরিক সম্বন্ধেই সমাজের সৃষ্টি। আবার পরস্পরের মধ্যে সমতাই (similarity) পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তি। ধরা যাউক, আমরা যদি একে অপরের ভাষা না বুঝিতে পারি তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কঠিন এবং আমরা দুই জন এক সমাজের সভ্য হইতে পারি না। শুধু ভাষা কেন, এক সমাজের অধিবাসী হইতে হইলে, আচার-ব্যবহার, ভাল-মন্দের জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে সমতা অপরিহার্য। যে সমাজে ঐসব বিষয়ে পার্থক্য

যত বেশী সামাজিক সংহতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে সেই সমাজ তত দুর্বল, এমন কি সভ্যদের মধ্যে পার্থক্য বেশী হইলে সমাজ ধ্বংস হইয়া বিভিন্ন সমাজ-সৃষ্টির সম্ভবনা রহিয়াছে। আবার মানুষের আচার-ব্যবহার, ভাল-মন্দের জ্ঞান ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই শিক্ষাসাপেক্ষ। কাজেই সমাজ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে পরিবার, ধর্ম, ইত্যাদি আরও নানা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে ঐসব প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে উহারা পূর্বের মত আর শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করিতেছে না। কাজেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমাজের ভবিষ্যৎ সভ্যদের সমাজের জ্ঞান, রীতিনীতি ইত্যাদিতে দীক্ষিত করিতে হইলে সমাজের সহিত বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজের মত বর্তমানে সমাজ হইতে দূরে তপোবনে বিদ্যালয় স্থাপন করা চলে না। বিদ্যালয় পরিচালনের মূল দায়িত্ব সরকারের হাতে (সমাজের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে) ন্যস্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠকালেও ছাত্রদের সামাজিক কাজের অভিজ্ঞতা জন্মান বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই ছাত্রদের সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাউক, প্রত্যেক ছাত্রকেই হয়ত সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিন কোন কারখানায় বা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে বাধ্য করা হইল। তারপর বিদ্যালয় জীবনকে সমাজ-জীবনের প্রতিকৃতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। বড় হইয়া ছাত্রদের সমাজ-জীবনে যেসব কাজ করিতে হইবে, সেই সব কাজের জন্যই তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা হয়। সমাজ-জীবনে যে ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে, বিদ্যালয় জীবনেও সেই ধরণের প্রতিষ্ঠান (ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক, দোকান ইত্যাদি) গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। সমাজ-জীবন একনায়কত্বের (Dictatorship) নীতিতে বা গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইলে বিদ্যালয় জীবনও এক-নায়কত্ব বা গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে (রাশিয়া, চীন ইত্যাদি) বিদ্যালয়গুলি উপরোক্ত নীতিতে কাজ করিতেছে। কমিউনিস্ট দর্শনমতে বিপ্লবদ্বারা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তারপর শিক্ষার সাহায্যে উহাকে সংরক্ষণ করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবনকে কমিউনিস্ট সমাজ-জীবনের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বিদ্যালয় জীবনে যাঁহারা হইবেন নেতা (অর্থাৎ শিক্ষক) তাঁহারা কমিউনিস্ট দর্শনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। বিদ্যালয়ের সকল কার্যের মুল উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদের কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী করা এবং তাহাদিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা।

কিন্তু আমাদের একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজকে শিক্ষার দ্বারা শুধু সংরক্ষণ করিলে চলে না, তাহাকে উন্নততর করারও চেষ্টা করিতে হয়। অগ্রসর হওয়াই জীবনের ধর্ম, স্থিতিজীবন ধর্মের বিপরীত—যে অগ্রসর হইতেছে না সে মৃত। সভ্যতার ইতিহাস সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস। যে সমাজ উন্নতির পথে চলিবে না অদূর ভবিষ্যতে উহার পতন অনিবার্য। বিপ্লবের দ্বারা সমাজের উন্নতি-সাধনের নীতি অনেকেই গ্রহণ করেন না। সমাজ অধোগতির চরমে না পৌছাইলে সাধারণতঃ বিপ্লব সফল হয় না। বিপ্লব কোন সমাজের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যে নিজ আদর্শবাদ সমাজকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিলে শিক্ষাকে প্রোপাগাণ্ডার (propaganda) স্তরে নামাইয়া আনা হয়। বিপ্লব ব্যতীত স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজের অগ্রগতি হইয়া থাকে—পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজের প্রগতিই বিপ্লব ব্যতীতই হইয়াছে। বিদ্যালয় সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। একদিকে মানুষ যেমন অনেকখানি সমাজেরই সৃষ্টি, অপর দিকে তেমনি অনেক সময় তাহার জীবন সমাজ হইতে স্বতন্ত্র—অনেক ক্ষেত্রে সে সমাজের রীতি-নীতি, ভাবধারা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে। বিদ্যালয় যদি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিতে পারে তবেই উহা সম্ভব হয়। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ যদি অগ্রগতির পথে চলিতে থাকে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজও অগ্রগতির পথে চলিবে। আবার অনেকে মনে করেন যে, বিদ্যালয় নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র; সমাজের রীতিনীতি ভাবধারা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের জ্ঞানের আলোকে প্রতিফলিত হইলে উহাদের সংস্কারের পথ স্বতই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে। সমাজ সংস্কারকার্যে বিদ্যালয়ই হইবে আমাদের পথপ্রদর্শক। সমাজের স্থিতিই বিদ্যালয়ের একমাত্র কাম্য নহে, উহার প্রগতিও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। তাই বিদ্যালয় সমাজের প্রতীক হইলে চলিবে না—ইহা হইবে আদর্শ সমাজ। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন গ্রীস এই নীতিতেই বিশ্বাস করিত। সমাজের ভালমন্দের বিচারের ভার রাজনীতিকদের হাতে ন্যস্ত না থাকিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে মানবতাবাদ (Humanism), প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Mental Discipline বা Faculty School of Psychology) এর প্রভাবে শিক্ষা (ইউরোপে) সমাজ-জীবন হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। সমাজ-জীবনের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঐসব মতবাদ স্বীকার করে না। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় সমাজের অনুকরণে গড়িয়া তোলার (Socialise) আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। আমেরিকার জন ডিউই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার "স্কুল এণ্ড সোসাইটি" (School and Society) গ্রন্থে তিনি বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় এই সমস্যা লইয়া অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশেও বিদ্যালয়কে সমাজের অনুকরণে গড়িয়া তুলার চেষ্টা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ আমলের শিক্ষার সহিত আমাদের সমাজ-জীবনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। বর্তমানে আমরা নূতন সমাজগঠনের চেষ্টা করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত ঐ চেষ্টা যে সফল হওয়া সম্ভব নহে তাহা দিন দিনই আমরা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার সংঘটন দিন দিনই অধিক পরিমাণে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশই সমাজের স্থিতিকরণকে বিদ্যালয়ের একমাত্র কার্য বলিয়া গ্রহণ করে না। সমাজের স্থিতি এবং প্রগতি উভয়ই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। স্থিতি এবং প্রগতি একে উভয়ের বিপরীত না হইয়া বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রগতিব্যতীত সমাজের স্থিতি হইতে পারে না। কারণ অগ্রসর না হইলে পশ্চাদপদ্ হইয়া পড়িতে হইবে ইহা জীবনের ধর্ম ; একমাত্র প্রগতির মধ্যেই স্থিতি সম্ভব। আবার স্থিতি ব্যতীত প্রগতি সম্ভব নহে। সমাজের সংগৃহীত জ্ঞান, আয়ত্তীকৃত কৌশল গৃহীত ভাবধারা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না জন্মানো পর্যন্ত উহাদিগকে উন্নততর করার কথা উঠিতেই পারে না। বিদ্যালয় এবং সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও গণতন্ত্রবাদের পরস্পর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ডিউই একদিকে সমাজের স্থিতিকে যেমন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অপরদিকে সমাজের অগ্রগতিকেও তেমনি বিদ্যালয়ের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ছাত্রগণ প্রত্যক্ষভাবে

ছাত্রেরা যেমন সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবে, বয়স্কগণও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সংস্রবে আসিবেন। সমাজের ভাবধারা যেমন বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করিবে বিদ্যালয়ের ভাবধারাও তেমনি সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে। বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে দুইমুখী রাজপথ থাকিবে—একটি দিয়া সমাজ হইতে ভাবধারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং অপরটি দিয়া বিদ্যালয় হইতে ভাবধারা সমাজে প্রবেশ করিবে (There should be a two-way traffic between the School and the Society)। তাই বিদ্যালয় তাহার পাঠ্যবিষয়, তাহার সমাজ জীবনের সংঘটন ইত্যাদি বিষয়ে যদিও সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলে, তথাপি কোন বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে সমাজের অনুকরণ করে না। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়, তাহার সমাজ-জীবনের সংঘটন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের সংগে সম্বন্ধ থাকিলেও উহারা সম্পূর্ণরূপে সমাজের অনুকৃতি নহে।

সরকার এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—এখানে সরকার (Government) এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় এ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার জন্যই সরকারের সৃষ্টি। আবার সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যদি বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাজের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া অধিকার; সরকার ব্যতীত অপর কেহ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারে না এবং সকল বিদ্যালয়কেই সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়। প্রাচীন ভারত বা প্রাচীন গ্রীসে কিন্তু বিদ্যালয়ের সহিত সরকারের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। অধ্যাপকগণ স্বাধীনভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। রাজা বা সমৃদ্ধিশালী লোকেরা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমিদান করিতেন বটে কিন্তু বিদ্যালয়কে কখনও নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চেষ্টা করিতেন না। শিক্ষাদান ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজা প্রত্যক্ষভাবে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না। অধ্যাপকগণ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অপ্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবার গ্রহণ করিত। আধুনিক কালে কোন সরকারই কিন্তু শিক্ষাদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিজ, অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সমাজকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। দেশবাসীকে

শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। তাই অগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশগুলি বহুদিন হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করিয়াছে। কেহ শিক্ষা গ্রহণ করিবে কিনা তাহা ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের মতামতের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে রাষ্ট্র-জীবনের প্রয়োজনে তাহাকে শিক্ষাগ্রহণ করিতেই হইবে। বর্তমানে এই নীতি পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই অস্বীকৃত নহে। প্রাথমিক স্তর ব্যতীত শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষ ব. দল বিশেষের চেষ্টার উপর বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে সমাজের সকলে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায় না। অথচ ধনী, দরিদ্র, নগরবাসী, গ্রামবাসী নির্বিশেষে সকলে শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ না পাইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ অবহেলিত হয়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন না করিলে রাষ্ট্রের সকলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাইবে এই আশা করা যায় না। তাই শিক্ষার সকল স্তরেই প্রয়োজনানুসারে যথাযথ বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব সকল গণতান্ত্রিক দেশের সরকারই নিজ দায়িত্ব বলিয়া বর্তমানে স্বীকার করেন। কিন্তু (কমিউনিস্ট দেশের মত) ইহার অর্থ এই নহে যে, সরকার ব্যতীত অপর কেহ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে না। দেশের সকলেরই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী সন্তান-সন্ততির শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে। গণতান্ত্রিক দেশে বে-সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাকে সাধারণতঃ উৎসাহই দেওয়া হয়। কিন্তু যেস্থলে বে-সরকারী প্রচেষ্টার অভাব সেস্থলে সরকারকেই অগ্রসর হইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। দেশের প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্বও সরকারের উপরই ন্যস্ত। বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত যেসব স্থলে উপযুক্ত বে-সরকারী প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকিবে সরকার হয়ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন কিন্তু যেসব স্থলে ঐসব প্রচেষ্টা বিদ্যমান নাই সে-সব স্থলে সরকারকে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে সকল দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট অথবা সরকার কর্তৃক স্থাপিত।

কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার হয়ত জন্মায় না। কমিউনিস্ট দেশে বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ "শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা"র

(Academic freedom) নীতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি স্বীকার করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতি স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সরকার নিজ প্রয়োজনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দিবার নিমিত্ত নিজব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন বা বিদ্যালয় স্থাপনের বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবেন কিন্তু শিক্ষাদানে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক দেশে সরকার সাধারণতঃ একটি রাজনৈতিক দল (Party) হইতে গঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার সরকারের হাতে দিলে এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে একটি দলের হাতেই পড়িবে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে ঐ দল উহার প্রাধান্য কায়েম করিতে চেষ্টা করিবে। আবার বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজের উন্নতি যদি আমাদের কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষাকে সরকার, এমন কি সমাজেরও সম্পূর্ণ অধীন করিলে চলিবে না। অপরদিকে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতেও পারেন না। প্রতি সমাজে কতকগুলি সর্বজনস্বীকৃত নীতি আছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহাতে উহাদের বিপরীত শিক্ষা না দিতে পারে তাহার দিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে যদি কোন বিদ্যালয় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ-সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে ঐ চেষ্টায় বাধা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তারপর সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান যাহাতে মোটামুটি সমান থাকে সেদিকেও সরকারকে দৃষ্টি দিতে হয়। কাজেই আংশিকভাবে বিদ্যালয় যে সমাজের তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে একথা কেহই অস্বীকার করেন না।

সরকার এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ক উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে—১। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। সরকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকে না ; উহারা সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। ২। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা করার প্রধান দায়িত্ব সরকার বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু বে-সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় বাধা না দিয়া বরং সাহায্যই করা হয়। বিদ্যালয়কে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেও সাধারণতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে উহার স্বাধীনতা খর্ব করা হয় না।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশের সরকার বিদ্যালয় স্থাপনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। বর্তমানে এই নীতির পরিবর্তন হইয়াছে। নীতি হিসাবে দেশের সকল নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল; তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সরকার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফলে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় সরকার তাহাতে সমপরিমাণ অর্থ যোগ করিয়া বে-সরকারী চেষ্টাকে সফল করিতে সাহায্য করেন। বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর উহা পরিচালনে যে পরিমাণ অর্থের অভাব হয় (Deficit grant)। সরকার তাহাও পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ যদি সরকারী সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চায় তাহাতেও সরকার আপত্তি করেন না। ফলে পরিচালনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আমাদের দেশে তিন ধরণের বিদ্যালয় আছে ১। সরকারী বিদ্যালয়, ২। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ৩। স্বাধীন বিদ্যালয়। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোনটি ধর্মসম্প্রদায়, কোনটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, কোনটি নাগরিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান আবার কোনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সরকার ছাত্রদের মাহিনা, শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদির হার বাঁধিয়া দেন। "স্বাধীন বিদ্যালয়ে সরকার কোন সাহায্যও করেন না এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেও চেষ্টা করেন না। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মত স্বাধীন বিদ্যালয়ও ধর্মসম্প্রদায়, সেবাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত হয়। মালিকানার (Proprietorship) ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যালয়ও আমাদের দেশে একেবারে বিরল নহে। সংক্ষেপে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকার এখনও বে-সরকারী প্রচেষ্টার উপরই অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন।"

বিদ্যালয়ে পারস্পরিক জীবন—বর্তমানে বিদ্যালয়কে একটি বিশিষ্ট ধরণের সমাজরূপে পরিকল্পনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) দ্রুত অগ্রগতি "শিক্ষা লাভ করা" কার্যটি সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছি যে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে সঞ্জাত অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয় তাহার নামই শিক্ষা। আবার যেস্থলে পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানে "সমাজের" সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষক-এর মধ্যে সব সময়েই পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। কাজেই বিদ্যালয় একটি সমাজ। অবশ্য বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ; যে-কোন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর আবার আলাদা-সমাজ ; বিদ্যালয় ব্যতীত, পরিবার, দেবমন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদা সমাজরূপে কল্পনা করা যায়—তাহাদের প্রত্যেকেরই আলাদা জীবন, আলাদা সংঘটন রহিয়াছে। বৃহত্তর সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যেমন পরিবার, শিল্প, বাজার প্রভৃতি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ উপরোক্ত ত্রিবিধ পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য শ্রেণী (class), লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, নাট্য-সমিতি, বিতর্ক-সমিতি ইত্যাদি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়। বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব জীবন আছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জীবন প্রবাহিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন ; দৈনন্দিন জীবনধারণের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা শিক্ষা লাভ করি। বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষভাবে সত্য। বিদ্যালয় জীবনের প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয় যাহাতে বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা শিক্ষার নিয়ামক হয়। বিদ্যালয় জীবন বৃহত্তর সমাজ জীবনের অংশ মাত্র। কিন্তু ঐ জীবনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং ইহার অভিজ্ঞতাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ শিক্ষাকার্যে উহারা অধিকতর ফলপ্রসূ।

বিদ্যালয়কে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ধরণের সমাজরূপে গড়িয়া তোলার উপরই নির্ভর করে উহার সার্থকতা। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহত্তর সমাজের মত বিদ্যালয় সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্ট নহে—ইহা অনেকটা কৃত্রিম। সকল ছাত্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজ অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদে যে বিদ্যালয় সমাজে যোগদান করে এমন নহে। অনেক লোক একত্র হইলেই যেমন সমাজের সৃষ্টি হয় না, তেমনি অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগ দিলেই বিদ্যালয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন জনসমাবেশ সমাজ না হইয়া জনতা (crowd) মাত্র। বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশকালে

ছাত্রেরা অনেকটা "জনতার" মত থাকে। বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ হইতে তাহারা বিভিন্ন অভ্যাস, চারিত্রিক গুণাবলী, চিন্তাধারা ইত্যাদি লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। যে একাত্মানুভূতি সমাজ-জীবনের প্রধান ভিত্তি বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশের কালে উহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। তাঁহারা বিভিন্ন আদর্শবাদ ইত্যাদি লইয়া বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্যই হইল, ছাত্র এবং শিক্ষকের এই "জনতাকে" সমাজে পরিণত করা—তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য, আচার-ব্যবহার জীবনসম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে একাত্মানুভূতি সৃষ্টি করা। এই একাত্মানুভূতি না জন্মাইতে পারিলে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে একত্র সমাবেশের দ্বারা উহার সভ্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গ পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এই একাত্মানুভূতি জন্মাইবার পক্ষে বিদ্যালয়ের একটি প্রধান সুবিধা এই যে, প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক নূতন সভ্য যোগ দিলেও (নূতন ছাত্র, নূতন শিক্ষক) বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্যই "পুরাতন" থাকেন—দীর্ঘকাল প্রায় দৈনন্দিন পরস্পরের মধ্যে মিলনের ফলে তাহাদের মধ্যে কিছুটা একাত্মানুভূতি স্বতঃই জন্মাইয়া থাকে। "পুরাতন" সভ্যগণ সহজেই নূতন সভ্যদের বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি এই একাত্মানুভূতির সৃষ্টি এবং প্রসারের জন্য বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঐরূপ চেষ্টা না করিলে পুরাতন সভ্যদের মধ্যেও একাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া পড়ে এবং নূতন সভ্যদের মধ্যেও তাহা উপযুক্তরূপে সৃষ্টি হয় না। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এই কার্যে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে—

বিদ্যালয়ের পোশাক (School Uniform) সভ্যদের মধ্যে একাত্মানুভূতি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। "আমরা সকলে এক ধরণের পোশাক পরি, আমরা সকলে এক, যাহারা ভিন্ন ধরণের পোষাক পরে তাহাদের হইতে আমরা পৃথক"—এইরূপ মনোভাব নিজের অজ্ঞাতেই সৃষ্ট হয়। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশ সেনাবাহিনীর জন্য নিজস্ব পোশাকের (uniform) ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এক পোশাক পরিধান, পরস্পরের মধ্যে কতখানি একাত্মবোধ জাগাইতে পারে তাহা আমরা বিশেষ অনুভব করি যখন কোন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র সমাবেশ ঘটে—নিজ পোশাকের অনুরূপ পোশাক (uniform) পরিহিত সকল ছাত্রের প্রতি এক বিশিষ্টরূপ আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। বর্তমানে

অনেক বিদ্যালয়ই নিজস্ব পোশাকের প্রবর্তন করিয়াছে। একই কারণে শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য পোশাকের প্রবর্তন না করিয়া শিক্ষকদের জন্যও পোশাকের প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। ধরা যাউক, কোন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই এক নির্দিষ্ট ধরণের উত্তরীয় পরিধান করিলেন; বিদ্যালয় নিজ ব্যয়েই ঐ ধরণের উত্তরীয় প্রস্তুত করাইয়া শিক্ষকদের উপহার দিতে পারে। বিদ্যালয়ের পোশাক নির্বাচন-কালে উহা যাহাতে ব্যয়সাধ্য না হয় এবং উহা যাহাতে রুচিসম্মত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

নিজস্ব পোশাক ব্যতীত বিদ্যালয়ের নিজস্ব সঙ্গীত থাকাও বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আদর্শের প্রতি সভ্যদের আনুগত্য ও ভালবাসা জন্মাইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটতর করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গীত, বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, আদর্শ, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রতীক হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের ছবি, উহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছায়াছবি ইত্যাদি প্রদর্শনের দ্বারাও বিদ্যালয়ের সভ্যদের মধ্যে একাত্মানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বারা ঘনিষ্ঠতা এবং একাত্মানুভূতি যতখানি জাগ্রত হয় অন্য কিছুতে ততখানি হয় না। তাই প্রতি শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে এবং বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা স্থাপনের প্রচুর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়-জীবনে উপযুক্ত "প্রতিষ্ঠান" (Institution) গঠনের দ্বারাই উপরোক্ত সুযোগ যথাযথভাবে সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে হউস (House), ক্লাব (Club), ইউনিয়ন (Union) ইত্যাদি নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। ঐসব প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দের উপর বিদ্যালয়-সমাজের ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয় সমাজের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় দুইটি নীতি প্রধানতঃ মনে রাখিতে হইবে।

১। একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিদ্যালয়ের সকলের মিলনক্ষেত্র হইবে অপর দিকে আবার প্রতিষ্ঠানগুলি এমন ধরণের হইবে যে, সভ্যেরা তাহাদের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে (Group) অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইবে। ধরা যাউক, সমগ্র বিদ্যালয়কে চারিটি হউস (House)-এ বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক হউস আবার শ্রেণী হিসাবে, আগ্রহ হিসাবে বা অন্য কোন নীতির ভিত্তিতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত না হইলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় না এবং সকলে বিদ্যালয়-জীবন হইতে সমান-ভাবে উপকৃত হইতে পারে না।

২। বিদ্যালয়ের সকল প্রতিষ্ঠানই গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়-জীবন পরিচালনে ছাত্রেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে ইহাই আশা করা যায়—তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবে ইহা সঙ্গত বিবেচনা করা হয় না। বিদ্যালয়-সমাজ ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত। তাহাদের সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষকগণ যে তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিতে পারেন এ ধারণা ভ্রান্তিপ্রসূত। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার সাধারণতঃ ছাত্রদের উপর থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনেকের এইরূপ ধারণা যে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মিলনেই শুধু শিক্ষালাভ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরা শিক্ষকদের নিকট হইতে যে পরিমাণ শিক্ষা পায় পরস্পরের নিকট হইতে তাহার অপেক্ষা অল্প শিক্ষা পায় না। তাই বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ছাত্রদের উপর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব থাকিলে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ অন্তরঙ্গতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার—শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয়ের মত পরিবারের সৃষ্টি হয় নাই। পরিবার প্রত্যেক সমাজেরই আদি প্রতিষ্ঠান। জন্মমাত্রেই আমরা কোন বিশেষ পরিবারের সভ্য ; সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া পরিবারই আমাদের জীবনের প্রধান পরিবেশ রচনা করে। প্রধানতঃ পরিবারকে ঘিরিয়াই আমাদের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে পরিবারের রূপ বা গঠন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন ধরণের পরিবার ব্যতীত আমরা মনুষ্যসমাজ কল্পনাই করিতে পারি না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য মানুষের নিরাপত্তা বোধের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ; পরিবারের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলেই মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলে শিক্ষাদান সহজ হয় না। প্রাচীন স্পার্টায় শিশুকে পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টি করা হইত ; এমন কি প্রাচীন স্পার্টার নাগরিকদের পরিবার-জীবন বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু স্পার্টান শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল খুব শুভ হয় নাই। প্রাচীন ভারতেও ছাত্রেরা পরিবার হইতে দূরে তপোবনে গুরুগৃহে বসবাস করিয়া শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু তাহারা নিজ পরিবার হইতে দূরে থাকিলেও গুরুর পরিবারে সন্তানরূপে গৃহীত হইত। বর্তমানে পৃথিবীর সকল

দেশেই অনেক আবাসিক বিদ্যালয় (Boarding School) আছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পাব্লিক স্কুলগুলি (Public School) আবাসিক বিদ্যালয়। আমাদের দেশেও ঐ ধরণের বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, পরিবারের মধ্যে রাখিয়াই শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। ভালবাসা দেওয়া এবং নেওয়ার মধ্য দিয়াই জীবনের নিরাপত্তাবোধ জন্মায়; পরিবার ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মাইতে পারে না। কাজেই পরিবার হইতে দূরে সরাইয়া লইলে ছাত্রের মানসিক অবস্থা শিক্ষার অনুকূল থাকিবে না। কেবলমাত্র বিশেষ কারণে বিশেষ পরিস্থিতিতে আবাসিক শিক্ষা সমর্থন করা যাইতে পারে।

পরিবার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের জীবন পরিবার-কেন্দ্রিক এবং জীবনের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। তাই এখনও অধিকাংশ দেশে পরিবারই ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল স্তরেই পরিবার তাহার সভ্যদের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করিয়া থাকে। বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় নাই তখন পরিবারের মধ্যেই প্রায় সকল প্রকার শিক্ষা হইত। চরিত্রবিকাশ, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা প্রভৃতি পরিবারের মধ্যেই হইত। পরিবারে শিক্ষানবিসি করিয়া বৃত্তিশিক্ষা চলিত; এমন কি কিছু কিছু লিখন-পঠনের শিক্ষাও পরিবারের নিকট হইতে পাওয়া যাইত। এক হিসাবে বিদ্যালয় অপেক্ষা পরিবারের শিক্ষাদান ক্ষমতা অধিক। পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ত শিক্ষালাভ ঘটে; একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব অন্তরঙ্গ হয়। পরিবারের সভ্যগণ জন্মসূত্রে একাত্মানুভূতি লাভ করে; স্বাভাবিক নিয়মেই তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা বাড়িয়া উঠে। অন্তরঙ্গ সহযোগিতার ভিত্তিতেই লোকে পরিবারের মধ্যে জীবনযাপন করে। ফলে পরিবারের মাধ্যমে লব্ধশিক্ষা অতি সহজেই শিক্ষার নিয়ামক হয়। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে পরিবারকেই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষাদানে পরিবারের অংশ দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের সকল দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—পরিবারে শিক্ষানবিসির দ্বারা বর্তমান সমাজের জটিল বৃত্তিগুলির মধ্যে কোনটির জন্যই উপযুক্ত প্রস্তুতি সম্ভব নহে।

চরিত্রের বিকাশ সাধন, সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বও দিন দিনই বিদ্যালয়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে। পরিবারের সভ্যগণ পূর্বের মত আর অধিকাংশ সময়ই একত্র জীবনযাপন করে না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মাতাপিতা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বা ক্লাবে কাটান; সন্তানদের দিনও বিদ্যালয় এবং ক্লাবের মধ্যে ভাগ করিয়া কাটিয়া যায়। কেবলমাত্র এক বাড়ীতে সকলে নিদ্রা যান এবং প্রাতরাশ ও সান্ধ্যভোজন একত্র সম্পন্ন করেন। নানা কারণে পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন পূর্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে পরিবারও আর পূর্বের মত শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করিতেছে না। যৌথ পরিবার প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; যেখানে তাহাদের অস্তিত্ব এখনও আছে, সেখানেও সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক কলহের ফলে পরিবার শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ছোট পরিবারের শিক্ষাদানের ক্ষমতাও নানাকারণে কমিয়া আসিয়াছে—পরিবারের মধ্যে ধর্মের অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উৎসবাদির অনুষ্ঠান দিন দিনই কমিয়া আসার দরুণ উহা ধর্মশিক্ষা এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে আর কাজ করিতেছে না। দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের ফলে মাতাপিতা এবং সন্তানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এত পার্থক্য হইয়া পড়িতেছে, যে কৈশোরকাল হইতেই মাতাপিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ তিক্ত হইতে আরম্ভ করিতেছে। তারপর জীবিকা সংগ্রহে পিতা দিন দিন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন যে, সন্তানদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিশেষ কিছু থাকিতেছে না। অধিকন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষ হওয়ার দরুণ মাতাপিতার চরিত্রেও হয়ত আশানুরূপ গুণাবলী বিকশিত হয় নাই। ফলে, তাহাদের প্রভাব সন্তানদের মধ্যেও হয়ত অবাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করিতেছে। সর্বশেষে শিক্ষা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং (বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে) শিক্ষাদান কার্য জটিল হওয়ার ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না; অনেক সময়েই গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করার দরুণ মাতাপিতা সন্তানকে শিক্ষাদানের চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেছেন।

পরিবার ও বিদ্যালয়—বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের স্থান যতই সংকুচিত হইয়া আসুক না কেন উহা যে মনুষ্যজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে আজও কোন সমাজ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। কোন সমাজই পরিবারকে উঠাইয়া দিবার কল্পনা আজও করে নাই। আমাদের জীবনে আজও

পরিবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের সভ্যতা পরিবারকেন্দ্রিক—পরিবার বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক শাস্ত্রীয় অনুশাসন, নানা ধরণের গ্রন্থ, নানারূপ সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আজও আমাদের জীবনে কার্যকরী আছে। আমাদের সব রকম নীতিবোধ ভাঙ্গিয়া পড়া সত্ত্বেও পারস্পরিক নীতিবোধ এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। এখনও আমাদের পারিবারিক জীবন অন্ততঃ কতকাংশে স্নেহ, প্রীতি ও ত্যাগের ভিত্তিতে গঠিত। এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের অধিকাংশ সময় পরিবারের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কাজেই পরিবারকে বাদ দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা কল্পনা করাও যায় না। ছাত্রের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং পরিবারের অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাউক, বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ের পাঠ আরম্ভ করিয়া, বাড়ীতে ছাত্র সেই বিষয়ের পাঠ শেষ করিতে পারে। আবার বাড়ীতে কোন বিষয় জানার জন্য তাহার মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইলে বিদ্যালয়ে সে তাহার সেই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারে। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা বিপরীত হইলে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া ছাত্রের আর গত্যন্তর থাকে না। ধরা যাউক, বিদ্যালয়ে যদি তাহাকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং বাড়ীতে যদি তাহাকে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখা হয় তাহা হইলে শিশু, বিদ্যালয় বা বাড়ী কোথাও আশানুরূপভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না। শিক্ষাকার্যে বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। যে সব ছাত্র আবাসিক বিদ্যালয়ে বাস করিতেছে তাহাদের পরিবারের সঙ্গেও বিদ্যালয়ের সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাকালে ছাত্র, মধ্যে মধ্যে বাড়িতে আসিয়া বাস করিবে এবং শিক্ষা শেষে সে আবার বাড়িতেই ফিরিয়া যাইবে। তাই বিদ্যালয় পরিবারের সঙ্গে তাল রাখিয়া না চলিতে পারিলে তাহার শিক্ষা পারিবারিক জীবনে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। বিদ্যালয় এবং পরিবার পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে একের দ্বারা অপরের উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য হওয়া সম্ভব। পরিবারের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাই বিদ্যালয় কর্তৃক পরিবার প্রভাবিত হইলে সেই প্রভাব সহজে সমাজেও ছড়াইয়া পড়িবে। অপরদিকে সমাজের প্রভাব পরিবারের উপর প্রতিফলিত হইয়া বিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পরিবারের মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব।

সাধারণতঃ **অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (Parent-Teacher Association)** গঠন করিয়া বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের দেশে খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েই ঐ ধরণের সমিতি সাফল্যের সহিত কার্য করিতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষকই উপস্থিত হন—আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ঐ সব সভায় অভিভাবকদের আগ্রহ জাগরিত করা সম্ভব হয় না। কোন সভায় যদি কিছু সংখ্যক শিক্ষক উপস্থিতও হন, তথাপি হয় তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করেন না নয়ত শুধু বিদ্যালয়ের কার্যের ধ্বংসাত্মক (destructive) সমালোচনা করিয়া চলেন। এরূপ অবস্থায় অনেকে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে; আমরা যথাযথভাবে উহা গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়াই উপরোক্ত অসুবিধাগুলির সৃষ্টি হইতেছে। প্রথমতঃ, সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করিলে এবং বৎসরে একবার বা দুইবার উহার সভা আহ্বান করিলে ঐসব সভায় সাধারণ আলোচনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ফলে, অভিভাবকগণ ঐ ধরণের সভায় উপস্থিত হইতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। পিতামাতা যদি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার আলোচনা হইতে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত পাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের গরজেই ঐ সব সভায় উপস্থিত হইবেন।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক শাখার (section) জন্য পৃথক পৃথক সমিতি স্থাপিত করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতির অভিভাবকদের তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাসমস্যা অনুসারে আবার ৪।৫ জনের ছোট ছোট দলে (Group) বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। ধরা যাউক, অষ্টম শ্রেণীর "ক" শাখার পাঁচটি ছাত্র অঙ্কে পিছাইয়া পড়িয়াছে। ঐ পাঁচটি ছাত্রের অভিভাবকদের একদলভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা একত্র মিলিত

হইয়া অঙ্কের শিক্ষকের সহযোগিতায় ঐ পাঁচটি ছাত্রের অঙ্কের জ্ঞান উন্নততর করিবার নিমিত্ত কি কি পন্থা অবলম্বন করা যায় তাহা স্থির করিবেন ; ঐ পন্থাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি বিদ্যালয় এবং কোন্ কোন্‌টি অভিভাবক অবলম্বন করিবেন তাহাও আলোচনা সভায় স্থির হইবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি পরিচালিত হইলে আশা করা যায় যে, অভিভাবকগণ ঐ সমিতির কার্যভার ধীরে ধীরে নিজেদের স্কন্ধেই গ্রহণ করিবেন। অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানের শিক্ষায় উদাসীন এই ধারণা সত্য নহে। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা অনেকটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের জীবন ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ; উদ্দেশ্য সাধনে বিফলমনোরথ হইলেই সংশ্লিষ্ট পক্ষ পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, অভিভাবক বা ছাত্র কাহারও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী চলিতেছে না বলিয়া শিক্ষক অভিভাবকের উপর এবং অভিভাবক শিক্ষকের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা যদি সত্য সত্যই ছাত্রদের উন্নতির উপায় বাহির করা যায় তাহা হইলে আমরা আর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিব না। কাজেই সম্পূর্ণরূপে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তবে একথা সত্য যে, আমাদের দেশে এখনও অনেক অভিভাবক আছেন যাঁহারা উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু এমন কোন অভিভাবক নাই যিনি নিজ সন্তানের শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনও না কোনপ্রকারে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। অভিভাবকদের নিজেদের শিক্ষার স্তর বিবেচনায় অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। অভিভাবকগণ শিক্ষার যে স্তরেই থাকুন না কেন কিভাবে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতিতে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতেই অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভার সার্থকতা। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং সাধারণভাবে শিক্ষা সমস্যার আলোচনার নিমিত্তও মধ্যে মধ্যে ঐ সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। ঐ ধরণের অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকিতে পারে; ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। শিক্ষা-পদ্ধতি বা অন্য কোন দিক হইতে বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ সংস্কার প্রবর্তিত হইলে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় তাহার আলোচনা হওয়া

প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, দিন দিনই শিক্ষাদান কার্য অধিকতর বৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িতেছে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করিতে হইলে অনেক সময় গতানুগতিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে হয়। আপাত-দৃষ্টিতে ঐসব বিপরীত আচরণ সম্বন্ধে অভিভাবকদের সহিত আলোচনা না করিলে তাহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে পারে। আলোচনা সভা বা অনুরূপ মাধ্যমে অভিভাবকদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানদানের প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি ইহা নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মায়তন—বিদ্যালয়ে আমরা যে ধরণের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি তাহার নিমিত্ত ধর্মায়তনের সৃষ্টি হয় নাই। ঈশ্বরকে যাহাতে মানুষ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার জন্যই ধর্মায়তনের সৃষ্টি। সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন সমাজ এখনও পৃথিবীতে নাই। প্রাচীনকালে ভগবানের সঙ্গে মিলনই মানুষ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। ধর্মায়তনগুলি মানুষ কিভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারে এই শিক্ষাই প্রদান করিত। তাই ধর্মায়তনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন ভারতে সকল শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল (বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত)। ইউরোপে মধ্য-যুগে গির্জা বা খৃষ্টীয় মঠগুলিই ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান যুগে ধর্মশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে করা হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যৎ সমাজের সভ্যদের ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা দান সামাজিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ধর্ম শিক্ষাদানের কার্য যথাযথভাবে করিতে না পারে তাহা হইলে বিদ্যালয়কে আংশিকভাবে হয়ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অপর দিকে একথা মনে রাখিতে হইতে যে, ধর্মশিক্ষা নীতিশিক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। অনেকে মনে করেন জীবনের আদর্শ নিরূপণ এবং ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে ধর্মশিক্ষার বিশেষ স্থান আছে। ভারতবর্ষে আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী এতদিন যে ধর্মশিক্ষার ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের পুরাণ পাঠ, কথকতা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্মায়তন ছাত্রদের চরিত্র বিকাশে বিদ্যালয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

পুরাতন ধর্মের অনুশাসন, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমানে কালোপযোগী নহে। ফলে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস দিন দিনই শিথিল হইতেছে। দেবায়তনগুলি পূর্বের মত আর চরিত্র বিকাশে বা ধর্মশিক্ষা দানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আশা করা যাইতেছে যে, সংস্কারের দ্বারা যুগোপযোগী করিতে পারিলে দেবায়তন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের মত আবার আমাদের চরিত্র বিকাশে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। সমাজ হইতে ধর্ম লুপ্ত হইয়া গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ দুঃসাধ্য হইবে। বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে যে ধরণের সংযোগে কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, বিদ্যালয় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও অনুরূপ সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে। তাই এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংঘ ও যুব আন্দোলন—সংঘ এবং যুব আন্দোলন বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্বে ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়াই সংঘ এবং যুব আন্দোলনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। একটা কোন বিশেষ আদর্শ লইয়া সমাজে সংঘ বা যুব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ধরা যাউক, সুস্থ, সবল শরীর গঠনের নিমিত্ত ব্যায়াম সমিতি অথবা গ্রাম সেবার উদ্দেশ্য লইয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইল। এই সংঘগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রাপ্ত বয়স্কগণই হয়ত বিশেষভাবে উহাদের সভ্য। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসাবে ঐ ধরণের সংঘ বিদ্যালয়েও স্থাপন করা চলে। চরিত্র শিক্ষা দিতে এবং মনে আদর্শবাদ জন্মাইতে এইসব সংঘ বিশেষভাবে সাহায্য করে। ঐ সব সংঘের সাহায্যে বিদ্যালয় সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্টতর সংযোগ রক্ষা করিতে পারে।

বয়স্কদের জন্য সংঘ ব্যতীত বিশেষ করিয়া কিশোর ও যুবকদের জন্য নানাধরণের আদর্শবাদী আন্দোলন রহিয়াছে। উহাদিগকে যুব আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান স্কাউট, এন. সি. সি., আনন্দ মেলা, সি. এল. টি. ইত্যাদিকে আমাদের দেশের যুব আন্দোলন বলা যাইতে পারে। কৈশোরে এবং যৌবনে আমরা স্বভাবতই আদর্শপ্রবণ থাকি। ফলে অতি সহজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উপরোক্ত ধরণের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; বস্তুতঃপক্ষে ইহারা তাহাদের মনের স্বাভাবিক চাহিদা (needs) নিবৃত্ত করে। ঐসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ, সহযোগিতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী

বিকশিত হয়। ঐসব আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রেরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাতে জ্ঞান সংগ্রহও বড় অল্প হয় না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের যুব আন্দোলনের প্রবর্তন করা উচিত এবং যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রই কোনও না কোন আন্দোলনের সভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যে আন্দোলন সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে —বিদ্যালয় শুধু ঐসব আন্দোলনকেই উৎসাহ দিবে। বিদ্যালয়ে ধর্মসংশ্লিষ্ট যুব আন্দোলনের প্রবর্তন করিবার পূর্বে (যেমন, "কুয়েকার" আন্দোলন) উহা দ্বারা অপরাপর ধর্মের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হইতে পারে কিনা তাহা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক আদর্শবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন আন্দোলনকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয় অনেক রাজনৈতিক দলই ছাত্রদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যুব আন্দোলন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালয়কে উহাদের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতার—বর্তমান কালে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতারকে বহু লোককে এক সঙ্গে শিক্ষাদানের মাধ্যম (Mass media for education) বলিয়া গণ্য করা হয়। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের শিক্ষায়ই উহাদিগকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ অবসর বিনোদনের জন্যই সমাজ উহাদের ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ অন্তরের চাহিদায় মানুষ ঐসব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করে বলিয়া উহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, কবি গান ইত্যাদির ব্যবস্থা অবসর বিনোদনের জন্যই করা হইত; কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের অবদান কিছু কম ছিল না। বর্তমান জগতে যান্ত্রিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে অবসর বিনোদনের নূতন মাধ্যমরূপে ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতারের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী গঠন করিয়া দীর্ঘদিন হইতেই আমরা ছাপাখানাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতেছি। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী থাকিলেও দুঃখের বিষয় এই যে, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষাকার্যে ইহা আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করিতেছে না। বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি এত পুরাতন এবং সংখ্যায় এত

অল্প যে, ছাত্রেরা ইহা প্রায় ব্যবহারই করে না। বর্তমানে সরকার উপযুক্ত লাইব্রেরী গঠন এবং তাহার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী গঠনের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাত্র লাইব্রেরী গঠন করিলে চলিবে না; শ্রেণী-লাইব্রেরী, হবিক্লাব লাইব্রেরী ইত্যাদি ছোট ছোট লাইব্রেরী ছাত্রদের ছোট ছোট দলের (group) ব্যবহারের জন্য বড় লাইব্রেরীর অংশ হিসাবে স্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বাহিরে সমাজে যে সব ভাল ভাল লাইব্রেরী আছে তাহাদের সহিতও ছাত্রদের সংযোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া বিদ্যালয়েরই কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে যে, অবসর বিনোদনের জন্য, পাঠের জন্য পুস্তক নির্বাচনে রুচিবোধ জন্মানোর দায়িত্বও বিদ্যালয়ের উপরে পড়িয়াছে। শিক্ষার কোন শক্তিশালী মাধ্যম সৃষ্টি করার বিপদ এই যে, তাহা সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষা উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্তমানে এত সব অবাঞ্ছিত ধরণের পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে যে, অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ছাপাখানা কুশিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ সব বই ব্যতীত অন্য ধরণের বই পড়িয়াও যে আনন্দ পাওয়া সম্ভব এই অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর সাহায্যে ছাত্রদের দিয়া পাঠ্য নির্বাচনে তাহাদের রুচিবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। কাজেই বিদ্যালয়-লাইব্রেরীতে শুধুমাত্র ছাত্রদের অবসর বিনোদন করার উপযুক্ত বইও রাখিতে হইবে। শিক্ষাদান কালে শিক্ষকগণ শুদ্ধমাত্র "পাঠ্যপুস্তকের" উপর নির্ভর না করিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির প্রতিও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সংক্ষেপে লাইব্রেরীকে বিদ্যালয় সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং পাড়ার যে সব লাইব্রেরী আছে তাহাদেরও উপযুক্তভাবে শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইবে।

ছাপাখানার মত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানও বর্তমান সমাজে শিক্ষার এক প্রভাবশালী মাধ্যম। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; গ্রামেও ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন ধরণের চলচ্চিত্র হইতে পারে—১। ডকুমেণ্টারী-চিত্র (Documentary)। কোন ঘটনা বা কোন কিছুর হুবহু বর্ণনার জন্য যে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহাকে ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র বলে। ধরা যাউক, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভার কোন অধিবেশনের ছবি তোলা হইল বা বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীর জীবন সম্বন্ধে কোন ছবি তোলা হইল। ভারত সরকার এবং বাংলা সরকার উভয়েই এই ধরণের অনেক ছবি তুলিয়াছেন

এবং তুলিতেছেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সোজাসুজি ঐ ধরণের ছবিকে ব্যবহার করা চলে। সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া বিধিবদ্ধভাবে ঐ ধরণের চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়েই করা উচিত। ২। শিক্ষামূলক চিত্র (Educational)—যে-কোন পাঠের বিষয়বস্তু লইয়া চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা চলে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয় শিক্ষাদানের জন্যই চলচ্চিত্রের ব্যবহার চলিতে পারে। ঐ সব চিত্র ক্লাসে শিক্ষক যেভাবে পড়ান, অনেকটা সেইভাবেই প্রস্তুত করা চলে, এবং শ্রেণী-কক্ষের ভিতরেই তাহা পাঠদানের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ঐ ধরণের চলচ্চিত্র নানাকারণে আমাদের দেশে এখনও খুব বেশী প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের এই অভাব দূর হইবে সন্দেহ নাই। চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যেও বিদ্যালয়ে নানারূপ "শিক্ষামূলক" চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা চলে, ৩। শিশুচিত্র —শিশু এবং বয়স্কদের আগ্রহের ক্ষেত্র ভিন্ন। তাই, সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিশেষ-ভাবে শিশুদের উপযুক্ত সাহিত্য রচনা হইতেছে, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও বিশেষ করিয়া শিশুদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকার শিশু-চলচ্চিত্র প্রস্তুত করার নিমিত্ত বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। বয়স্কদের জন্য প্রস্তুত চলচ্চিত্র দেখিতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে শিশুর রুচির বিকৃতি ঘটিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইতেছে। ভাল ভাল শিশু-চলচ্চিত্রগুলি অবশ্যই বিদ্যালয়ে দেখান প্রয়োজন। ৪। ফিচার ছবি (Feature Film)--বয়স্কদের অবসর বিনোদনের জন্যই ঐ সব চলচ্চিত্রের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় ঐ ধরণের অনেক চলচ্চিত্রই সমাজকে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে; ছাত্রদের পক্ষে ঐ সব চিত্র দর্শনের ফল বিষময় হইতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যেও অনেক চিত্র আছে যাহা জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং চলচ্চিত্র দর্শন ব্যাপারে তাহাদের রুচিবোধ জাগ্রত করিতে পারে। কাজেই বিশেষভাবে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক ঐ ধরণের চিত্রও ছাত্রদিগকে দেখানো প্রয়োজন।

সংক্ষেপে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং বিধিবদ্ধভাবে চলচ্চিত্রকে শিক্ষার প্রয়োজনে নিয়োগ করা উচিত।

বর্তমানে বেতার, বিশেষভাবে শিক্ষার প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে। অনেক বিদ্যালয়েই এখন বেতারযন্ত্র আছে। বিদ্যালয় সময়ের ভিতরেই "বিদ্যার্থীমণ্ডল" নাম দিয়া স্কুলের ছাত্রদের জন্য বেতার হইতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

এতদ্ব্যতীত "শিশুমঙ্গল", "গল্পদাদুর আসর" ইত্যাদি নানারূপ সংস্কৃতিমূলক এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বেতার হইতে প্রচার করা হয়। বিদ্যালয়কে শিক্ষাকার্যের জন্য বেতার প্রোগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষা-প্রদানকারী সমাজ—পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পরিবার, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, সংঘ এবং যুব-আন্দোলন, ছাপাখানা, চলচ্চিত্র ও বেতার শিক্ষাদানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়কে উহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাদের সহিত যোগাযোগে কাজ করিলে সমাজের সহিতও বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হয়। উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সমাজের যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সবগুলিই শিক্ষামূলক—জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষা আবার সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার জনক। যে সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রহিয়াছে—যে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা পরস্পরের পরিপূরক এবং সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যের অনুকূল সে সমাজকে শিক্ষা-প্রদানকারী সমাজ (Educative Society) বলা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সমাজে এমন হয় যে, এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা অপর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার বিপরীত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা পরস্পর বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে—অর্থাৎ সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সমাজ-জীবন বা ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া থাকে। তাই শিক্ষাদান আমাদের কাছে এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমাজের সবগুলি প্রতিষ্ঠানকেই সংস্কার দ্বারা আরও শিক্ষার অনুকূলে আনিতে হইবে। যে-কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া পরিবার প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠানের সহিত শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে ঐগুলির সংস্কারের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে।

অনুশীলনী

Q. 1. What are the different types of schools at present in West Bengal ? Indicate briefly their distinctive features.

(C.U. B.T. 1957, 1959)

Ans. (পৃঃ ৫০-৫৯)

Q. 2. The teacher should build up in the minds of the students a lively sense of being an integral part of the local community and the local community should be enabled to realise that the school is a vital and invaluable part of its life. Discuss the steps you would take as a school teacher to achieve these objectives.

(C.U. B.T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৫৯-৬৩)

Q 3. Write short notes on : (a) Parent-Teacher Association (B.T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৭৪-৭৬)

(b) The school and the community (C.U. B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৫৯-৬৩)

Q. 4. "There has been too great a tendency to regard the school as an isolated unit and education as something apart from the main stream of life" Discuss and suggest steps by which the big gulf between the school and the society can be bridged and education can be made real and living to the child.

Ans. (পৃঃ ৫৯-৬৩)

Q. 5. Show how the functions of the school are both conservative and progressive.

(C.U. B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৫৯-৬২)

Q. 6. Discuss what do you understand by the statement that the *School is a Society*. Describe the steps which might be taken to develop an integrated social life in the school.

Ans. (পৃঃ ৬৬-৭০)

Q. 7. Discuss the role of Family, Religious Institutions, Youth Movements, Press, Cinema and Radio in education. What should be their relation to school ?

Ans. (পৃঃ ৭০-৮০)

Q. 8. Discuss what should be the relationship between the school and the Government.

Ans. (পৃঃ ৬৩-৬৬)

Q. 9. Discuss the aim of education in the Primary and the Secondary stages.

Ans. (পৃঃ ৫০-৫৩)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম বলিতে কি বুঝি—আমরা শিক্ষকেরা পাঠ্যক্রম অনুসারে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়া থাকি। কোন্ শ্রেণীতে কোন্ বিষয়ে কি পড়াইব তাহা পাঠ্যক্রমই স্থির করিয়া দেয়; পাঠদানকালে আমরা উহাকে অনুসরণ করি মাত্র। এক রাষ্ট্রে এক ধরণের সকল বিদ্যালয়ে যাহাতে পাঠের বিষয়বস্তু সমান থাকে তাহার জন্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ বা মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে শ্রেণী এবং বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রম স্থির করিয়া দেন এবং বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ানো হইতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।

বাস্তবিকপক্ষে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ব্যতীত বিদ্যালয়ের পাঠ চলিতে পারে না। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়; ছাত্রদের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারের সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য (ধরা যাউক, ছাত্রদের মধ্যে যোগ, বিয়োগ, গুণন এবং ভাগ অঙ্ক কষার কৌশলের শিক্ষাদান করা হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য)। ছাত্রদের মধ্যে কি কি ব্যবহারের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শিক্ষাদানের প্রারম্ভেই স্থির করিয়া লইতে হয়; তারপর উদ্দেশ্য অনুসারে ছাত্রদিগকে কি কি অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরিয়া ছাত্রদের মধ্যে বহু রকমের ব্যবহার সৃষ্টি করিতে কামনা করে এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের বহু অভিজ্ঞতা দিতেও চেষ্টা করে। কার্যের সুবিধার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার এবং তাহাদের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের স্তরে স্তরে ভাগ করিয়া লওয়া হয়; বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রত্যেক বৎসরকে এক একটি স্তর (শ্রেণী) বলিয়া গণ্য করা হয়। তারপর যে সব অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দিতে হইবে তাহাদিগকে প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন "বিষয়ে" বিভক্ত করা হয় (ধরা যাউক, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কষাকে গণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল)। ইহাই পাঠ্যক্রম। মনে রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধমাত্র কার্যের সুবিধার জন্য উপরোক্ত ভাগাভাগি করা হয়। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে প্রতি বিষয়ে কি কি অভিজ্ঞতা ছাত্রদিগকে প্রদান

করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট তালিকাকেই আমরা পাঠ্যক্রম আখ্যা দিয়া থাকি। পৃথিবীর কোন দেশে কোনরূপ বিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রম ব্যতীত শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয় না।

পাঠ্যতালিকা কতখানি সুনির্দিষ্ট করা উচিত—পাঠ্যতালিকা যতই সুনির্দিষ্ট হইবে, শিক্ষাদানে ঠিক কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে সে সম্বন্ধে শিক্ষকগণ ততই স্পষ্ট ধারণা পাইবেন। ফলে, বিদ্যালয়ে পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার মানের মধ্যে অধিকতর সমতা স্থাপিত হইবে। কিন্তু অপর দিকে পাঠ্যক্রম অতিরিক্তভাবে নির্দিষ্ট হইয়া পড়িলে শিক্ষাদানকার্য যান্ত্রিক হইয়া পড়ে। প্রয়োগবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করিয়াছে। প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষক পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিবেন, শিকারী যেভাবে তাহার লক্ষ্যকে অনুসরণ করে—ঘোড়া দৌড়ের সময় যেভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে চেষ্টা করে সেভাবে নহে (following the curriculum is a chase and not a race)। ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়ার লক্ষ্যস্থল যেমন সুনির্দিষ্ট, ঐ লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য তাহাকে যে পথ (course) অনুসরণ করিতে হইবে তাহাও তেমনি সুনির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট কোর্স ব্যতীত অন্য কোন পথ দিয়া লক্ষ্যে পৌছিলে ঘোড়ার চলিবে না। শিকারীর ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষ্যই মুখ্য; যে-কোন পথ দিয়া লক্ষ্যে পৌছিলেই হইল। শিকারী তাহার লক্ষ্যে পৌছিবার নিমিত্ত কোন্ পথ অনুসরণ করিবে তাহা মোটামুটিভাবে স্থির করিয়া শিকারে অগ্রসর হয়। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে বার বার পথ পরিবর্তন করিতে হয়। তাহার লক্ষ্য সুনিশ্চিত হইলেও তাহা একস্থানে স্থির থাকে না। লক্ষ্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিকারীকে তাহার পথের পরিবর্তন করিতে হয়। শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষকের নিকট লক্ষ্যই মুখ্য। তিনি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে চান—ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবহার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ ব্যবহার-গুলি সৃষ্টি করার উপায় হিসাবেই তিনি পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিতেছেন। উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা (পাঠ্যক্রম) কখনও মূল উদ্দেশ্যের (ছাত্রদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি) উপরে স্থান পাইতে পারে না। যখনই পাঠ্যক্রম মূল লক্ষ্যে পৌছিবার পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে তখনই ইহা পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। আবার শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের

মধ্যে পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করে ; সে পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিবেচনা করিয়া শিক্ষাদানের লক্ষ্যেরও অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করিতে হয়। এমন কি, প্রয়োজনবোধে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের জন্য পৃথক পৃথক লক্ষ্য স্থির করিতে হইতে পারে। লক্ষ্যের পরিবর্তন হইলে স্বভাবতই লক্ষ্যে পৌছিবার পথেরও পরিবর্তন হইবে। তাই বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠ্যক্রমকে অতিরিক্তভাবে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার নীতি সমর্থন করেন না। ব্রিটেনে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম স্থির করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়-বস্তুর মধ্যে সমতা রক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাদপ্তর Handbook of Suggestions নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় (বিদ্যালয়ে) বিভিন্ন বিষয় পাঠের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকে এবং ঐ সব লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে ছাত্রদের কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিলে সুবিধা হইতে পারে তাহার আলোচনাও করা হয়। তারপর কোন বিষয়ের লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য ঠিক কি কি অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা বিদ্যালয় নিজেই স্থির করে।

পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিন্তু অত্যন্ত যান্ত্রিক। যাঁহারা পাঠ্যক্রম রচনা করেন তাঁহাদেরও পাঠদানের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। পাঠ্য-ক্রমে পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা ত দূরের কথা তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই থাকে না। সাধারণতঃ পাঠ্যক্রম রচনার জন্য যাঁহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাঁহারা শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত নহেন—শিক্ষা সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গী কিছুই নাই। ফলে, শিক্ষার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট না করিয়া যে পাঠ্যক্রম রচনায় ব্রতী হওয়া যায় না সে ধারণাই তাঁহাদের নাই। পাঠ্যক্রম রচনাকারীদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে প্রকৃত ধারণা থাকে না। যে মান মনে রাখিয়া তাঁহারা পাঠ্যক্রম রচনা করেন তাহা অনেক সময়ই বিদ্যালয়ের মানের উর্ধ্বে হইয়া পড়ে। তারপর তাঁহাদের মনে ধারণা থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করাই বুঝি মাধ্যমিক শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইলে ভিত্তি হিসাবে যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন উহাদিগকে তাঁহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের-অতিরিক্ত প্রভাব হইতে দূরে আনিবার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপকদের উপর পাঠ্যক্রম রচনার দায়িত্ব দেওয়ার ফলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

সংশ্লিষ্ট সকলে (শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা এবং পরীক্ষক) যান্ত্রিকভাবে পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিয়া থাকেন—উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্দেশ্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতেছে জানিয়াও অনেক সময় শিক্ষকগণ পাঠ্যক্রমকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলেন। সুতরাং পাঠ্যক্রম রচনায় আমাদের নূতন নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। সর্বপ্রথমেই যে বিষয়ে যে শ্রেণীর জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করা হইতেছে ঐ বিষয়ে ঐ শ্রেণীতে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। তারপর কি কি ধরণের অভিজ্ঞতা প্রদান করিলে ঐ লক্ষ্যগুলিতে পৌছান সম্ভব তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ তালিকা বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিক্ষককে ধারণা দিবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঠিক কি কি অভিজ্ঞতা দিতে হইবে ইহা স্থির করিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকিবে। এই নীতি অনুসরণ করিলে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা করিয়া সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনা করা উচিত নহে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শিক্ষার এক এক স্তরের লক্ষ্য এক এক রূপ; শ্রেণী হিসাবে তাহাকে ভাগাভাগি করিতে গেলে উহা অত্যন্ত কৃত্রিম হইয়া পড়ে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই স্তরে ভাগ করিলে প্রতি স্তরের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতি স্তরের প্রতি শ্রেণীর জন্য আলাদাভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় এবং পাঠ্যক্রম রচনা করার চেষ্টা করিলে তাহা যে কৃত্রিম হইয়া পড়িবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র স্তরের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া (নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক) প্রত্যেক শ্রেণীতে ইহা কিভাবে অনুসরণ করা হইবে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাস্তরের জন্য নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে কতগুলি অভিজ্ঞতা দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকিবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যে অধিকতর স্বাধীনতা দানের প্রসঙ্গ উঠিলেই অনেকে যুক্তি দেখান যে, আমাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা আশানুরূপ নহে; তাই শিক্ষাদান কার্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে ক্ষতি হইবে। কিন্তু এই যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষক যদি অযোগ্যই হন, তবে তাঁহাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া চলে না। অন্ধভাবে পাঠ্যক্রমের অনুসরণ

করিতে শিক্ষককে বাধ্য করিয়া শিক্ষাদানে তাঁহার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যায় এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে অচল। ঐরূপ নীতি অনুসরণ করার ফল যে কিরূপ বিষময় হইয়াছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকা—আমাদের পাঠ্যক্রমগুলি ছাত্রদের অভিজ্ঞতা অনুসারে রচিত না হইয়া "বিষয়" (subject) অনুসারে রচিত হয়। অর্থাৎ যে-কোন শ্রেণীর পাঠ্যক্রমকে প্রথমেই ইংরেজি, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়; তারপর প্রত্যেক বিষয়ে ঐ শ্রেণীতে কি কি পড়িতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরা পাঠ্যক্রম রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করি বলিয়া এখনও "বিষয়" অনুসারে পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া থাকি। লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে; ঐসব লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার পরিমাণ যখন খুব বেশী হইয়া পড়িল তখন আলোচনার সুবিধার জন্য সমজাতীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহাদের এক একটি করিয়া নামকরণ করা হইল। এইভাবে সাহিত্য, পদার্থ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সৃষ্টি হইল। শ্রেণী বিভাগ এবং নামকরণকালে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সম্বন্ধেই প্রধানতঃ বিচার করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষের ব্যবহার (Human behaviour)-সংক্রান্ত সকল অভিজ্ঞতাকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাকে আখ্যা দেওয়া হইল অর্থনীতি (Economics); মনোবিজ্ঞান (Psychology) মানুষের দেহ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নাম দেওয়া হইল শরীরতত্ত্ব (Physiology) ইত্যাদি। প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহের পন্থারও পার্থক্য আছে। ধরা যাউক, সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের পন্থা হইতেছে কল্পনা, চিন্তা, বিচার ইত্যাদি; কিন্তু রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় হইতেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiments)। উপরোক্ত নীতি অনুসারে মানুষের অভিজ্ঞতাকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—১। মানব-বিজ্ঞান (Humanities)—মানব-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ করিয়া মানুষের নিজের অন্তরের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ—যথা, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি। ২। সমাজ-বিজ্ঞান (Social Sciences)—এই বিষয়ের জ্ঞান কিছুটা মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ, কিছুটা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে লব্ধ—যথা—মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি। ৩।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Sciences)—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ—যথা, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র ইত্যাদি। উপরোক্ত তিনটি বিভাগকে আবার অনেক ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বিত্যালয়ের পাঠ্যক্রমের "বিষয়"গুলি প্রধানতঃ ঐসব বিভাগ হইতেই গৃহীত।

মানুষের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করার ফলে আমাদের মনে কিন্তু অনেক ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের ধারণা জন্মাইয়াছে যে, অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা পাঠ করিলেই বুঝি শিক্ষালাভ হয়। তারপর আমাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষের অভিজ্ঞতাকে সত্য সত্যই বুঝি "বিষয়ের" ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায়; বিষয়গুলি যেন পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দুই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতেই আমাদের পাঠ্যক্রম রচিত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠ্যক্রমে আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিষয় এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য কি কি পাঠ করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত তালিকা থাকে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা পাঠ, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি মাত্র এবং ঐ ধরণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ সুকঠিন—উহা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শিক্ষাক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী। আমাদের একথাও স্মরণে থাকে না যে, অভিজ্ঞতাকে বিষয়ের গণ্ডি দিয়া আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে উহা কৃত্রিম হইয়া পড়ে। ধরা যাউক, দিল্লীর লালকিল্লা দেখার অভিজ্ঞতাকে আমরা যদি "বিষয়ে" ভাগ করিতে যাই, তবে দেখিব ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমরা এক সঙ্গে লাভ করিতেছি। আমরা যদি বিদ্যালয়ে অপরের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা মুখস্থ না করিয়া ছাত্রকে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অপরের অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিতে চেষ্টা করি তবে বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠক্রমের কৃত্রিমতা দূর করিবার জন্য উদ্যমশীল শিক্ষকগণ পাঠদানকালে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে "পারস্পরিক সম্বন্ধ" (Co-relation of Studies) স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তারপর শিক্ষাদান কার্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি যখন আরও বৃদ্ধি পাইল তখন স্থির হইল যে, পাঠ্যক্রমকে অনেকগুলি ছোট ছোট বিষয়ে বিভক্ত না করিয়া শুধু মাত্র তিনটি

মূল ভাগে (Broad Fields) বিভক্ত করা হউক (মানব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি)। আরও অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষাবিদ্‌গণ বুঝিলেন যে, পাঠ্যক্রমকে বিষয়-কেন্দ্রিক করিলে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতি কৃত্রিম হইয়া পড়িতে বাধ্য। যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিকে গ্রহণ করিলে পাঠ্যক্রমে পাঠ্য "বিষয়ের" তালিকা না দিয়া "লিখন অভিজ্ঞতার" (Learning Experience) তালিকা দেওয়া প্রয়োজন। তাই অধুনাতম পাঠ্যক্রম রচনার পদ্ধতি হইতেছে যে, যে বিষয়ের পাঠ্যক্রম রচিত হইতেছে প্রথমে উহার পাঠের উদ্দেশ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে ; প্রত্যেক উদ্দেশ্যের নীচে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে ছাত্রদের কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহারও তালিকা থাকিবে। পুস্তক-পাঠ ঐ অভিজ্ঞতার তালিকায় অবশ্যই স্থান পাইবে, কিন্তু ইহা হইবে তালিকার অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র একটি।

শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন ও পাঠ্যক্রম—শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারেই পাঠ্যক্রম রচিত হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ধারণা থাকিলে পাঠ্যক্রমও পৃথক পৃথক ভাবে রচিত হইবে। যুগ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যের যেরূপ পরিবর্তন হইবে পাঠ্যক্রমেরও সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিবে।

প্রাচীন যুগে মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিল—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত। মানুষের চরিত্র এবং ব্যবহারের ভিতর দিয়াই এই বিকাশ প্রতিফলিত হয়। তাই পাঠ্যক্রমে পুস্তক পাঠ এবং অভ্যাস উভয়ই সমান গুরুত্ব লাভ করিত। প্রাচীন ভারতে বেদাদি গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সন্ধ্যা, সমিধ সংগ্রহ ইত্যাদি অভ্যাস গঠন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও দর্শন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চর্চার ব্যবস্থা ছিল। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন সভ্য দেশগুলির পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে তাহারা বিষয়-কেন্দ্রিক না হইয়া অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিলেও সমাজ-জীবনের প্রয়োজনও শিক্ষাক্ষেত্রে কখনও অবহেলিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতে "অধ্যাত্ম জীবন" এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলেই ছাত্র সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইত। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা শেষে সমাবর্তন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিবার অভিজ্ঞান (Certificate) বলিয়া গণ্য হইত। গুরুগৃহে ছাত্রকে যে সব বিষয়

পাঠ এবং যে সব অভ্যাস গঠন করিতে হইত তাহা বাস্তবজীবনে পুরাপুরিই কাজে লাগিত; এমন কি বৃত্তি শিক্ষাদানও (ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যাপনা এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবিদ্যা) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে সত্যম, শিবম্, সুন্দরমের উপলব্ধি করাইবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও চলিত। এ্যারিস্টটল্ (Aristotle) তাঁহার 'পলিটিক্স' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—শিশুকে প্রয়োজনীয় জিনিস, যাহা কার্যকরী তাহা যে শিক্ষা দিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না (There can be no doubt that children should be taught those useful things which are really necessary)। প্রাচীন রোমে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিত্বের মুক্তিকামী (Liberal education to liberate the mind)। ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে যে সাতটি বিষয়ের তালিকা থাকিত (Trivium and Quadrivium) তাহা বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমান নাগরিকদের সমাজ-জীবনে যে সব কার্যে ব্রতী হইতে হইত (সৈনিক, রোমান প্রদেশের শাসনকর্তা ইত্যাদি) তাহার জন্যও ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থাও কখনও তাহার পাঠ্যক্রম রচনায় সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই—প্রয়োজনীয়তার নীতিকে (Utility theory) পাঠ্যক্রম রচনায় যথাযথ স্থান দিয়া আসিয়াছে। রুশোর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রকৃতিবাদীরা অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্র হইতে নীতি হিসাবে সমাজের দাবীকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চাহিয়াছেন। পাঠ্যক্রমে এমন কোন বিষয় থাকিবে না যাহা শিশুর বর্তমান চাহিদা, বর্তমান আগ্রহের সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কৈশোরের পর ছাত্রকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার নীতি রুশো নিজেই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক, উগ্র প্রকৃতিবাদী মতানুসারে সমাজের প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশের পাঠ্যক্রম রচিত হয় নাই।

একমাত্র মধ্যযুগে এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা বাস্তবজীবনের প্রয়োজন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। মধ্যযুগের শিক্ষাবিদ্গণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী ছিলেন, কিন্তু ধর্মশিক্ষাকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র পন্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। ধর্ম ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবন উভয় হইতেই দূরে সরিয়া

আসিয়াছিল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশও ঘটিত না, আবার বাস্তবজীবনের জন্য প্রস্তুতিও হইত না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষা-দর্শনের দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীই ছিলেন; কিন্তু মানসিক শৃঙ্খলাবাদের (Mental Discipline) প্রভাবে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় (Latin, Greek ইত্যাদি) পাঠের দ্বারা মানসিক ক্ষমতা (Faculty) গুলি বিকশিত হইয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঐসব বিষয় পাঠের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশও হইত না, আর শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবনেও ঐসব বিষয় পাঠ কোন কাজেই আসিত না। এক কথায় শিক্ষা যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে শুধুমাত্র সেইখানেই শিক্ষাদ্বারা বাস্তবজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই।

বর্তমান যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পাঠ্যক্রম রচনাকালে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব অরোপ করিয়া থাকেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মত শিক্ষা এখন আর সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। শুধুমাত্র জীবিকার্জনের জন্য যাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইবে শিক্ষা তাহাদের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে। আবার সকল দিক হইতেই (আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত) সমাজ-জীবন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, পাঠ্যক্রম রচনাকালে কোন শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনই সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পারে না। ব্রিটেনের শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটামুটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের নীতিতে গঠিত। ব্রিটেনের শিক্ষা দপ্তর হইতে প্রকাশিত Handbook of Suggestions for Teachers পুস্তিকায় পাঠ্যক্রম রচনার নীতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের মনোভাব এই আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে যে, শিশুদের মধ্যে আমরা সেই ধরণের অভ্যাস, কৌশল, আগ্রহ, "সেন্টিমেণ্ট" জন্মাইতে সাহায্য করিব যাহা তাহাদের নিজেদের এবং যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস করিবে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইবে ("Our attitude towards the curriculum has been influenced by a desire to assist children to acquire or develop the habits, skills, interests and sentiments which they will need both for their own well-being and that of other people among whom they will live.") বাস্তব-

জীবনের প্রয়োজন অস্বীকার না করিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পাঠ্যক্রম রচনা-কালে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনকেই কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব দেন। সমাজ-জীবনে মানুষের যে সব মহান্ কীর্তি (সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চারুকলায় ইত্যাদি) আছে উহাদিগকে শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। নান সাহেব লিখিয়াছেন—বৃহত্তর পৃথিবীতে মানুষের যেসব স্থায়ী এবং বৃহৎ কীর্তি আছে বিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রতিবিম্বিত করিবে (The School must reflect those human activities that are of most greatest and most permanent significance in the world.) তাঁহার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া নান সাহেব লিখিয়াছেন যে, মানুষের বৃহৎ কীর্তিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—যে সব কার্য মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাহাদিগকে আমরা প্রথম ভাগে ফেলিয়া থাকি—ধরা যাউক, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক সংঘটন, নীতিবোধ, ধর্ম ইত্যাদি ; দ্বিতীয় ভাগে পড়ে মানুষের বিশেষ ধরণের সৃজনাত্মক কর্মগুলি যাহা সভ্যতার প্রধান ভিত্তি ("In the first we place the activities that safeguard the conditions and maintain the standard of individual and social life. Such as the care of the wealth and bodily grace, manners, social organisation, morals, religion ; in the second the typical creative activities that constitute so to speak the solid tissues of civilization.") নান সাহেবের মতে প্রথম ভাগে বর্ণিত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ পাঠের বস্তু হইতে পারে না ; বিদ্যালয়-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই শিশু ঐসব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়-গুলিই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের (Complete education) নিমিত্ত নান সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন—১। সাহিত্য, মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অবশ্যই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ২। কোন রকমের চারুকলা তাহার মধ্যে সঙ্গীত অবশ্যই থাকিবে ; ৩। হাতের কাজ ; শিক্ষাদানকালে কার্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ৪। অঙ্কসহ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোলও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন বিষয়কেই নান সাহেব তাহার স্বকীয় গুরুত্বের জন্য পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন নাই। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে ঐসব বিষয়ের গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়াই নান সাহেবের কাছে উহারা পাঠ্যক্রমে স্থান পাইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদীরা কিন্তু পাঠ্যক্রম রচনাকালে জীবনের প্রয়োজন তথা সমাজের প্রয়োজনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে সমাজ-জীবনে শিশুকে যেসব ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। হার্বার্ট স্পেনসার মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তালিকা দেন—১। আত্মরক্ষা (Self-preservation); ২। জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহকরণ (Procuring necessities of life); ৩। শিশুপালন (Rearing children); ৪। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ (Social and political relations); ৫। সংস্কৃতি। আমেরিকার National Education Association Commission মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সাতটি প্রধান নীতি প্রস্তুত করেন—১। মূল প্রণালী-গুলি (Fundamental processes); ২। স্বাস্থ্য (Health); ৩। পরিবারের সভ্য হওয়া (Home membership); ৪। বৃত্তি (Vocation); ৫। নাগরিকতা (Citizenship); ৬। অবসর বিনোদন (Leisure); ৭। নৈতিক সম্বন্ধ (Ethical relationship)। ববিট্ সাহেব (Bobbitt) মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে দশটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত করেন—১। সাহিত্য-সংক্রান্ত কার্য (Language activities); ২। স্বাস্থ্য (Health); ৩। নাগরিকতা (Citizenship); ৪। সাধারণ সামাজিক সংযোগ (General Social contacts); ৫। মনের দিক হইতে যোগ্য থাকা (Keeping mentally fit); ৬। অবসর সময়ের কার্য (Leisure occupations); ৭। ধর্ম-সংক্রান্ত কার্য (Religious activities); ৮। পিতামাতার দায়িত্ব (Parental responsibilities); ৯। অবিশেষ বাস্তব কার্যাবলী (Un-specialised practical activities); ১০। বৃত্তি-সংক্রান্ত কার্যাবলী।

সমাজতন্ত্রবাদীদের পাঠ্যক্রম রচনার নীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নীতি (utility) পাঠ্যক্রম রচনায় সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করে। শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদা, বা তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনের কথা পাঠ্যক্রম রচনাকালে সমাজতন্ত্রবাদীরা পৃথকভাবে বিবেচনা করেন না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি যেসব বিষয় ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষভাবে

সাহায্য করে বলিয়া আমরা জানি সেইগুলি সমাজতন্ত্রবাদীদের পাঠ্যক্রমেরও অন্তর্ভুক্ত থাকে; কেবলমাত্র তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হয়। সংক্ষেপে, উদ্দেশ্যের কথা না জানিয়া সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দ্বারা প্রস্তুত এক শ্রেণীর জন্য দুইটি পাঠ্যক্রম দেখিলে হয়ত কোন পার্থক্য ধরা পড়িবে না। উদ্দেশ্যের দিক হইতেও, প্রয়োগবাদীরা সমাজতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রয়োগ-বাদীরা বিশেষ করিয়া বাস্তব প্রয়োজনবাদে (utility) বিশ্বাসী; কিন্তু তাঁহাদের মতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া তাহার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিতে হইবে—পাঠ্যক্রম শিশুর আগ্রহ, কর্ম এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হইবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই—পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা সমাজের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া শিশুর জীবনের চাহিদার কথা চিন্তা করিব। পাঠ্যক্রম প্রধানতঃ হইবে শিশু-কেন্দ্রিক। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম রচনাকালে ডিউই সাহেব শিশুর চারিটি আগ্রহের ক্ষেত্রের কথা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিতে লিখিয়াছেন—১। ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান (interest in conversation or communication); ২। বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ (interest in enquiry and finding out things); ৩। বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করিতে আগ্রহ (interest in making things or construction); ৪। চারুকলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ আগ্রহ (interest in artistic expression)।

শিশুর আগ্রহের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম রচনা করা হইলে সে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইল; সমাজের প্রয়োজনে কোথাও তাহাকে খর্ব করা হইল না। অপর দিকে শিশু জীবনের চাহিদা সমাজনিরপেক্ষ নহে। সমাজই শিশুর জীবনের চাহিদা সৃষ্টি করে। সমাজের বিভিন্নতা অনুসারে শিশু-জীবনের চাহিদাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। ধরা যাউক, একটি ব্রিটিশ শিশু এবং একটি ভারতীয় শিশুর জীবনের চাহিদার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সমাজ-জীবনের প্রয়োজন শিশু-জীবনের চাহিদার মধ্যে প্রতিবিম্বিত না হইয়া পারে না। তাই পাঠ্যক্রম রচনার পূর্বে শিশু যে সমাজে বাস করিতেছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার জীবনে কি ধরণের চাহিদা জন্মাইতে পারে তাহা স্থির করিয়া লইতে হয়। ইংলণ্ডে Council for Curriculum Reforms (১৯৪৫ খ্রীঃ) বর্তমান সমাজব্যবস্থার

আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য সমাজের কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে নিম্নলিখিত চাহিদাগুলির সৃষ্টি হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—১। অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধীয় (Concerning economic life) ; ২। ব্যক্তিগত পরস্পর সম্বন্ধ সম্পর্কীয় (Concerning face to face personal relationships) ৩। ব্যক্তির সহিত দলের (সংঘবদ্ধ বা আংশিকভাবে সংঘবদ্ধ) সম্বন্ধ সম্পর্কীয় (Concerning relationship of individuals to organised and semi-organised groups); ৪। ব্যক্তিগত এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োজন সম্বন্ধীয় (Concerning internal and individual needs)।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে সমাজ এবং ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হয় না--এককে অপরের অবিভাজ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের মধ্যেও কোন পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয় না। বর্তমান জীবনের প্রয়োজন নিবৃত্তি স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন নিবৃত্তিতে সাহায্য করিবে। তাই বর্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিশু-চাহিদা-কেন্দ্রিক (Need centred) পাঠ্যক্রম রচনা করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সর্বপ্রথমে শিশুর বয়স অনুসারে তাহার চাহিদাগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয় ; উহাদের নিবৃত্তিকে ঐ স্তরের (শিশুর বয়স অনুসারে শিক্ষাস্তরকে ভাগ করা হয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তারপর প্রত্যেক প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য শিশুকে কি কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে এবং ঐ সব অভিজ্ঞতা দিলে তাহার মধ্যে কি কি ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি হইবে তাহারও তালিকা প্রস্তুত করা হয়। শিশু-জীবনের চাহিদা তাহাদের নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং উহার ফল হিসাবে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের সৃষ্টি ইহাদের সব কিছুই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। আমেরিকার Progressive Education Association ১৯৩০ খ্রীঃ হইতে আট বৎসর ধরিয়া ত্রিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপরোক্ত নীতিতে পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া পাঠদানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার (Experiment) ফলাফল উপরোক্তরূপ পাঠ্যক্রম রচনা করার নীতির সমর্থন করে।

পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতি—উপরোক্ত আলোচনা হইতে হয়ত এইটুকু বোঝা গিয়াছে যে, পাঠ্যক্রম রচনা করা খুবই জটিল কাজ এবং শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অপর কাহারও উপর ঐ দায়িত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইলে আমাদের নিম্নলিখিত নীতির কথা মনে রাখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদিগকে **উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী** গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকা মাত্র নহে; উহা বিদ্যালয় জীবনে কি কি ধরণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইবে তাহারই ইঙ্গিত। কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের বা গ্রহণীয় অভিজ্ঞতার তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলেই পাঠ্যক্রম রচনার কার্য শেষ হয় না। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, গ্রহণীয় অভিজ্ঞতা এবং ছাত্রদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার এই তিন বিভাগে সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিলে পর পাঠ্যক্রম রচনার কার্য শেষ হয়।

পাঠ্যক্রম রচনায় **ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতার নীতি** (Individual relevance) কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন হইতেই শিক্ষার আরম্ভ—নিজ প্রয়োজনের তাগিদে অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিলে শিক্ষালাভ হয় না, ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। তাই প্রাচীন ভারতে নীতি ছিল যে, "জিজ্ঞাসু" ব্যতীত কাহাকেও কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। বর্তমানে আমরা বলিয়া থাকি যে, শিক্ষা গ্রহণের জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি (maturity) না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ শিক্ষাদান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তাই পাঠ্যক্রমের অভিজ্ঞতার তালিকায় এমন কোন অভিজ্ঞতার নাম থাকিবে না যাহার শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আমরা সাধারণতঃ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া, শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার কথা স্মরণে না রাখিয়া, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের নিকট হইতে কতকগুলি জ্ঞানভার শিশুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করি। এতদিন আমাদের পাঠ্যক্রম ছিল যুক্তিতান্ত্রিক (Logical), মনস্তত্ত্বতান্ত্রিক (Psychological) নহে। শিক্ষাকার্য শিশুকেন্দ্রিক করিতে হইলে পাঠ্যক্রমকে সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক করিতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে পাঠ্যক্রম রচনা কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে শিশুর বয়স, তাহার শারীরিক এবং মানসিক পরিণতির স্তর, তাহার বর্তমান জীবনের চাহিদা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদিগকে **সমাজ প্রাসঙ্গিকতার** নীতি (Social relevance)ও অনুসরণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের কথা ভাবিলে চলিবে না, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথাও

ভাবিতে হইবে। শিক্ষা যদি শিশুকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত না করিতে পারে তবে তাহা অনেকাংশে ব্যর্থ একথা সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই পাঠ্যক্রমের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সমাজ-জীবনের সহিতও সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন এক সূত্রে গাঁথা—বর্তমান জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করিবে। কাজেই তাহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের চাহিদার কথা এক সঙ্গে ভাবিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা কঠিন নহে। শিশুর জীবনের বিকাশ এবং পাঠ্যক্রমের বিকাশ পরস্পর পরস্পরের সহিত তাল রাখিয়া চলিবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতা ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতার নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়।

শিশুতে শিশুতে পার্থক্যের কথা (Individual difference) স্মরণ রাখিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়। জন্মগত ক্ষমতায় আগ্রহে, চারিত্রিক গুণাবলীতে শিশুতে শিশুতে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা (Tests) আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে, শিশুতে শিশুতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। সকল শিশুকে এক ছাঁচে গড়িয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে—ইহাতে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও মঙ্গল হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম রচনাকালে ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। ১৩ বৎসর বয়স হইতে শিশুর অপরের সহিত ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদিতে পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। তাই বিশেষ করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলির পাঠ্যক্রমকে "Core" বা "Perephery" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পাঠ্যক্রমের "Core" অংশের অভিজ্ঞতা সকল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে হয় (মাতৃভাষা, অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান), কিন্তু Perephery অংশে ছাত্র নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারে। তারপর যে কোন শ্রেণীর জন্য যে কোন বিষয়ের পাঠ্যক্রম রচনাকালে সম্ভব হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদিগকে নিজ নিজ ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ দিতে চেষ্টা করিতে হয়। ধরা যাউক, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে scrap book রক্ষা করাকে যদি অভিজ্ঞতার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের রুচি অনুসারে নিজেদের scrap book ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূর্ণ করিতে পারে। এইরূপে প্রতি বিষয়েই ছাত্রদিগকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের **অবিভাজ্যতার নীতিরও** অনুসরণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র মানুষ (Whole man)কে গড়িয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কার্যের সুবিধার জন্য আমরা শিক্ষাকে স্তরে স্তরে ভাগ করিতে পারি, প্রতি স্তরকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, কিন্তু শিক্ষার প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত আমরা একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেছি। কাজেই যে কোন স্তর বা যে কোন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে—প্রতি স্তর এবং প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের অপরাপর স্তর এবং শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোন শ্রেণীতে কোন বিষয়ে পাঠ্যক্রম রচনাকালেও এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, মানুষের অভিজ্ঞতাকে বিষয়ে বিষয়ে ভাগ করা একান্ত কৃত্রিম। অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষায় এইরূপ বিষয় বিভাগ একেবারেই অচল। তাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে মোটামুটিভাবে ভাগ করিলেও তাহারা যে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একথা মনে রাখিতে হইবে।

পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনশীলতার কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপায় মাত্র। আবার শিক্ষাদান কালে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব—বিশেষ করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক শিক্ষক এবং প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যখন পার্থক্য রহিয়াছে তখন একই পাঠ্যক্রম সকলক্ষেত্রে হুবহু অনুসৃত হইলে তাহা যান্ত্রিক হইতে বাধ্য। কাজেই পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয় এবং শিক্ষক তাহার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিতে পারেন। ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে এবং ঐসব অভিজ্ঞতাকে কোন্ কোন্ স্তর পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে তাহার ইঙ্গিতমাত্র পাঠ্যক্রম প্রদান করিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ছাত্র পাঠ্যক্রমকে শিকারীর মত অনুসরণ করিবে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সে পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিবে না।

পাঠ্যক্রমকে আমাদের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম আহরণীয় জ্ঞানের তালিকামাত্র এই ধারণা যে ভ্রান্ত এ আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। পাঠ্যক্রমকে কতকগুলি বিষয়-পাঠের তালিকায় পর্যবসিত করার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে

আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়াছে। পাঠকেই আমরা শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে যে সব কার্যের (Activity) সুযোগ দেওয়া হয় তাহা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া তাহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে ছাত্রেরা স্বকীয়কর্ম বা অভিজ্ঞতা দ্বারাই শিক্ষালাভ করে। পাঠও তাহাদের একটি কর্ম বটে; কিন্তু এ ধরণের কর্ম দ্বারা সহজে শিক্ষা লাভ হয় না। বস্তুত পক্ষে শিক্ষালাভ ব্যাপারে পুস্তকপাঠ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্ম হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অধিক। তাই পাঠ্যক্রমে পাঠ্যবিষয়ের তালিকা না দিয়া বিভিন্ন ধরণের কার্য বা অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্র (Field of experience) সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান পাঠ্যক্রমে গলদ—উপরে আলোচিত নীতিগুলির ভিত্তিতে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। পাঠ্যক্রম যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্যই সমান প্রয়োজনীয়। পাঠ্যক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া দেয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও সুনির্দিষ্ট করে। পাঠ্যক্রম হইতে শিক্ষক এবং ছাত্র নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা পাইয়া থাকেন। বাহ্যিক পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্র রচনাকারী পাঠ্যক্রম হইতে প্রশ্নপত্র রচনার বিষয়বস্তু পাইয়া থাকেন। তারপর একই সমাজের, একই স্তরের, একই ধরণের বিদ্যালয়ের কার্যের মধ্যে সমতা স্থাপনের নিমিত্তও আমাদের পাঠ্যক্রমের সাহায্য লইতে হয়। সমাজ বিদ্যালয়ের কার্যাবলী পরিবর্তন করিতে চাহিলে তাহাও পাঠ্যক্রমের সাহায্যে করিতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বর্তমান পাঠ্যক্রমের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—

১। আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনকেই উহা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত তাহাকে "প্রবেশিকা পরীক্ষা" (Entrance Examination) নাম দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় "প্রবেশের" যোগ্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান দেওয়ার

নিমিত্তই ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। বর্তমানে পরীক্ষার নাম পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহার পরিচালনার ভার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে চলিয়া আসিলেও বাস্তবক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার অতিরিক্ত মর্যাদার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। তারপর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করার দায়িত্বও এখনও প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহারাই আবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া থাকেন। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দাসত্ব করিতেছে—প্রাথমিক শিক্ষাও ঠিক একই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার দাসত্ব করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়াই রচিত হইয়া থাকে।

২। এই অবস্থার আর একটি ফল হইতেছে এই যে, আমাদের পাঠ্যক্রম **পুস্তককেন্দ্রিক** এবং **তত্ত্বকেন্দ্রিক** (Bookish and theoretical) হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম হইতেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। নানা কারণ হইতে বাস্তব জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবার ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত "স্কলাষ্টিক" (Scholastic) হইয়া পড়িয়াছিল—পুস্তক পাঠ এবং অর্থহীন বাক্যসম্ভার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অচল। ঐ স্তরের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই হয়ত পুস্তককেন্দ্রিক এবং তত্ত্বকেন্দ্রিক শিক্ষার যোগ্য নহে। তাহাদের হাতে-কলমে শিক্ষার প্রয়োজন। তার উপর মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া সরাসরি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে। বর্তমান পাঠ্যক্রম তাহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। শিক্ষাকে যদি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করিতে হয় এবং তাহাকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পাঠ্যক্রম রচনা করা কর্তব্য।

তারপর পাঠ্যক্রমে শুধু পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের নাম থাকার

দরুণ আমাদের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়াছে যে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠই শিক্ষা আখ্যাদানের যোগ্য। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে যে শিক্ষালাভ হয়, উহা যে পুস্তক পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষাদান কার্যে অনেক অধিক মূল্যবান একথা আমরা বিশ্বাসই করিতে চাহি না। তাই আমাদের পাঠ্যক্রমকে বিষয়কেন্দ্রিক না করিয়া অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করা প্রয়োজন।

৩। একদিকে আমাদের পাঠ্যক্রম অনাবশ্যক বিষয়ে পরিপূর্ণ অপরদিকে উহাতে ছাত্রদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। জ্ঞানের ভাণ্ডার ছাত্রদের কাছে উজার করিয়া দিতে হইবে—বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উচ্চতম জ্ঞানের আস্বাদনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ ধারণা হইতে আমরা শিক্ষার প্রতি স্তরে ছাত্রদের মনকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে চাই। তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতা, তাহাদের আগ্রহ, অনাগ্রহের কথা একবার চিন্তাও করি না। যাহা শিক্ষা দিতে চাই ছাত্রদের বর্তমান জীবনের চাহিদা বা ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই প্রায় নাই। এই অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন স্বাভাবিক প্রেরণাই ছাত্রদের থাকিতে পারে না। অনিচ্ছুক ছাত্রদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিবার নিমিত্ত শিক্ষককে কখনও বা শাস্তি, কখনও বা পুরস্কারের আশ্রয় লইতে হয়। তাই পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদিগকে ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতা এবং সমাজ প্রাসঙ্গিকতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

৪। ছাত্র ছাত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথাও আমরা পাঠ্যক্রম রচনাকালে স্মরণ রাখি না। এক শ্রেণীর সকল ছাত্রকে একই ধরণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হয়—তাহাদের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিভিন্নতা হিসাবে তাহারা পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা গ্রহণের কোন সুযোগই পায় না। পাঠ্যক্রমকে Core এবং Perephery তে বিভক্ত করা হয় না। ফলে যাহাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রহণের ক্ষমতা বা আগ্রহ থাকে না তাহারা এইরূপ পাঠ্যক্রম অনুসরণের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা এত অধিক হওয়ার অন্যতম কারণ।

৫। কৈশোরে সাধারণতঃ ছাত্রেরা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ বয়সে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হয়।

কৈশোর জীবনের তিনটি প্রধান চাহিদা হইতেছে—(ক) ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা ; বয়োপ্রাপ্ত হইলে কি করিয়া জীবিকার্জন করিবে এবিষয়ে তাহাদের মনে

চিন্তা জন্মায়। আমাদের মত বেকারসমস্যা জর্জরিত দেশে ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের চিন্তা কিশোর মনের নিরাপত্তাবোধ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে। (খ) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধও কৈশোর জীবনের আর একটি সমস্যা। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বর্তমানে এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। (গ) কিশোরেরা আদর্শবাদী হয়—এই বয়সে তাহারা নিজদিগকে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চায়। আদর্শের সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া কিশোর জীবনের একটি বড় সমস্যা। আমাদের বর্তমান সমাজে আদর্শবাদ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত বলিয়া কিশোর জীবনের এই সমস্যা আরও প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কিন্তু এই তিনটি চাহিদার একটিও পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা নাই।

৬। পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন একটি "পাপচক্রের" (vicious circle) সৃষ্টি করিয়াছে। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির জন্য আমাদের পাঠ্যক্রম অনেকটা দায়ী। পাঠ্যক্রম রচনাকালে আমাদের মনে যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইতেছে এই যে, ছাত্রদিগকে এইরূপ অভিজ্ঞতা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে। পরীক্ষায় পাশ করানোকে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করায় আমাদের পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

৭। সর্বশেষে পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে আমরা যে ধরণের সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার অর্থনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অপরিহার্য যান্ত্রিক এবং বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম—উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমগুলি কিরূপ হইলে ভাল হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি—১। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করা, ২। সমাজ-জীবনের সর্বনিম্ন চাহিদা মিটানোর উপযুক্ত করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলা, ৩। যে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদের ঐ স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধির জন্য আমরা নিম্নলিখিতরূপ অভিজ্ঞতা শিশুকে দিতে চেষ্টা করিতে পারি।

১। বর্তমান সমাজে বসবাস করিতে হইলে, অপরের ভাবগ্রহণ করিবার জন্য **পঠন** এবং নিজের ভাব, প্রকাশ করিবার জন্য **লিখন** এই দুইটি কৌশল আয়ত্ত করা অপরিহার্য। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতা-মূলকভাবে পঠন এবং লিখন শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া থাকে। পঠন এবং লিখন শিক্ষাদান ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও ভিত্তি গঠন করে। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পঠনের সাহায্যে যে কোন স্তরের জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়। সাহিত্য রসের মাধ্যমে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের উপলব্ধি জীবনে করা চলে। দৈনন্দিন অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে লিখনের প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের কল্পনা-শক্তির বিকাশ, মনের অনভূতির প্রকাশের দ্বারা উচ্চতর স্তরের অনুভূতি লাভের জন্য প্রস্তুতি প্রভৃতির জন্যও লিখন কৌশল হিসাবে আয়ত্ত করা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায়ই পঠন এবং লিখন আয়ত্ত করার চেষ্টা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পঠন এবং লিখনকে কৌশল হিসাবে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে জীবনের যে কোন প্রয়োজনে তাহাদের ব্যবহার করা চলে। প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্রেরা সকলরূপ সামাজিক প্রয়োজনেই যাহাতে মোটামুটিভাবে পঠন এবং লিখনের ব্যবহার করিতে পারে এরূপ যোগ্যতা অর্জন করিবে ইহা আশা করা যায়। সাহিত্য রসের অল্প-স্বল্প অনুভূতি বা মনের সহজতম চিন্তা বা কল্পনা পঠন, লিখনের সাহায্যে প্রকাশ করার এক আধটু অভিজ্ঞতা ছাত্রেরা পাইলেও মন্দ হয় না। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বিভিন্ন ধরণের বিষয় পঠন এবং লিখনের (বিশেষ করিয়া সমাজ-জীবনের কথা মনে রাখিয়া) অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দিতে হয়।

২। সমাজ জীবনের সাধারণ প্রয়োজন নিবৃত্তির জন্য কিছুটা গণিত শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে (বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনে) ছাত্রেরা যাহাতে গণিতের ব্যবহার করিতে পারে সেইরূপ যোগ্যতা তাহাদের অর্জন করা উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে, গণিত শিক্ষাও এক বিশেষ ধরণের কৌশল শিক্ষা। সামাজিক প্রয়োজনে তাহার ব্যবহারেই ঐ কৌশল আয়ত্ত করার সার্থকতা। শুধুমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণন এবং ভাগ কষিবার অভিজ্ঞতা দিলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। গণিতের মাধ্যমে মানসিক শক্তিচর্চার ফলে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও সাহায্য হইবে।

৩। যে সমাজে আমরা বাস করি জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনেও তাহার

ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে এবং তাহার বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উহার রীতিনীতি, নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা ও প্রত্যেক নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। তাই সমাজবিদ্যা নাম দিয়া সমাজ-সংক্রান্ত উপরোক্ত ধরণের অভিজ্ঞতা ছাত্রদিগকে দিতে চেষ্টা করা হয়। ঐ সব অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সমাজ-জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়া হইলেও ব্যক্তিত্ব বিকাশেও ইহারা কম সাহায্য করে না। মনে রাখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে শিশুকে কতকগুলি নিষ্ক্রিয় জ্ঞান দেওয়াই যথেষ্ট নহে। সমগ্র অভিজ্ঞতাগুলিই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

৪। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, কুটির শিল্প ইত্যাদির স্থানও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাদের মাধ্যমে আবেগ, অনুভূতি, সৃজনী শক্তি ইত্যাদির প্রকাশের সুযোগ পাইয়া শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে কিছু কিছু পৃথক অভিজ্ঞতা দানেরও সুযোগ পাওয়া যায়। সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার নিমিত্তও ছাত্রদিগকে ঐসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা দান বাঞ্ছনীয়।

৫। স্বাস্থ্যবিদ্যা, শরীরচর্চা এবং গার্হস্থ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্রদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা দেওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের শারীরিক দিক গড়িয়া তোলাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা না হইলে ছাত্রদের পক্ষে সফল ও সার্থক জীবন যাপন সম্ভব নহে। গৃহনির্মাণ, রান্নাবান্না, কাপড়কাচা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে; ছাত্রেরা যাহাতে ভবিষ্যতে পারিবারিক জীবনে ঐ সব জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে পারে, তাহার জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা দেওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করা, উপযুক্ত অভ্যাস গঠন করা এবং যথাযথ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর (Mental attitude) সৃষ্টি অধিকতর মূল্যবান।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি পাঠ্যক্রম রচনাকালে ছাত্রদিগকে কি ধরণের শিখন-অভিজ্ঞতা (Learning Experience) দিতে হইবে তাহার তালিকা রচনা করিতে হইবে। পাঠ্যক্রমকে বিষয় এবং পাঠকেন্দ্রিক না করিয়া অভিজ্ঞতা এবং কর্মকেন্দ্রিক করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম—মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক এবং

মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়াই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ পক্ষে অগ্রসর দেশগুলিতে ঐ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক-করিয়া উহাকে প্রাথমিক স্তরের (Elementary) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। এতটুকু পর্যন্ত শিক্ষা না হইলে কাহারও সমাজ জীবনে প্রবেশের নিম্নতম যোগ্যতাও হয় না এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অনুরূপ হইবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে পাঁচটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমেও ঐ পাঁচটিকেই অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমের জন্য নিম্নলিখিত সাতটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব প্রথমেই হইতেছে প্রাথমিক স্তরে যাহাকে আমরা পঠন-লিখন বলিয়াছি, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তাহাই ভাষা আখ্যা পাইয়াছে। মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করাও এই স্তরে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। তবে ইংরেজীর ক্ষেত্রে কমিশনের এই মত যে অভিভাবকদের আপত্তি থাকিলে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হইবে না। ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মাধ্যমিক স্তরে হিন্দি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাহাদের ইংরেজী শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

তারপরে কমিশন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত, চারু কলা ও সঙ্গীত, কুটির শিল্প এবং শারীরিক শিক্ষার (Physical Education) নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত গার্হস্থ্য বিজ্ঞান যোগ করিলেই নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম পূর্ণাঙ্গ হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম—মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বর্তমান পাঠ্যক্রমের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে এবং

পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতি সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম দিকে করা হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় আছে; উহাদের পাঠ্যক্রমও বিভিন্ন। এখানে আমরা "সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের" পাঠ্যক্রমের আলোচনা করিব। আবার এখনও আমাদের দশম শ্রেণী ও একাদশ শ্রেণী এই দুই প্রকারের "সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" রহিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে দশম শ্রেণী ও একাদশী শ্রেণী উভয় প্রকার বিদ্যালয়েই এক ধরণের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা উচিত—কারণ উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই এক। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করিতে পরামর্শ দেন—

(ক) (i) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা এবং একটি প্রাচীন ভাষা (Classical language) একত্র সম্মিলিত কোর্স।

(ii) নিম্নলিখিত ভাষা হইতে আরও একটি শিক্ষার জন্য বাছিয়া লইতে হইবে—

১। হিন্দি (যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দি নহে তাহাদের জন্য)

২। প্রাথমিক ইংরেজী (যাহারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিখে নাই তাহাদের জন্য)।

৩। অগ্রসর ইংরেজী (Advanced English)—যাহারা পূর্বে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছে তাহাদের জন্য।

(iii) একটি আধুনিক ভাষা (হিন্দী ব্যতীত)

১। একটি আধুনিক বিদেশীয় ভাষা (ইংরেজী ব্যতীত)

২। একটি প্রাচীন ভাষা (Classical Language)

(খ) (i) সমাজবিজ্ঞান (Social Studies) প্রথম দুই বৎসরের জন্য।

(ii) গণিতসহ সাধারণ বিজ্ঞান—প্রথম দুই বৎসরের জন্য।

(গ) একটি কুটির শিল্প—কমিশন সূতা কাটা এবং কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, দর্জির কাজ ইত্যাদি ৯টি কুটির শিল্পের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি ; বা অপর যে কোন কুটির শিক্ষা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসাবে লওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) নিম্নলিখিত সাতটি গ্রুপের (Group) যে কোন একটি হইতে তিনটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রুপেই যে সব ধরণের অভিজ্ঞতা হইতে ছাত্রদের বাছাই করিতে হইবে তাহাদের নাম উল্লেখ আছে।

১। সাহিত্য (Humanities) ; ২। বিজ্ঞান (Science) ; ৩। যান্ত্রিক (Mechanical) ; ৪। বাণিজ্য (Commercial) ; ৫। কৃষি (Agriculture) ; ৬। চারুকলা (Fine Arts) ; ৭। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science).

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পরামর্শ অনুসরণ করিয়া অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন (All India Council of Secondary Education) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করেন। ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই মোটামুটি ঐ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে দেওয়া হইল—

"ক" বিভাগ

ভাষা—(i), (ii) এবং (iii) হইতে একটি করিয়া ভাষা শিক্ষার জন্য বাছিয়া লইতে হইবে ; কোন ভাষা একাধিকবার বাছা যাইবে না।

(i) (১) প্রথম ভাষা (First language)—বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, নেপালী বা উর্দু ;

অথবা

(২) উপরোক্ত যে কোন ভাষা এবং হিন্দির একত্র সম্মিলিত কোর্স।

(ii) দ্বিতীয় ভাষা—ইংরেজি (যাহারা প্রথম ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা করে) নাই বা বাংলা (যাহারা প্রথম ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছে তাহাদের জন্য)।

(iii) তৃতীয় ভাষা—হিন্দি, বাংলা, অথবা সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সী এবং ল্যাটিনের মধ্যে যে কোন একটি ভাষা।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যদিও দুইটি ভাষা শিক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ প্রত্যেক ছাত্রকে তিনটি ভাষা পড়িতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং আমাদের যে তিনটি ভাষার কম শিক্ষা করিলে চলিবে না এ সম্বন্ধে সকলেই একমত হইয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশনও তাহাদের পাঠ্যক্রমে প্রত্যেক ছাত্রকে তিনটি ভাষা শিক্ষা করার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এই ভাষা তিনটি কি কি হইবে এই লইয়াই সমস্যা। মাতৃভাষা শিক্ষা করা

সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা কি আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা হইবে? মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদের অবশ্যই ইংরেজী শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু অনেকেই হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং কে করিবে না তাহা স্থির করিতে পারিলে, দ্বিতীয় দলের ছাত্রদের হয়ত ইংরেজী না শিখিলেও চলিত। কিন্তু যাহারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে তাহাদের প্রায় সকলেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা থাকে। তারপর যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না তাহাদের শিক্ষা (ভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে) অধিকতর বৃত্তিমূলক করা প্রয়োজন। ঐ সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী অন্ততঃ অগ্রসর ইংরেজী (Advanced English) বাধ্যতামূলক না করিলেও চলিতে পারে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করিয়াছেন; নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সকল ছাত্রকে ইংরেজী শিক্ষা করিতে হইবে। তাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই প্রকার ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত সমাজ জীবনেও এখনও আমাদের দেশে ইংরেজীর যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দি এবং প্রাচীন ভাষার (সংস্কৃত ইত্যাদি) মধ্যে আর একটি দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। হিন্দি সর্বভারতীয় ভাষা। রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে সকল ভারতীয়েরই ইহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা না হইলে হিন্দির পক্ষে ভারতের রাষ্ট্র ভাষারূপে কাজ করা সম্ভব হইবে না। অপর দিকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন ভাষার (সংস্কৃত) উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারতের যাহা কিছু গৌরবের তাহা উহার প্রাচীন সংস্কৃতিরই অবদান—ফলে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা না করিলে ভারত তাহার ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। তারপর ব্যক্তিত্ব বিকাশে, বিশেষ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। হিন্দি এবং প্রাচীন ভাষার মধ্যে কোনটির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হইবে উহা স্থির করিতে না পারিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইবার অধিকার ছাত্রদের দিয়াছেন।

'খ' বিভাগ

১। সমাজ-বিজ্ঞান (Social studies) ; ২। সাধারণ বিজ্ঞানও ৩। প্রাথমিক গণিত।

এই বিভাগ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে মতদ্বৈত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। সমাজে সার্থক জীবন যাপন করিতে হইলে তিনটি বিষয়েই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা অপরিহার্য। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও এই তিনটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ; তবে কমিশন সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিতকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ না করিয়া একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ দুইটি ক্ষেত্রকেই পাঠ্যক্রমে পৃথক স্থান দিয়াছেন। বিজ্ঞান এবং গণিত ইহাদের উভয়েরই বর্তমান সামাজিক মূল্যের কথা চিন্তা করিলে এই ব্যবস্থা যে সমীচীন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

'গ' বিভাগ—একটি কুটির-শিল্প।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কুটির শিল্পের একটি তালিকা দিয়া তাহা হইতে যে কোন একটি সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে অভিজ্ঞতা দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয় পর্ষদের অনুমতি লইয়া অন্য যে কোন কুটির-শিল্পের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারে। যে সব ছাত্র যান্ত্রিক (Technical) বিষয় "বিশেষ বিষয়"রূপে পাঠ করিবে তাহাদিগকে Workshop practiceকে বাধ্যতামূলক কুটির-শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ৯টি কুটির-শিল্পের নাম করিয়াছিলেন ; পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ তাহাদের সহিত আরও ৩টি নূতন শিল্পের নাম যোগ করিয়া ১২টি কুটির শিল্পের নামের তালিকা প্রচার করিয়াছেন ; নূতন শিল্পগুলির নাম হইতেছে Printing, Technology ও Radio.

উপরোক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রগুলিকে "কোর" (Core) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকেই বাধ্যতামূলকভাবে উপরের ক্ষেত্রগুলির অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "ক" ও "গ" বিভাগে ছাত্রেরা মোটামুটি এক ধরণে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিলে ও ছাত্রে ছাত্রে পার্থক্য এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে পার্থক্য হিসাবে ছাত্রদের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাছিয়া লওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। পাঠ্যক্রম রচনার নীতি অনুসারে ইহা বাঞ্ছনীয়।

'ঘ' বিভাগ

নিম্নলিখিত বিভাগের যে কোন একটি হইতে তিনটি বিষয় বাছিয়া লইতে হইবে—

(1) Humanities ; (2) Science ; (3) Technical ; (4) Commerce ; (5) Agriculture ; (6) Fine Arts ; (7) Home Science.

উপরোক্ত সাতটি বিভাগ সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিবার সময় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ প্রায় প্রতি বিভাগেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের তালিকার সহিত ২।৩টি করিয়া বিষয় যোগ করিয়াছেন।

উপরোক্ত সাতটি বিভাগ হইল পাঠ্যক্রমের Perephery ; ছাত্রেরা তাহাদের ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে একটি বিভাগ নিজের বিশেষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইবে। ইহা তাহার "সাধারণ শিক্ষার" ক্ষেত্র না হইয়া বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্র। শিক্ষার উচ্চতর স্তরে ছাত্র এই বিশেষ বিভাগেই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবে—তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তিও হইবে তাহার ঐ শিক্ষার অনুকূল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনায় শিক্ষাপর্ষদ পাঠ্যক্রম রচনার সব কয়টি মূল নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু গলদ হইয়াছে সেখানে যেখানে পর্ষদ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রগুলির পৃথক পৃথক পাঠ্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। আলাদা আলাদা পাঠ্যক্রম রচনাকালে পর্ষদ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা দানের লক্ষ্য স্থির করিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পাঠ্যক্রম রচনাকারীরা বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার দরুণ তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদার কথা স্মরণ করিয়াই পাঠ্যক্রম রচনা ঝরিয়াছেন। বস্তুত পক্ষে আমাদের "ইণ্টারমিডিয়েট" ক্লাসগুলিতে যে ধরণের পাঠ্যক্রম ছিল ঐ ধরণের পাঠ্যক্রমই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চালু হইতে চলিয়াছে। ঐ ধরণের পাঠ্যক্রম পুস্তক-কেন্দ্রিক এবং অবাস্তব। ফলে এত করিয়াও প্রধানতঃ পাঠ্যক্রম রচনার ত্রুটির জন্য আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

অনুবন্ধ পদ্ধতি—এককালে পাঠ্যক্রমসম্বন্ধীয় আলোচনায় অনুবন্ধ পদ্ধতির বিশেষ স্থান ছিল। বিষয় এবং পাঠকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনা করার রীতির

আলোচনা করিয়া ইহা যে মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে অবৈজ্ঞানিক একথা আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ছাত্র নিজ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই শিক্ষা গ্রহণ করে; অভিজ্ঞতা যত প্রত্যক্ষ হয় তাহার শিক্ষাও তত ভাল হয়। কোন "বিষয়ের" উপর পুস্তক পাঠ ছাত্রের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; ইহার ফলে আশানুরূপ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নহে। ছাত্রের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে বিষয়ের গণ্ডী রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না। ঐ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত অনুবন্ধ পদ্ধতি (Correlation) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতি। যে সব "বিষয়ের" মধ্যে বিষয়বস্তু এবং জ্ঞানলাভ পদ্ধতির (Methods for reaching the truth) দিক হইলে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা দানকালে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টাকেই অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া বলে। ধরা যাউক, ইতিহাসে যখন পৃথ্বীরাজের পরাজয় এবং ভারতে মুসলমান সাম্রাজর স্থাপনের বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইতেছে তখন ছাত্রদিগকে "পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা" নামক কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিতে দিলে ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের সংযোগ সাধিত হইল। আবার যখন ভূগোলে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত রেলষ্টেশনগুলির আলোচনা হইতেছে তখন সাহিত্যে হয়ত ছাত্রদিগকে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত রেলভ্রমণ সম্বন্ধে রচনা লিখিতে বলা হইল। অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকালে পাঠ্যক্রমের বিষয় বিভাগ যেমন আছে তেমনি রক্ষা করা হয়। শুদ্ধ মাত্র অভিজ্ঞতার দিক হইতে দুই বিষয়ের মধ্যে যেখানে সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা শিক্ষার্থীর সামনে তুলিয়া ধরা হয়। এই কার্য দুই ভাগে করা যাইতে পারে—শিক্ষক নিজ বিষয় পড়াইবার সময় সুযোগমত অপরাপর বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন (পূর্বে প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য)।

মনে রাখিতে হইবে যে, অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক হয় না—উহা পাঠকেন্দ্রিকই থাকিয়া যায়। ঐ পদ্ধতিতে এক বিষয়ের পাঠের সঙ্গে সাদৃশ বিষয়ের পাঠের সংযোগ স্থাপন করা হয় মাত্র। এই সংযোগও এত হঠাৎ ঘটে (casual) এবং উহা এত ভাসাভাসা এবং বাহ্যিক যে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে, শিক্ষণীয় বস্তু ছাত্রের নিকট অধিকতর বাস্তব বলিয়া মনে হয় না।

শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করাও অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আর একটি সমস্যা। অধিকন্তু প্রত্যেক শিক্ষক অন্ততঃ ৩।৪ মাসের জন্য পাঠ (lesson) পূর্ব হইতে পরিকল্পনা করিয়া না রাখিলে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কথা শিক্ষাতত্ত্বের পুস্তকেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে বিধিবদ্ধভাবে উহা প্রয়োগের চেষ্টা কোন দেশে করা হয় নাই। তারপর, উহা শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাসে একটি স্তর মাত্র; বর্তমানে কোন অগ্রসর দেশে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কথা আলোচিতও হয় না। অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা সফল হয় না বলিয়াই কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা আরম্ভ হয়।

কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতি—জিলার (Ziller), হার্বার্ট (Herbert) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা সমর্থন করেন। আধুনিক মতে ছাত্রের শিক্ষাকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিতে হইবে। সে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা করিলেও তাহার সকল শিক্ষাকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলে শিক্ষা তাহার নিকট অর্থপূর্ণ হইতে পারে না। তাই কেন্দ্রীকয়রণ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া অপরাপর বিষয়গুলিকে ঐ বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া পড়ান হয়। জিলারের মতে ইতিহাসে মানুষের সবরকম অভিজ্ঞতা স্থান পাইয়াছে—ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া অপরাপর বিষয়ের শিক্ষাদান চলিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি কেন্দ্রীয়করণ নীতির একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন একটি কুটিরশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অপরাপর বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সূতা কাটিতে কাটিতে তুলার চাষের কথা উঠিয়া পড়িল (ভূগোল) বা কর্তিত সূতার হিসাব রাখিবার জন্য অঙ্ক কষার প্রয়োজন হইল। এইভাবে বয়নশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ভূগোল, গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই শিক্ষাদানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, একটি বিষয়ের সাহায্যে কোন শ্রেণীর সকল পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করিলে শিক্ষাদান অনেকটা কৃত্রিম হইয়া পড়ে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিধিবদ্ধভাবে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানই বাস্তবে সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয়করণ প্রণালীতে শিক্ষাদান আরও কঠিন। কেন্দ্রীয়করণ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে, কোন বিষয়কে কেন্দ্র না করিয়া, কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিলে শিক্ষাদান সহজতর হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ঐ চেষ্টাই করা হইয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতা দেওয়া চলে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ে গ্রহণীয় সব

রকমের অভিজ্ঞতা যে-কোন একটি অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তাই কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতির শিক্ষা অপেক্ষা "প্রজেক্ট পদ্ধতিতে" (Project Method) শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষানীতি অধিকতর সমর্থন করে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়।

কাহাকেও কেন্দ্র রাখিয়া যদি শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে হয় তবে কোন বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রে না রাখিয়া সমগ্র শিশুকেই শিক্ষাদানের কেন্দ্র বলিয়া ধরিতে হয়—তাহার জীবনের চাহিদা অনুসারেই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হয়। শিশু-জীবনের প্রত্যেকটি চাহিদা কতকগুলি গ্রহণীয় অভিজ্ঞতার কেন্দ্র; আবার শিশু একটি সমগ্র ব্যক্তি বলিয়া (Whole personality) তাহার চাহিদাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। চাহিদাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকার দরুণ গ্রহণীয় অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবেই জন্মাইয়া থাকে। চাহিদাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনা করাই আধুনিকতম রীতি।

বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশকারক পাঠ্যক্রম (Vocational and Liberal Curriculum)—আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁহারা কোন বৃত্তির (Vocation) জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। আবার এমন অনেক শিক্ষবিদ্‌ও আছেন যাঁহারা ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করেন। পাঠ্যক্রম রচনাকালে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোম সর্বত্রই পাঠ্যক্রম ছিল বিশেষ-ভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকারী। ছাত্রদিগকে এমন সব বিষয় পাঠ করিতে হইত এবং এমন সব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইত যাহাতে বিশেষভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং চরিত্র গঠিত হয়। বর্তমান যুগে শিক্ষা সর্বজনীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাজ-জীবনে বৃত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক অনুভূত হওয়ার দরুণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বর্তমান সমাজে বৃত্তিগুলিও অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রস্তুত না হইলে একটু উন্নততর বৃত্তিগুলির জন্য কাহারও যোগ্যতা জন্মায় না। তাই মাধ্যমিক স্তর হইতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরে

সম্পূর্ণরূপে বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অধুনা স্থাপিত বহুমুখী (Multilateral) বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য যদিও "সাধারণ শিক্ষাদান" (General Education) তথাপি উহারা ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করে। বহুমুখী বিদ্যালয়ের "বিশেষ পাঠ্য" সাতটি বিষয়ের সব কয়টিই ছাত্রকে বৃত্তি অভিমুখী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে ইহা কেহই অস্বীকার করেন না।

এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার দরুণ পাঠ্যক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় দিন দিনই অধিকতর অবাস্তব বোধ হইতেছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সহিত বর্তমান যুগের বৃত্তিগুলির নিকটতর সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার পাঠের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইতেছে। যতশীঘ্র সম্ভব সাধারণ বিষয়গুলির পাঠ শেষ করিয়া বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির পাঠ আরম্ভ করিতে সর্বত্র চেষ্টা চলিতেছে।

সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুতকরণ যে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য একথা আমরা অস্বীকার করি না। সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিলে, সর্বাগ্রে নিজেকে কোন বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাও সত্য। শিক্ষিত বেকারগণ সমাজজীবনে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেন সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। আমাদের দেশের সকল স্তরের পাঠ্যক্রমই যে কিছুটা বৃত্তি অভিমুখী হইবে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

অপরদিকে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃত্তি শিক্ষাদান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা আমরা অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষ প্রস্তুত করিতে চাহি না। মানুষের জীবনের সুখ, তৃপ্তি, সার্থকতা শুধু অর্থোপার্জনের উপর নির্ভর করে না। কেবলমাত্র জাতীয় সম্পদ (National wealth) বৃদ্ধি করিতে পারিলেই জাতি উন্নতির চরম সীমায় পৌছিবে এমন কোন কথা নাই। পরন্তু অর্থোপার্জন ব্যক্তি বা সমাজজীবনের পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্র—উহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র, মূল উদ্দেশ্য নহে। আত্মোন্নতি, শান্তি, তৃপ্তিই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত কাম্য ; সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশই সামাজিক উন্নতির প্রকৃত নিদর্শন। প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়াও মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি যদি জাগ্রত না হয়, তাহার চারিত্রিক গুণাবলী যদি বিকশিত না হয়, পরিবার এবং সমাজজীবনে সে যদি নিজের সহিত অপরের সম্বন্ধ মাধুর্যময় করিয়া তুলিতে না পারে তাহা হইলে তাহার জীবনে শান্তি, তৃপ্তি থাকিতে পারে না একথা

বলাই বাহুল্য। অর্থোপার্জন মানুষের সমাজজীবনের অনেকগুলি কর্মের মধ্যে একটিমাত্র ; শুধু অর্থোপার্জনের দ্বারাই সে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিতে পারে না—কেবলমাত্র অর্থোপার্জন করিতে পারিলেই সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্যের শেষ হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অনেক পূর্ব হইতেই পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে এবং ইহার ফল ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও পক্ষে শুভ হয় নাই। মানুষ গড়িয়া তোলাই যে শিক্ষার সর্বপ্রধান কাজ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কতখানি স্থান পাইতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখার চেষ্টা করা হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমে সরাসরি বৃত্তি শিক্ষাদানের কোন স্থান থাকিতে পারে না। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি-শিক্ষা করিবার জন্য শারীরিক বা মানসিক যোগ্যতা জন্মায় না। প্রাথমিক শিক্ষার পর যেসব ছাত্র সরাসরি সমাজজীবনে প্রবেশ করে তাহারা কোন জটিল বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা যে ধরণের বৃত্তি গ্রহণ করে শিক্ষানবিসীর দ্বারাই তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া চলে। তাই বৃত্তি শিক্ষাদান এমন কি, ভবিষ্যৎ বৃত্তির গোড়াপত্তন করাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা করার লক্ষ্য হইতে পারে না। ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাহাদিগকে কোন "বিশেষ বিষয়" (বৃত্তিমূলক বিষয়) শিক্ষাদানের চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। সর্বপ্রথমে শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রদিগকে ব্যক্তিত্ববিকাশের পথে অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, তাহাদের চরিত্রের ভিত্তি গঠন করিয়া দিতে হইবে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত নিম্নতম যোগ্যতা অর্জন করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সংক্ষেপে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন স্থান নাই। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্প শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয় তাহা বৃত্তিশিক্ষা নহে। এখানে শিল্প শিক্ষার মাধ্যম মাত্র। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা দানের চেষ্টা করা হয়।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু মাধ্যমিক

(বা উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষাস্তরে ছাত্রের ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতে হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে (মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের কাল) নিজেদের ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের বিশেষ করিয়া ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠা বোধ করে। এই বয়সে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তাই ছাত্রের শিক্ষা বৃত্তি-অভিমুখী করিবার নিমিত্তই আমাদের বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে "বিশেষ বিষয়"গুলি পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নহে। ছাত্রদের ব্যক্তিত্ববিকাশই বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তাই "কোর" (Core) বিষয়গুলির উপর পাঠ্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "পেরিফেরি" (Perephery)র অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির (বিশেষ বিষয়) পাঠ্যক্রমও এমন নহে যাহাতে কোন বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা জন্মায়; ঐসব বিষয় "পাঠ" দ্বারা কতকগুলি বিশেষ ধরণের বৃত্তির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ জন্মানোই পাঠ্যক্রম রচনার লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে ছাত্র বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিল্পকে (Technical) বিশেষ বিষয়রূপে পাঠ করিতেছে সে ইঞ্জিনিয়ার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছে না; বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তি আছে তাহাদের কোনটির জন্য ভবিষ্যতে সে হয়ত প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিবে ইহাই মাত্র আশা করা যাইতেছে। এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে সে যদি কোন ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তিই না গ্রহণ করিতে চায় তবে সে অন্য কোন ধরণের বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিতে পারে।

সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয়ও আমাদের মাধ্যমিক স্তরে আছে (Polytechnique, Junior Technical College etc.)। কিন্তু ঐসব বিদ্যালয়ও আত্মোন্নতিমূলক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না—প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগকে বৃত্তি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতিমূলক বিষয়গুলির (ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি) শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। এমন কি ছয় মাসের জন্য যেসব ট্রেড কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় ঐ গুলিতেও আত্মোন্নতিমূলক বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয় না।

অনুশীলনী

Q. 1. Discuss critically the principles that should operate in the choice of school studies (C. U., B. A. 1960, 1959 ; B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ৯৬-১০০)

Q. 2. Enumerate the main principles on which the curriculum should be based. What would be your suggestions for the reforms of the existing curriculum of our Ten Class Schools ? (C. U., B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৯৬-১০৩ ; ১০৬-১১১)

Q. 3. "A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two forces, the nature of the child and the requirements of the community." Give an outline of such a Curriculum.

(C. U., B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ৯০-৯৬ ; ১০৬-১১১)

Q. 4. What is Curriculum ? Supposing as Headmaster of a High School you are given absolute freedom to frame the curriculum of your school. How would you modify the existing curriculum ?

(C. U., B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৮৪-৯০ ; ১০০-১০৩ ; ১০৬-১১১)

Q. 5. What principles should you follow in framing curriculum of any stage of education. Examine the present secondary curriculum in West Bengal in the light of these principles. (C. U., B. T. 1956)

Ans. (পৃঃ৯৬-১০০ ; ১০৬-১১১)

Q. 6. What principles should be followed in drawing up curricula for a recognised Secondary School System of India ?

(C. U., B. T. 1950, 1954)

Ans. (পৃঃ ৯৬-১০০)

Q. 7. The prime and direct aim of instruction is to enable a man to know himself and the world. Keeping this view in mind, discuss what principles should govern the framing of a curriculum of studies for Secondary Schools. (C. U., B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ৯০-৯৬ ; ১০৬-১১১)

Q. 8. Write notes on :—

(a) Core-curriculum. (1959) (b) Correlation of studies. (1957)

Ans. (a) (পৃঃ ১০৫ ; ১১০) (b) (পৃঃ ৮৮-৯০)

Q. 9. Discuss the difference between subject-centric and child-centric curriculum.

Ans. (পৃঃ ৮৮-৯০ ; ৯৪-৯৬)

Q. 10. Discuss the place of General and Vocational Education in the curricula of Primary and Secondary Schools of the State.

Ans. (পৃঃ ১১৪-১১৭)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপদ্ধতি

যথোচিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষালাভ করাই মুখ্য—কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করা হইল ইহা গৌণ—আমরা অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। ধরা যাউক, ছাত্র "বিড়াল" সম্বন্ধে রচনা লিখিবে ইহাই আমার উদ্দেশ্য; এখন সে মুখস্থ করিয়াই রচনা লিখুক আর নিজের ভাষা এবং নিজের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যেই রচনা লিখুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। অনেক প্রাচীন শিক্ষক গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন—'মশাই, আপনাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির ধার ধারি না কিন্তু আমার ছাত্রেরা কখনও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করে না।' কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, কি শিখিলাম অপেক্ষা কিভাবে শিখিলাম তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। শিক্ষার সংক্রমণ (Transfer in learning) না হইলে শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হয় না। আমরা সকলেই জ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি। জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত যে, কাহারও পক্ষেই কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়—যদি একক্ষেত্র হইতে অপরক্ষেত্রেও জ্ঞানের সংক্রমণ না হয়। 'বিড়াল' সম্বন্ধে রচনা লেখার ফলে যে-কোন গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু সম্বন্ধে রচনা লেখা আমাদের কাছে সহজতর না হইলে ঐ রচনা লেখার অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। জ্ঞানের একটু উচ্চতর স্তরে উঠিলেই দেখা যায় যে, যেসব ছাত্রের শিক্ষালাভের পদ্ধতি শিক্ষার সংক্রমণে সাহায্য করে না তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ক্রমেই দুরূহ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যাহারা মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে স্কুল ফাইন্যাল মোটামুটি ভালভাবেই পাস করিয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর (মুখস্থ করাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে) দেখা যায় যে, তাহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, নিষ্ক্রিয় জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে না, কারণ পুস্তক হইতে শিক্ষার্থীর জীবনে ঐ জ্ঞানের সংক্রমণ হয় না। ধরা

যাউক, বিদ্যালয়ে ছাত্র অঙ্ক কষিতে শিখিল। কিন্তু বাড়ীতে সে মুদির দোকান হইতে ক্রীত জিনিসগুলির মূল্য কষিয়া দিতে পারিল না। আধুনিক কালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiments) করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার সংক্রমণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে শিক্ষার বিন্দুমাত্রও সংক্রমণ হয় না। অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করিলে শিক্ষার সংক্রমণ হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাদানকালে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি—প্রাচীন ভারতে পাঠ, আলোচনা, মনন এবং অভ্যাসকে শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হইত। ছাত্রকেই শিক্ষাকার্যে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইত। প্রাচীন গ্রীসেও পাঠ, আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ করিত। কিন্তু মানবতাবাদী এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদীদের প্রভাবে শিক্ষা যখন অর্থহীন হইয়া পড়িল তখন পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ শিক্ষালাভের উপায় বলিয়া গৃহীত হইল। ফরাসী দার্শনিক রুশোই প্রথম মানবতাবাদীদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় পুস্তক বা শিক্ষক উভয়েরই স্থান ছিল গৌণ। ছাত্র তাহার স্বাভাবিক প্রয়োজনে প্রকৃতির সংস্রবে আসিয়া নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিবে ইহাই ছিল রুশোর শিক্ষাপদ্ধতি। ছাত্রকে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তোলাই শিক্ষাদান প্রচেষ্টার মূল কথা। তাই রুশো "নেগেটিভ এডুকেশনের" (Negative Education) উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বিংশ শতাব্দীতে মন্তেসরী শিশুকে সর্বপ্রথম 'সেন্স ট্রেনিং' (Sense training) দিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইন্দ্রিয়গুলিই শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম—উহাদের সাহায্যেই শিশু পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা আহরণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। প্যাষ্টালজী এবং ফ্রবেলও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন। ফ্রবেল এবং মন্তেসরী তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ধরণের খেলা আবিষ্কার করেন এবং উহাদের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর স্থান শিক্ষকের পূর্বে। শিক্ষক তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে শিশুকে জ্ঞান দিতে পারেন না। শিশু তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে জ্ঞান লাভ করিবে—যে

কার্য সে ভালবাসে তাহাই করিবে, যাহা সে ভালবাসে না তাহা সে করিবে না। বাধ্যতামূলকভাবে তাহাকে কোন শিক্ষাদান প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। তারপর, যথাসম্ভব নিজের চেষ্টার দ্বারাই শিশু শিক্ষালাভ করিবে। শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানই শিক্ষাপদ্ধতির সারকথা বলিয়া প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করিয়া থাকেন।

আধুনিকতম কালে ডিউই সাহেব এই মত পোষণ করেন যে, কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারে না—শিক্ষার্থী কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে পারে। শিক্ষা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক এই কথাই ডিউই সাহেব তাঁহার বিভিন্ন শিক্ষাসম্বন্ধীয় রচনার সাহায্যে আমাদিগকে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি তাহাতেও একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক না হইয়া শিশুকেন্দ্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক শিক্ষা দিবেন এবং শিশু তাহা গ্রহণ করিবে এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিপ্রসূত। শিক্ষক শিশুকে অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সে গ্রহণ না করিলে তিনি তাঁহাকে কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না।

আধুনিকতম শিক্ষণতত্ত্ব (Theory of Learning) উপরি-উক্ত মত সমর্থন করে। থর্ণডাইক (Thorndike) কর্তৃক ব্যাখ্যাত শিক্ষণতত্ত্ব অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষণীয় বিষয় বারবার আবৃত্তি করাইয়া (Law of Repetition) এবং প্রয়োজনমত তাহাকে শাস্তি ও পুরস্কার দিয়া (Law of Effect) শিক্ষাদান করিতে হয়। কিন্তু আধুনিকতম শিক্ষণতত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষণসমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা দিয়াছে। আমাদের সকল শিক্ষাই চাহিদাকেন্দ্রিক—শিক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা মনে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ শিক্ষালাভই সম্ভব নহে। নিজের মনের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহার দ্বারাই সে শিক্ষালাভ করিবে। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ছাত্রেরই কার্য, শিক্ষক তাহার পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী মাত্র।

মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্যের (Individual difference) অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহাও শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করিবার নীতি সমর্থন করে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের দিক হইতে ছাত্রে ছাত্রে যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে।

নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহের অনুকূলে শিক্ষালাভের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষালাভের চাহিদা ছাত্রের মনে জাগরিত হইবে না এবং শিক্ষালাভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কাজেই সকল ছাত্রকে এক সঙ্গে এক রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। শ্রেণীকক্ষে আমাদের শিক্ষকগণ যেভাবে সকল ছাত্রকে এক বিষয়ে একসঙ্গে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। সংক্ষেপে শিক্ষাপদ্ধতি যে শিশুকেন্দ্রিক হইবে—এই বিষয়ে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন না—বাস্তবে এই নীতিকে কিভাবে রূপায়িত করা যায় ইহাই সমস্যা।

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা (Play way in Education)—শিক্ষাদানকে শিশুকেন্দ্রিক করিবার উদ্দেশ্যেই খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। সকলেই জানেন যে, খেলা শিশুর স্বাভাবিক কর্মের অন্যতম। সকল শিশুই খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুরা কি কারণে খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে এ সম্বন্ধেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জার্মান কবি ও শিক্ষাবিদ্ শিলার (Schiller) এবং পরে ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার (Spencer) প্রচার করেন যে, শিশুকালে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জীবন-সংগ্রামে ব্যয়িত হয় না। অতিরিক্ত শক্তি (Surplus Energy) নিষ্কাশনের চাহিদায়ই শিশু খেলাতে প্রবৃত্ত হয়। আমেরিকান্ মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্টান্‌লি হলের (Stanley Hall) মতে মানুষ যে সব বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে—মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তি (Recapitulation Theory) ঘটে। শিশুকে অসভ্য মানুষের স্তরে ফেলা চলে—কাজেই আদি মানব যেসব কার্যে ব্রতী ছিল শিশুও সেইসব কার্যে আগ্রহশীল হইবে। আদি মানবের কার্যগুলির অনুষ্ঠান বর্তমানে করিতে হইলে, তাহা খেলার মাধ্যমেই করা চলে; তাই শিশু খেলার দিকে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। সুইজারল্যাণ্ড নিবাসী কার্ল গ্রস্ শিশুদের ক্রীড়া-প্রবণতা সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রচার করেন—তাঁহার মতে খেলার মাধ্যমে শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাই ছোট মেয়ে পুতুল লইয়া ভবিষ্যৎ ঘর-সংসার-বিষয়ক খেলা খেলিতে ভালবাসে এবং ছোট ছেলে প্রতিযোগিতামূলক খেলা পছন্দ করে। গ্রস্ সাহেবের মতে মানুষের জীবন অন্যান্য প্রাণীর জীবন অপেক্ষা জটিলতর; উহার জন্য প্রস্তুত হইতে অধিকতর সময়ের প্রয়োজন—তাই মানুষের 'শিশুকাল' অন্যান্য প্রাণীর শিশুকাল অপেক্ষা

দীর্ঘতর। বিরেচনের তত্ত্ব (Theory of Catharsis) শিশুর ক্রীড়া-প্রবণতা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ—শিশু খেলার মাধ্যমে তাহার অবদমিত বাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে চায়। ধরা যাউক, পুতুল খেলায় মেয়ে হয়ত কোন পুতুলকে বাবা সাজাইয়া, তাহার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করিয়া বাবার প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাবের কিছুটা বিরেচন (Catharsis) করিতে পারে। মনোবীক্ষণকারীরা (Psycho-analysts) শিশুর খেলা হইতে তাহার অবচেতন মনকে (unconscious) জানিতে চেষ্টা করেন।

শিশুর খেলা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সবগুলি মতবাদই ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য না লইয়া প্রত্যেকটি মতবাদই নিজেকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোন মতবাদের যুক্তিই ত্রুটিহীন নহে। কারণ যাহাই হউক শিশুরা যে ক্রীড়াপ্রবণ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং শিশুর ক্রীড়া যদি এমনভাবে পরিকল্পনা করা যায় যে, তাহাদের মাধ্যমে শিক্ষালাভও ঘটে তাহা হইলে খুবই ভাল হয়।

কোন কোন শিক্ষাবিদ্ খেলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা শিক্ষাদানের অতি উত্তম মাধ্যম। প্রথমতঃ, খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। শিশু নিজ ইচ্ছায়ই খেলায় লিপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, খেলা সম্পূর্ণরূপে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। শিশু নিজেই ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে বয়স্কদের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক খেলারই (একক বা দলবদ্ধ খেলা) কতকগুলি নিয়ম বা অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা আছে; খেলায় শিশুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে খেলার নিয়মগুলি মানিয়া চলে। চতুর্থতঃ, খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম বলিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই খেলায় শিশুর আগ্রহ এবং একাগ্রতা জন্মায়—আগ্রহ এবং একাগ্রতা ব্যতীত শিক্ষালাভ সহজ নহে। পঞ্চমতঃ, খেলায় শিশু আত্মবিকাশের সুযোগ পায়—খেলা তাহার সৃজনপ্রবণতাকে সার্থক করিবার উত্তম মাধ্যম। সর্বশেষে খেলার পরিধি এত বিস্তৃত যে, যে-কোন প্রকারের অভিজ্ঞতা খেলার মাধ্যমে দেওয়া চলে। তাই শিক্ষাবিদ্‌গণ নানারূপ খেলা পরিকল্পনা করিয়া খেলাকে শিক্ষার প্রয়োজনে লাগাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ফ্রবেল তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ খেলা প্রবর্তন করেন। মন্তেসরী বিদ্যালয়েও শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ ধরণের খেলার ব্যবস্থা

আছে। বর্তমানে পাঠ্যক্রমের অনুসঙ্গ-কর্ম (Co-curricular activities) বলিয়া যে সব কর্মের ব্যবস্থা করা হয় তাহাদের অনেককেই খেলাভিত্তিক কর্ম (Play activity) বলা যাইতে পারে (Debate, Excursion etc.)। শিক্ষামূলক অনেক খেলা বর্তমানে বাজারেও বিক্রয় হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত—"জিজ্ঞাসা"—কতকগুলি প্রশ্ন এবং তাহাদের পার্শ্বে উত্তর লেখা থাকিল ; ইলেকট্রিক্ সুইস টিপিলে নির্দিষ্ট রঙ-এর বাল্ব জ্বলিয়া প্রশ্নের উত্তরটি শিশুকে দেখাইয়া দিবে ; শব্দ প্রস্তুত করা বা word-making খেলা ইত্যাদি)।

কিন্তু খেলাকে শিশু-জীবনের একটি বিশেষ কর্ম বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। শুধু শিশু নহে বয়ঃজ্যেষ্ঠেরাও খেলা করিয়া থাকেন। তারপর খেলা এবং কর্মের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। ডিউই খেলার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, খেলা জীবনের সক্রিয়তার (Theory of Life Activity) প্রকাশ করিয়া থাকে। জীবন অর্থ ই সক্রিয়তা, অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করিয়া থাকে। খেলাই শিশুর কর্ম। মনে রাখিতে হইবে যে, খেলা এবং কর্মের মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করিয়া থাকি তাহা কৃত্রিম। খেলা এবং কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে হয়। খেলার বেলা আমরা নিজেদের খুব বেশী পরিশ্রমে লিপ্ত করি না এ ধারণা ভ্রান্ত। অনেক সময় খেলায় আমরা নিজেদের যতখানি পরিশ্রমে লিপ্ত করিয়া থাকি, কাজের বেলা ততখানি করি না। কাজের বেলা নিজেকে যতখানি নিয়মানুবর্তী করিতে হয় খেলার বেলায়ও তাহার চাইতে কম করিলে চলে না। কর্ম এবং খেলার মধ্যে একমাত্র প্রভেদ এই যে, মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে সঞ্জাত আনন্দের নিমিত্ত খেলায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কর্মের বেলা বাহ্যিক (external) কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে সে কর্মে ব্রতী হয়। একই কর্ম উদ্দেশ্যের পার্থক্যে 'খেলা' বা 'কর্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধরা যাউক, শুদ্ধমাত্র আনন্দের জন্য যখন পথের পাঁচালী পড়িতেছি তখন তাহা খেলা এবং পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে যখন ঐ বই পড়িতেছি তখন তাহা কর্ম। আবার আজ যাহা খেলা, কাল তাহা হয়ত কর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ফুটবল খেলোয়াড় যখন পেশাদার (Professional) হইয়া পড়ে তখন খেলা তাহার নিকট কর্মে পরিণত হয়। সংক্ষেপে "খেলা" শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে

হয় যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মনের আনন্দে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার নামই খেলা। ঐ কর্ম সমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত "খেলার" অনুরূপ না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করিতে হইবে এই কথার অর্থ এই নহে যে, বিদ্যালয়ে শিশু অধিকাংশ সময় খেলা করিয়া কাটাইবে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হয় না—কোনও না কোনরূপ শাসন বা পুরস্কারের প্রলোভন না দেখাইলে তাহারা শিক্ষা করিতে চায় না। এই অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্তই খেলাভিত্তিক শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শিশুকে এমন কার্যের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে যে কার্য তাহার নিকট অপ্রীতিকর নহে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কর্মের সহিত শিশু-জীবনের প্রত্যক্ষ চাহিদার সম্বন্ধ থাকিলে বিদ্যালয়ের কাজ তাহার নিকট খেলার অনুরূপ মনে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যদি শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক হয় এবং শিক্ষদান-পদ্ধতি যদি কর্মকেন্দ্রিক হয় তাহা হইলেই বিদ্যালয়ের কাজ শিশুর নিকট অপ্রীতিকর মনে হইবে না। ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে—শিক্ষক নানাভাবে, নানা কৌশলে বিদ্যালয়ের কাজ শিশুর জীবনের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঐ সব কাজে তাহার স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। খেলাভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রসার প্রাথমিক স্তরের উপরের কোন শিক্ষাস্তরে কখনও হয় নাই; কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরেই প্রয়োগ করা চলে। বস্তুতপক্ষে বিদ্যালয় সমাজকে শিশু-জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে জীবন, তাহার চাহিদা এবং শিক্ষা এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িবে।

কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি—আধুনিক শিক্ষণতত্ত্ব (Theory of Learning) অনুসারে শিক্ষা একটি সমস্যামূলক কর্ম (Problem solving activity)। মানুষের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হইলে পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতায় সে ইহার সমাধান খুঁজিয়া থাকে। যখন সে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পায় তখন সে কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় এবং সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাহার শিক্ষালাভ ঘটে। সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার নামই শিক্ষা। শিক্ষাপদ্ধতিকে উপরি-উক্ত নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিলে ছাত্রের কর্মই হইবে শিক্ষার ভিত্তি। "শিক্ষাদান" শব্দটির উৎপত্তিই ভ্রান্ত ধারণা হইতে হইয়াছে।

কেহ কাহাকেও শিক্ষা "দান'' করিতে পারে না, নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে হয়। ছাত্র নিজের কর্মের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবে ইহাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষক কর্ম করিয়া যাইবেন (পাঠের ব্যাখ্যা) এবং ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকিয়া (পাঠের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া) শিক্ষালাভ করিবে এই প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। পুস্তকপাঠ এবং শিক্ষকের পাঠের ব্যাখ্যা শ্রবণের দ্বারা আশানুরূপ শিক্ষালাভ হইতে পারে না এই ধারণা জন্মানোর ফলে বর্তমানে পাঠ্যক্রম রচনাকালে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ছাত্রেরা কি কি ধরণের কর্মে লিপ্ত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার নিমিত্ত আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ কিল্ পেট্রিক 'প্রজেক্ট মেথড' (Project Method) নামে এক বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে কয়েকটি সমস্যামূলক কর্মে বিভক্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ সমস্যামূলক কর্মগুলির ছাত্রের জীবনের এক বা একাধিক চাহিদার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকিতে হইবে। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্রেরা নিজেদের মনে সমস্যাগুলি অনুভব করিয়া তাহাদের সমাধানের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কর্মে লিপ্ত হইবে। প্রজেক্ট মেথড অনুসারে শিক্ষাদানকালে ছাত্রদের সম্মুখে শিক্ষক সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন ; ছাত্রেরা আগ্রহসহকারে ঐ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবে বলিয়া স্থির করিলে পর, তবে ইহাকে বিদ্যালয়ের কর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের অনুভূতি জাগ্রতই থাকে। আবার (তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতার জন্য) কোন কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের অনুভূতি জাগ্রত না থাকিলেও উপযুক্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহা জাগ্রত করা সম্ভব হয়। আর একটি কথা, যে সমস্যা সমাধান করিতে ছাত্রেরা লিপ্ত হইবে বলিয়া স্থির করে তাহা এমন হওয়া চাই যে, তাহা সমাধানের চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহার ফলে তাহারা (নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ে) শিক্ষালাভ করিবে। প্রজেক্ট মেথডের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। একটি সমস্যামূলক কর্মকে অনেকগুলি ছোট ছোট সমস্যামূলক কর্মে বিভক্ত করা চলে এবং কয়েকটি ছাত্র একত্র হইয়া এক একটি সমস্যামূলক

কর্মে লিপ্ত হয়; পরে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ (Share the experience) করে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রজেক্ট মেথডের অর্থ বোঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। ধরা যাউক, শিক্ষকদের নেতৃত্বে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রেরা স্থির করিল যে, তাহারা মহাত্মা গান্ধীর জীবনের উপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করিবে। নাটক মঞ্চস্থ করা কর্মটির ছাত্রদের বর্তমান জীবনের চাহিদার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের মনের ভাবগুলির বিরেচন (Cathersis) হইবে; তাহারা বয়স্কদের অনুরূপ কর্মে স্বাধীনভাবে লিপ্ত হইতে পারিবে। তাহারা হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে; নানাভাবে তাহারা নিজেদের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি প্রকাশ করিতে পারিবে। কাজেই তাহারা নিজেরাই হয়ত ঐ নাটক মঞ্চস্থ করিবার প্রস্তাব করিল বা শিক্ষক ঐ প্রস্তাব করিবামাত্র সাগ্রহে নিজেদের সম্মতি জানাইল। তারপর এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রত্যেক ছাত্রই হয়ত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিল। এর পর হয়ত ছাত্রেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নাটকের জন্য এক একটি দৃশ্য রচনা করিবে এবং উহার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবে। এই নাটক মঞ্চস্থ করিবার পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে মঞ্চস্থ করা পর্যন্ত নানা ধরণের কাজে ব্যক্তিগত এবং দলবদ্ধ-ভাবে ছাত্রেরা লিপ্ত হইবে। গান্ধীজীর জীবন এবং কার্য সম্বন্ধে নানা পুস্তক-পত্রিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিয়া তাহারা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিবে। নাটকের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করিতে গিয়াও নানাবিধ বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং নানারূপ কৌশল আয়ত্ত হইবে; তারপর নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে গিয়া চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্পের নানারকম কাজ ইত্যাদি ছাত্রেরা শিক্ষা করিবে। মোটকথা এক একটি প্রোজেক্ট শেষ হইলে দেখা যাইবে, ছাত্রগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

প্রজেক্ট মেথডকে ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা বলা যাইতে পারে, কারণ ক্রীড়ার যতগুলি গুণের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে প্রজেক্টে তাহার সব কয়টিই আছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষাই প্রজেক্ট মেথড অনুসারে হইবে, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র

প্রজেক্ট মেথডের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষালাভ সম্ভব নহে। উচ্চতর স্তরে শিক্ষা অধিকতর তত্ত্বমূলক হইয়া পড়ে। প্রজেক্টে কর্মের প্রাধান্যের জন্য তত্ত্বমূলক পাঠ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়; ফলে ইহা অনেক সময় তত্ত্বমূলক শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। সে যাহা হউক প্রজেক্টের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের কৌতূহল একবার জাগরিত হইলে উহা ছাত্রদের বাস্তব চাহিদার অন্যতম হইয়া পড়ে। ঐ চাহিদার নিবৃত্তির জন্যও অনেক সময় ছাত্রেরা সমস্যামূলক কর্মে (পাঠ, আলোচনা, লেখা) ইত্যাদি লিপ্ত হইতে পারে।

দলবদ্ধভাবে শিক্ষার পদ্ধতি (Group Method or Workshop Method)—উচ্চতর শ্রেণীতে প্রজেক্ট মেথড (Project Method) এবং ওয়ার্কশপ মেথড (Workshop Method) বা দলবদ্ধভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি (Group Method), উভয়ের সাহায্যেই ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে কোন তত্ত্বমূলক সমস্যার সমাধানকে ছাত্রেরা প্রজেক্টরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে (ধরা যাউক, ভারত কি করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিল তাহার কারণ নির্ণয়ন)। তারপর প্রজেক্টটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া ছাত্রদের এক এক দল এক একটি ভাগের সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রজেক্ট নির্ণয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করা পর্যন্ত যেসব কর্মপন্থা বা নীতি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ওয়ার্কশপ মেথডে তাহাদের সবগুলিই অনুসৃত হয়। কিন্তু ওয়ার্কশপ পদ্ধতির কর্মগুলির অধিকাংশই হয় পাঠ, আলোচনা, রচনা (নিজেদের যুক্তি এবং মীমাংসা ভাষায় প্রকাশ করা) ইত্যাদি ধরণের। তত্ত্বমূলক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতে হইলে ওয়ার্কশপ পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। অবশ্য ওয়ার্কশপ মেথড প্রজেক্ট মেথডের মত ততটা আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে না এবং উহাদের অভিজ্ঞতাগুলির বেশীর ভাগই অপ্রত্যক্ষ (পুস্তককেন্দ্রিক) বলিয়া শিক্ষালাভে উহারা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী হয়। প্রজেক্ট এবং ওয়ার্কশপ মেথড উভয়কেই শিক্ষাকার্যে ব্যবহার করিলে যে কোন ধরণের পাঠ্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা চলে। অগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষাকার্য উপরোক্ত পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

শিক্ষালাভ কার্যে সৃজনাত্মক কর্মের স্থান—আমাদের দেশে অধুনা প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সৃজনাত্মক কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সৃজনীশক্তিই সৃষ্টির নিয়ামক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী

শক্তি রহিয়াছে—সীমা হইতে অসীমে যাওয়ার বাসনা মানুষের জন্মগত চাহিদা। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিশু বিশেষভাবে কল্পনাপ্রবণ থাকে—কল্পনার সাহায্যেই সে তাহার জীবনের অনেক চাহিদার নিবৃত্তি করিয়া থাকে—সুযোগ পাইলেই সে কল্পনাপ্রবণ-খেলায় (Make-believe play) লিপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে খেলা, অভিনয়, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, গল্প লেখা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে শিশুর এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সৃজনাত্মক কর্মের স্থান অসীম। সৃজনাত্মক কর্মের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষালাভের কার্যে ব্যবহার করা চলে—

১। সৃজনাত্মক কর্ম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের অন্যতম।

২। সৃজনাত্মক কর্ম মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে—চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি সকল স্তরের অভিজ্ঞতাই সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

৩। আত্মার মুক্তি (Liberation of Soul) সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে আত্মোন্নতিমূলক।

তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে সৃজনাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হইবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়—প্রজেক্টগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা হয় যাহাতে তাহাদের মাধ্যমে ছাত্রেরা সৃজনাত্মক কর্মে লিপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ছাত্রদের সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এমনভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করা হয় এবং এই পরিবেশ রচনা করায় অংশ গ্রহণের সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হয় (বিদ্যালয়ের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন, ফুলের বাগান রচনা ইত্যাদি)। সৃজনাত্মক কর্মে সফলতা অর্জন করিতে হইলে সর্বপ্রথম শিশুকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিতে হইবে—বাধা-নিষেধের মধ্যে সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। শিক্ষক কেবলমাত্র কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন—শিশু নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় কর্মে অগ্রসর হইবে এবং তাহাকে রূপদান করিবে। একজন বড় শিল্পী লিখিয়াছেন—শিক্ষক শিশুর কল্পনাশক্তির ঢাক্না মাত্র খুলিয়া দিবেন, শিশু স্বাধীনভাবে কর্মে অগ্রসর হইবে, ফলে তাহার সৃষ্টি হইবে অপূর্ব।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এক হিসাবে সকল সমস্যামূলক কর্মই সৃজনাত্মক কর্ম। যেখানেই সমস্যা, সেখানেই পুরাতন হইতে নূতনে যাওয়ার প্রশ্ন—

সেখানেই মানুষের কল্পনা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি প্রয়োগের প্রয়োজন। তাই আলাদাভাবে সৃজনাত্মক শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া (কর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র) কোন শিক্ষাপদ্ধতির নামকরণের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে শিশুশিক্ষার জন্য রচিত পাঠ্যক্রমে যে সৃজনাত্মক অভিজ্ঞতার স্থান বিশেষভাবে থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষ করিয়া কর্মভিত্তিক শিক্ষা। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক গঠন করার উপযুক্ত নহে তাহা সর্বজনস্বীকৃত। মহাত্মা গান্ধী যেমন আজীবন দেশকে স্বাধীন করিবার আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন তেমনি তিনি স্বাধীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং কি ধরণের শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমাজ-ব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক প্রস্তুত করা যাইবে সে বিষয়েও চিন্তা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর মধ্যে ভাববাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ জীবনদর্শনের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি স্বাধীন ভারতের জন্য এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজন মিটিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে—সাংস্কৃতিক এবং অধ্যাত্ম-জীবন যাপনই হইবে মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য। ঐরূপ সমাজ-ব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিবার জন্যই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে দূর করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন—

১। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য নাই। পরীক্ষায় পাস এবং অভিজ্ঞান লাভ ব্যতীত উহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। ফলে, উহা সম্পূর্ণরূপে পুস্তককেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত ব্যক্তিজীবন বা সমাজ-জীবনের কোন সম্বন্ধই নাই। বাস্তবজীবনের সহিত শিক্ষা সম্বন্ধহীন হওয়ার দরুণ আমাদের দেশে দিন দিনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। আমাদের বর্তমান শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা হাতে-কলমে কাজ করাকে ঘৃণা করেন—শারীরিক পরিশ্রম করাকে তাঁহারা অসম্মানজনক বলিয়া মনে করেন। ফলে, লেখাপড়া শিখিলে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া "বাবু" হইতে চান। ফলে, একদিকে যেমন বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে,

অপর দিকে গ্রামগুলির তেমনি দ্রুত অবনতি হইতেছে। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যেও গুরুতর ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে।

৩। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। অর্থাভাবে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারার দরুণ আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে আজ পর্যন্ত সার্বজনীন করিতে পারি নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলি স্বাবলম্বী (Self-sufficient) নয় বলিয়াই এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক বা দেশসেবক গড়িয়া তোলার দিকে আমাদের শিক্ষা কখনও দৃষ্টি দেয় নাই। স্বাধীন ভারতের "নয়া সমাজে" বাসের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ছাত্রদের মধ্যে নূতন চারিত্রিক গুণাবলী, নূতন অভ্যাস ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

বিশেষ করিয়া শিক্ষার উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিবার নিমিত্তই মহাত্মা গান্ধী "নই তালিম" এর পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২।২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারী শিক্ষা সম্মেলনে ভাষণদানকালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা সর্বপ্রথম দেশের কাছে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার মতে আমাদের নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরিলিখিত ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবে।

১। সমাজ-জীবনের প্রধান তিনটি চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান) নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত করাই হইবে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিক স্তর হইতেই শিক্ষাকে কতকটা বৃত্তিমূলক করিয়া তুলিতে হইবে। কৃষি, ছুতারের কাজ এবং বয়ন, বিদ্যালয়ে কুটিরশিল্প হিসাবে শিক্ষা করা প্রয়োজন। ইহার ফলে শিক্ষা শেষে ছাত্রেরা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি সংগ্রহের ব্যাপারে এত অসহায় বোধ করিবে না।

২। সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামের এবং সহরের বিদ্যালয় এক ধরণের হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এমন কি গ্রামে গ্রামে পরিবেশের বিভিন্নতা হিসাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাও বিভিন্ন হইতে পারে ; যে সমাজের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে তাহার প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়াই শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে।

৩। শিক্ষাপদ্ধতি পাঠভিত্তিক না হইয়া কর্মভিত্তিক হইবে। শুধু তাহাই

নহে, কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পাঠ্যক্রম রচিত হইবে। প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই কোনও না কোন কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমগ্র পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে। এই শিল্পশিক্ষা করিতে করিতেই ছাত্র শিক্ষণীয় বিষয়গুলি (সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। প্রধানতঃ কর্মের ভিতর দিয়াই শিক্ষা অগ্রসর হইবে—মানসিক এবং কায়িক পরিশ্রম একসঙ্গে চলিবে; মন এবং শরীর একসঙ্গে গড়িয়া উঠিবে। ফলে, বিদ্যালয় এবং সমাজের কার্যের মধ্যে ব্যবধান কমিবে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদও এখনকার মত এত অধিক হইবে না।

৪। ৭ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হইবে। অন্ততঃ প্রথম স্তরে শিক্ষা সার্বজনীন করিতে না পারিলে নয়া সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে সকলেরই প্রথম স্তরের শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন; ইহার পরের স্তরের শিক্ষা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে হইবে।

৫। শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়কে যথাসম্ভব সাবলম্বী করিতে হইবে। উৎপাদনাত্মক শিল্পের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ব্যয় অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্বাহ না হইলে আমাদের মত দরিদ্র দেশে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে। শিল্পের সাহায্যে কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিলে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৬। সমগ্র শিক্ষা মাতৃভাষায় দিতে হইবে।

৭। অহিংসা ও ত্যাগের আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার অনুকূল অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ে দিতে হইবে।

উপরোক্ত নীতিগুলিকে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিবার নিমিত্ত ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Basic Schools) নাম দিয়া নূতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত সুপারিশ করেন। তারপর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) এই বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য

একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করেন। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে ঐ কমিটি সন্দেহ প্রকাশ করেন—ইহার মতে উৎপাদনাত্মক শিল্পের বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইবে, এই নীতি সমর্থনযোগ্য নহে। (জাকির হোসেন কমিটিও এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন)। যাহা হউক, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর সকল রাষ্ট্রেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকার প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিম্ন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী এই দুই স্তরে বিভক্ত করা হইতেছে। ৭ বৎসর বয়স হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদিগকে **নিম্ন বুনিয়াদী** বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ১২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহারা **উচ্চ বুনিয়াদী** বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলা যাইতে পারে। কোন রাষ্ট্রেই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এখনও ব্যাপক ভাবে স্থাপিত হয় নাই ; সকল রাষ্ট্রই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ব্যাপকভাবে স্থাপন করিলেও কোন রাষ্ট্রেই তাহাদের সংখ্যা এখনও খুব বেশী নহে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সমালোচনা—বুনিয়াদী শিক্ষা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ইহার কারণ এই যে, অনেক শিক্ষাবিদ্ ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি যে, প্রাথমিক স্তরে দুই ধরণের বিদ্যালয় থাকা অগণতান্ত্রিক ; ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার গণতান্ত্রিক নীতি ব্যাহত হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মনস্থির করিবার সময় আসিয়াছে।

স্বপক্ষে যুক্তি—১। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে সব দোষ-ত্রুটির প্রতি মহাত্মাজী (পূর্বে আলোচিত) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হইলে এই সব দোষ-ত্রুটি অনেকাংশে যে সংশোধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মোটামুটি

ভাবে, বুনিয়াদী শিক্ষা যে আমাদের শিক্ষা-সংস্কার সমস্যাকে ঠিক পথে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে ইহা অনস্বীকার্য।

২। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। সমাজ-জীবন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিশুর সৃজনীশক্তির বিকাশের চেষ্টাও উহাতে উপেক্ষিত হয় নাই। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যেও বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিশেষ সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

৩। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক। পুস্তকপাঠ অপেক্ষা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে উহা শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা নিষ্ক্রিয় না হইয়া সক্রিয় হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই বিদ্যালয় হইতে এই জ্ঞানের সংক্রমণ বাস্তব জীবনে হইয়া থাকে। তারপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষা কোন কুটিরশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া প্রদান করা হয়। ইহার ফলে লব্ধজ্ঞান সংহত হয়—জ্ঞান এবং জীবনের মধ্যে একটি সামগ্রিকতার সৃষ্টি হয়।

৪। তারপর, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়—উহা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শে "নয়া সমাজ" গঠন করিতে হইলে, বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যেই উহা গঠন করা সম্ভব। একদিকে বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন আমাদের চিরদিনের আদৃত চারিত্রিক গুণাবলী (e.g. plane living and high thinking) ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত করিতে চেষ্টা করে, অপর দিকে আবার আধুনিক পৃথিবী এবং নয়া সমাজ ব্যবস্থার উপযুক্ত গুণাবলীও (e.g. Community feeling) তাহাদের চরিত্রে সৃষ্টি করিতে চায়।

৫। বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া থাকে—ছাত্রদের দেহ, মন, রুচিবোধ প্রভৃতি সব কিছুই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে পূর্ণতর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

৬। বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ এত নিকট যে স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা সমাজসেবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার 'অনেক দোষ-ত্রুটিগুলি বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যে সংশোধন করা চলিলেও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে উহা গ্রহণ করিবার পূর্বে উহার বিশেষ ত্রুটিগুলি সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে—

১। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, উহাতে শিশুমনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের প্রস্তুতির উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদা উপেক্ষিত হইয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান—যে তিনটি চাহিদা নিবৃত্তির নিমিত্ত বুনিয়াদী শিক্ষার আয়োজন—ঐ তিনটিই বয়স্কদের জীবনের চাহিদা, শিশুজীবনের নহে। কাজেই বয়স্কদের জীবনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকার কথা নহে। ধরা যাউক, বয়ন শিল্প শিক্ষাকালে বিভিন্ন "ডিজাইন" তোলার ভিতর দিয়া শিশুমনের সৃজনীশক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ধরণের কাপড় বোনা বা সূতা কাটা (বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাহা করা হয়) শিশুজীবনের কোন চাহিদা পূরণ করে না। ঐ সব কাজের একঘেঁয়েমি শিশুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে, শিল্প-শিক্ষার জন্য যে শারীরিক এবং মানসিক পরিণতি (maturity) প্রয়োজন ৭।৮ বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা যে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার কথা (ভবিষ্যৎ জীবনের নহে) ভাবিয়া শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। বর্তমান জীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বলি দিলে শিক্ষা লাভ ঘটে না।

২। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান নীতি হইতেছে শিশুকে উৎপাদনাত্মক কর্মে নিযুক্ত করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদনাত্মক এবং সৃজনাত্মক কর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে; সৃজনাত্মক কর্মের ভিতর দিয়া শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হইয়া থাকে, কিন্তু উৎপাদনাত্মক কর্ম সৃজনাত্মক না হইলে শিক্ষা ব্যাহত হইতে পারে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কোন কোন কাজ অনেকটা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়—নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সুযোগ না থাকিলে একঘেয়ে কাজ মনকে স্থবির করিয়া তোলে। শান্তি-নিকেতনের পাঠ ভবনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত শিল্প-শিক্ষা এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, গুরুদেব শিল্পের উৎপাদনাত্মক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব হইতেছে এই যে, উহা শিশুকে হাতে কলমে কাজ করিবার

সুযোগ দিবে এবং তাহার সৃজনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে। তাই পাঠভবনে শিক্ষার জন্য নির্বাচিত শিল্পের মধ্যে চারুশিল্পের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য শিল্প-নির্বাচন কালে উৎপাদনাত্মক শিল্পের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩। ইহার ফলে অনেক সময় বুনিয়াদী শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলিয়া ভুল করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিল্প শিক্ষার কোন স্বকীয় গুরুত্ব নাই। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্পকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। শিল্পশিক্ষাদান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে,—শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। বুনিয়াদী শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা করিয়া তুলিলে ঐ উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা কেন্দ্রীকরণ করার নীতিও সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নহে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষাদানের নিমিত্তই আমরা কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকি। শিক্ষার সাহায্যে আমরা সমগ্র মানুষকে গড়িয়া তুলিতে চাই। শিশু বিদ্যালয়ে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া তাহাকে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী করিবে ইহাই আমাদের কামনা। কিন্তু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে একমাত্র শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই তাহা সম্ভব—শিশুর জীবনের চাহিদাই থাকিবে বিদ্যালয়ের সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের চেষ্টা কৃত্রিম। অভিজ্ঞতা হইতেও দেখা যাইতেছে যে, গ্রহণীয় সকল অভিজ্ঞতা কোন এক বিশেষ শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে প্রদান করা সম্ভব হইতেছে না। যেখানেই এই চেষ্টা বিধিবদ্ধভাবে করা হইতেছে সেখানেই শিক্ষা কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন (বর্তমানে শিল্প এবং পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে)।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হইতেছে যে, মহাত্মাজী যে সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আর বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে চলিয়াছে তাহাতে আকাশ-পাতাল

পার্থক্য রহিয়াছে। মহাত্মাজীর স্বপ্ন ছিল যে, ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম-সমাজ স্থাপিত হইবে। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষকেই নিজের সমাজ-জীবনের প্রধান তিনটি চাহিদার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছুটা স্বাবলম্বী দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত বড় বড় কারখানা স্থাপন না করিয়া কুটিরশিল্পের উপর আমাদের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য নির্ভর করিব। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা বড় বড় কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছি—এই ব্যবস্থায় গ্রাম ত দূরের কথা, কোন রাষ্ট্রেরও (state) স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করা যায় না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের "নয়া সমাজে" অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। যে জীবন দর্শন (Plane living and high thinking) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হয়, যে সাবলম্বনের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয় পরিচালিত হয় বাস্তব জীবন হইতে ঐ জীবনদর্শন এবং ঐ নীতি দিন দিনই উঠিয়া যাইতেছে। কুটিরশিল্পের স্থানও আর সমাজে বড় নাই। এখনও গ্রামগুলি শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই বলিয়া গ্রামেই বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু গ্রামের জন্য এক ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সহরের জন্য অন্য ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি (Equality of Educational opportunities) ব্যাহত হইবে এবং ইহার ফলে গ্রাম এবং সহরের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাইবে। বুনিয়াদী শিক্ষার গুণ এবং উহার ত্রুটি উভয়দিক পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে চালু হইবার পূর্বে ইহার কিছুটা সংস্কার প্রয়োজন। সর্বপ্রথমই মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজসেবী এবং রাজনীতিকের প্রভাব শিক্ষার উপর থাকিবে বটে কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নাই তাঁহাদের হাতে শিক্ষা-সংস্কার ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। বুনিয়াদী শিক্ষার যেসব ত্রুটির কথা আলোচনা করিয়াছি মহাত্মাজীর গোঁড়া শিষ্যেরা তাহা আরও বৃদ্ধি করিতেছেন। যে সব রাষ্ট্র বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গোঁড়ামি অল্প (পশ্চিমবঙ্গ তাহার অন্যতম) যেখানে শিক্ষাবিদ্দের হাতে পড়িয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি স্বাভাবিক নিয়মেই সংশোধিত হইতেছে। মোটকথা, বুনিয়াদী শিক্ষা মোটামুটিভাবে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি; কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সহিত উহা

খাপ খাইতেছে না বলিয়া উহার সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। মহাত্মাজী জীবিত থাকিলে হয় তিনি দেশে শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বাধা দিতেন, আর না হয়ত বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কার করিতেন।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি—বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি এক বিশেষ ধরণের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির নিম্নলিখিত নীতিগুলি বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতেও অনুসরণ করা হয়।

১। ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা-দানের চেষ্টা করিতে হইবে ইহা নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

২। কোন একটি নির্দিষ্ট কর্মকে (Project) মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়।

৩। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষাদান প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম স্তর বলিয়া স্বীকার করা হয়।

৪। বিদ্যালয়ে সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা এবং ঐ সমাজে জীবন যাপন করার ভিতর দিয়া শিক্ষাগ্রহণ করাই যে শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না।

আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়—

১। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি একটিমাত্র নির্দিষ্ট শিল্পকে (কর্মকে) কেন্দ্র করিয়া সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতির মত অনেকগুলি কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় না।

২। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার কেন্দ্রস্থ কর্মটি (Project) উৎপাদনমূলক হইবে ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রজেক্ট মেথডের শিক্ষায় এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

৩। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর বর্তমান জীবনের চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—এই নীতি অনুসরণ করিয়া প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় বয়স্কদের জীবনের চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়) কথা বিবেচনা করিয়া প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়।

৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কায়িকশ্রমের উপর পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সংক্ষেপে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের একটি প্রয়াস মাত্র। দিন দিনই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কমিয়া আসিতেছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি—শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটির জন্যই যে আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা অনেক বেশী পরিশ্রম করিয়া অনেক কম শিক্ষা লাভ করে এবং তাহার কারণ হইতেছে বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন না করা। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন মনে করেন যে, শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার না হইলে পাঠ্যক্রমের সংস্কার কার্যকরী হইতে পারে না। বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম কার্যে পরিণত করিতে আমাদের শিক্ষকেরা অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেছেন; গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি অনু-সরণ করাই হইবে ইহার প্রধান কারণ। সকলেই "পড়াইয়া" পাঠ্যক্রম শেষ করিতে চান। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের মতে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, উহা বাক্‌সর্বস্ব। শিক্ষকগণ মনে করেন যে, শ্রেণীতে পাঠ্য-ক্রমের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিতে পারিলে এবং ছাত্রদিগকে পাঠ্যপুস্তক পড়াইতে পারিলেই বুঝি ছাত্রদের শিক্ষালাভ ঘটিল। কোন শিক্ষণতত্ত্বই (Theory of Learning) কিন্তু এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করে না। শিক্ষক এবং পুস্তক জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ছাত্রের কর্ণ এবং চক্ষু এই দুই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া শিক্ষা তাহার অন্তরে প্রবেশ করে, ইহার পশ্চাতে গতানুগতিকতা ব্যতীত কোন মনস্তাত্ত্বিক সত্য নাই। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন না করিলে সকল শিক্ষা সংস্কারই যে ব্যর্থ হইবে একথা মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির সার কথা হইতেছে এই যে, যান্ত্রিকভাবে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা চলে না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলিয়াছেন যে, শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান গুণ এই হইবে যে, উহা

পরিবর্তনশীল (Dynamic) শিক্ষার বিষয়বস্তু, ছাত্রদের মনের অবস্থা ইত্যাদির বিবেচনায় শিক্ষক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করিবেন। এমন কি একই শ্রেণীতে একই বিষয়ে পাঠদানকালে তিনি কখনও ছাত্রদিগকে পড়িতে বা লিখিতে বলিবেন, কখনও বা তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পাঠ-বিষয়ক কোন সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে, কখনও বা পাঠের অনুকূল অন্য নানাবিধ কর্মে লিপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই যে শিক্ষা-লাভ করিতে পারে একথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞতা যত প্রত্যক্ষ এবং স্বতঃপ্রণোদিত কর্মের ভিত্তিতে হইবে শিক্ষাকে তত ভাল হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করার নিমিত্ত কতকগুলি যান্ত্রিক সহায়ক বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে (সিনেমা ইত্যাদি)। উহাদিগকে শিক্ষাকার্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ কর্মকেন্দ্রিক হইবে। ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সমস্যামূলক কর্মে ছাত্রদিগকে লিপ্ত করাই শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন শিক্ষকদিগকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রজেক্ট মেথড এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৃতীয়তঃ, মনে রাখিতে হইবে যে, এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংক্রমণ হয়। এই প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন লিখিয়াছেন যে, ছাত্র অল্প জ্ঞান লাভ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যতখানি জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শিক্ষায় সংক্রমণ হয় না। তারপর জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া না দিতে পারিলেও শিক্ষায় সংক্রমণ হয় না। উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন নিম্নলিখিত অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

১। কর্মে আগ্রহ এবং আপন কর্ম সম্বন্ধে গৌরববোধ। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কাজই আগ্রহহীনভাবে করিতে করিতে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যথোচিত কর্মপ্রেরণা লুপ্ত হইয়াছে—পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির ভয় ব্যতীত তাহারা কোন কাজ করিতে চায় না—সকল কাজই যেন তাহাদের নিকট অর্থহীন

বোধ হয়। শুধু তাহাই নহে—নিজের কাজে তাহারা নিজেরাও গৌরববোধ করে না—কাজ করিতে হইবে বলিয়া যেন যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছে—কাজের ভালমন্দ যেন তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। যথাযথ শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে কর্ম সম্বন্ধে এই অবাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষা ছাত্রের আগ্রহভিত্তিক হইবে। শিক্ষার জন্য ছাত্র যেসব কর্মে লিপ্ত হইবে তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত তৃপ্তি এবং সার্থকতাবোধের সুযোগ থাকিবে। ২। শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। ভ্রান্ত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ইহাদের উভয়ই বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ছাত্রদিগকে সমস্যামূলক কার্যে লিপ্ত করিতে হইবে—তাহারা নিজেরা নিজেদের চেষ্টা দ্বারা শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিবে—শিক্ষক এবং পুস্তকের নিকট হইতে তাহারা প্রয়োজনবোধে সাহায্য গ্রহণ করিবে। ৩। ছাত্রদের আগ্রহের ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির নিমিত্ত ছাত্রদের মন হইতে অনুসন্ধিৎসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাধ্যতামূলকভাবে জানাইয়া না দিলে, কেহ যেন কিছু জানিতেই চাহে না। এই অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্ত জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে হইবে—জ্ঞানলাভ পদ্ধতি তাহাদের নিকট তৃপ্তিকর করিয়া তুলিতে হইবে।

পরিশেষে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নহে। এই পদ্ধতি শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষণতত্ত্বের (Theory of Learning) উপর নির্ভরশীল। উহার মূলতত্ত্ব মাত্র দুইটি—(ক) ছাত্রেরা নিজের আগ্রহে নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা করিবে। (খ) তাহারা যে শিক্ষা লাভ করিবে তাহা সক্রিয় হইবে—একক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে তাহাদের শিক্ষার সংক্রমণ হইবে। এই দুইটি ঠিক নীতি রাখিয়া শিক্ষক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন।

অনুশীলনী

Q. 1. It is said that our School should be a place "in which work is play and play is life" : "Three in one and one in three"—Elucidate. (C.U. B.T. 1957)

Ans. (পৃ: ১২১-১২৯)

Q. 2. Write short notes on Playway in education (C.U. B.T. 1957) (উঃ পৃ: ১২৩-১২৬) ; Child-Ceatric Education (C.U.B.T. 1957. পৃ: ১২১-১২৩) Basic Education (C.U. B.T. 1957. পৃ: ১৩১-১৪০) ; Learning by doing (C.U..B.T. 1957 পৃ: ১২৬ ২৯)

Q. 3. Work is conscious activity dominated by the object which it seeks to produce and drudgery is conscious activity whose value is not evident to the actor. How far should play impulse be utilised in overcoming drudgery and hard work (C.U. B.T. 1953).

Ans. (পৃ: ১২৩-১২৬)

Q. 4. In all plays we find an element of joy and on this account we find play associated with the fine arts. Show that play is a good means of sublimation (C.U. B.T. 1952)

Ans. (পৃ: ১২৩-১২৬)

Q. 5. What are the characteristic features that mark off New Teaching from the Old ? (C.U. B.A. Ed. 1960)

Ans. (পৃ: ১২৯-১৩১ ; ১৪০-১৪২)

Q. 6. What do you mean by Playway in Education ? Illustrate your answer with examples (C.U. B.A. Ed. 1960)

Ans. (পৃ: ১২৩-১২৬)

Q. 7. Explain the 'project method'. What are its merits and limitations ? How far can it be used in your school with advantage ? (C.U. B.T. 1956)

Ans. (পৃ: ১২৬-১২৯)

Q. 8. To what extent the principles of Project Method may be discerned in Basic Education. (C.U.B.T. 1955)

Ans. (পৃ; ১৩১-১৪০)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা এবং শিক্ষক

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। 'আচার্যের' উপরই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। তিনিই পাঠ্যক্রম রচনা করিতেন, তিনিই শিক্ষা দিতেন, তিনিই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন এবং শিক্ষা শেষে তিনিই 'অভিজ্ঞান পত্র' প্রদান করিতেন। প্রাচীন গ্রীসেও শিক্ষকের স্থান প্রায় একইরূপ ছিল। মধ্যযুগেও (ইউরোপে) শিক্ষক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু শিক্ষাকার্যে তাঁহার দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছিল। একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের গঠন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছিল; শিক্ষক এবং বিদ্যালয় তখন আর অভিন্ন ছিল না। চার্চ (Church) তখন বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে—বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেছে এবং তাহার পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছে; শিক্ষক কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতেছেন। কিন্তু কর্মচারী হইলেও তিনি ছিলেন শিক্ষাদাতা—তাঁহার আদর্শেই ছাত্রেরা অনুপ্রাণিত হইত। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, শিশু "পাপ" প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শিক্ষকের কার্য হইতেছে যে, অল্প বয়সেই তাহাদের "বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া।" কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকের মুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ এবং পুস্তক পাঠ দ্বারা জ্ঞান অর্জন (বিশেষ করিয়া ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান) করার চেষ্টাই ছিল ছাত্রজীবনের বিশেষত্ব। ছাত্রের বিদ্যালয়-জীবন (উপরোক্ত কার্য) সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেন শিক্ষক।

শিক্ষা এবং শিক্ষকের কার্য সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণা আমাদের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে "শিক্ষাদান" কথাটি সর্বত্র চালু হইয়া পড়ে। শিক্ষক জ্ঞানের ভাণ্ডার—শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে মূর্ত। অপরদিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্রেরা শূন্যকুম্ভ তাহারা "পাপ"-প্রবণতায় পূর্ণ। শিক্ষককে ছাত্রের শূন্যকুম্ভ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার অন্তর হইতে পাপপ্রবণতা দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম "শিক্ষাদান"। শিক্ষক "দান" করিবেন এবং ছাত্র তাহা "গ্রহণ" করিবে। শিক্ষক বিদ্যালয় সমাজের কর্তা বা কার্যনায়ক; ছাত্রেরা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিলেই শিক্ষালাভ হইবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উপরোক্ত ধারণা অনুসারেই শিক্ষাকার্য চলিতেছে। অধিকন্তু উহাদের কর্মক্ষেত্র মধ্যযুগের বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র হইতে সংকীর্ণতর। আমরা ছাত্রদের "পাপ" প্রবণতা দমন বা তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছিত চরিত্রের সৃষ্টিকরাকে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি না। ছাত্রদিগকে "জ্ঞানদানই" বিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ম বলিয়া গণ্য করি। আমাদের ধারণা এই যে, শিক্ষকরূপ পূর্ণকুম্ভ (জ্ঞানের) হইতে ছাত্রের মনরূপ শূন্যকুম্ভে জ্ঞান ঢালিয়া দিতে পারার নামই শিক্ষা। তারপর ধীরে ধীরে এমন দাঁড়াইল যে, শিক্ষক আর জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিলেন না—তাঁহার নিজের জ্ঞান পাঠ্য পুস্তকে সঞ্চিত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। ফলে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল ছাত্রদিগকে পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির ভয় দেখাইয়া পাঠ্যপুস্তক পড়িতে বাধ্য করা। শিক্ষা এবং "পড়ানো" একার্থবাচক হইয়া পড়িল কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের প্রাধান্যও বেশী দিন থাকিল না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপরে বাহ্যিক পরীক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করার দরুণ পরীক্ষায় পাশের প্রধান সহায়ক "অর্থপুস্তক" পাঠ্যপুস্তকের স্থান অধিকার করিল। আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়ে শিক্ষক বা ছাত্র কাহারও প্রাধান্য নাই; উহাতে বাহ্যিক পরীক্ষা এবং অর্থপুস্তক সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ইউরোপে কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবর্তন প্রগতিপথ অবলম্বন করিল। সেখানে শিক্ষককেন্দ্রিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে পরিণত না হইয়া শিশুকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। আমরা দেখিয়াছি যে, রুশো শিশুকে "পাপ" প্রবণতাপূর্ণ মনে না করিয়া "পুণ্য" প্রবণতার আধার বলিয়া মনে করিতেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে, স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর অন্তনির্হিত প্রবণতা ও ক্ষমতার বিকাশকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান খুব বড় ছিল না। আবার আমরা জানি যে, শিক্ষাবিদ্ ফ্রবেলের "কিণ্ডার গার্ডেন" শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষককে বাগানের মালীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। ফ্রবেলের মতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির (urges) প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। শিক্ষক ঐ বিকাশের সাহায্য করেন মাত্র। বিজ্ঞান হিসাবে মনস্তত্ত্বের অগ্রগতির ফলে শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের উপর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতে লাগিল। শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার দরুণ সকলে এক জিনিষ একইভাবে শিক্ষালাভ করিবে ইহা আশা করা যায় না। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ হিসাবে শিক্ষালাভ করিবে। কাজেই

শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক না থাকিয়া শিশুকেন্দ্রিক (child-centred) হইয়া পড়িল।

অধুনা সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনস্তত্ত্বের (Social Psychology) অগ্রগতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অপেক্ষা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হইয়া থাকে একথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। মানুষের জীবনে তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহের স্থান থাকিলেও, সে যে অনেকখানিই পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি ইহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণের (manipulation) দ্বারা শিশুকে অনেকখানি ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তোলা সম্ভব বলিয়া আমরা বর্তমানে বিশ্বাস করি। শিশুকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই যে সে যথাযথ শিক্ষা পাইবে এই নীতিতে আমরা পূর্বের মত বিশ্বাস করি না। কাজেই শিক্ষার ক্ষমতা এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর আমাদের আস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিকতম শিক্ষণপদ্ধতি (Theory of Learning) আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে, কাহাকেও "শিক্ষা দান" বা "পড়ানো" সম্ভব নহে। শিশু একমাত্র নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ (শিক্ষাকার্যে ফলপ্রসূ) অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারে; নিজের চাহিদার প্রেরণায় পুস্তক পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে। "শিক্ষা দান" এবং "পড়ানো" এই শব্দগুলি বর্তমানে অভিধান হইতে অপসারিত করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকার্যে দাতা-গ্রহীতা বলিয়া কোন সম্বন্ধ নাই। শিক্ষাকার্যে শিক্ষক এবং ছাত্র পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষাদান করিতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণও করিতেছেন—প্রথম অধ্যায়ে এইজন্যই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া উহাকে আমরা দ্বি-কেন্দ্রিক পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। তারপর ছাত্র যে একমাত্র শিক্ষকের সহিত সম্বন্ধের ফলেই অভিজ্ঞতা লাভ করে এমনও নহে। ছাত্রের অভিজ্ঞতালাভের জন্য অনেক নূতন নূতন মাধ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, সিনেমা, রেডিও প্রদর্শনী ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে; শিক্ষকের মত ইহারাও আধুনিক বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যেই ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। আবার বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষকের একনায়কত্বের নীতিও বর্তমানে সমর্থিত হয় না। বিদ্যালয়কে বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক সমাজরূপে পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে এই সমাজের সভ্য

হইবেন। ইহার কর্ম, আইনকানুন ইত্যাদি শিক্ষকের নির্দেশে পরিচালিত না হইয়া পারস্পরিক সম্মতিতে পরিচালিত হইলে এই সমাজে বাসের দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষালাভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

আধুনিকতম শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান—উপরোক্ত আলোচনার ফলে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিনা এ সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষাকার্যে তাহার অবদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয় নাই। শিক্ষার চাবিকাঠি যে শিক্ষকের হাতে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন লিখিয়াছেন—"পরিকল্পিত শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষকের স্থানই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে" ("We are, however convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher.") আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিলে, শিক্ষাকার্যে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে।

১। আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রকে "শিক্ষাদান" করিতে চেষ্টা করেন না বটে কিন্তু শিক্ষালাভ কার্যে তিনি তাহার সহিত সহযোগিতা করেন। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সর্বপ্রথমেই শিক্ষককে ছাত্রদের মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হয়। বিদ্যালয়ে শিশু কেবলমাত্র নিজের "স্বাভাবিক" ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়া যাইবে—স্বেচ্ছাচারের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব—এই নীতি বর্তমানে স্বীকার করা হয় না। সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Social psychology) প্রমাণ করিয়াছে যে, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে বাঞ্ছিত শিক্ষাগ্রহণের জন্য ছাত্রের অন্তরে চাহিদা সৃষ্টি করা চলে। তাই শিক্ষকের প্রথম দায়িত্ব বিদ্যালয়ে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা যাহাতে বাঞ্ছিত শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের মনে প্রেরণা জন্মায়।

২। বাঞ্ছিত শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের মনে আগ্রহ জন্মাইতে হইলে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার অনুকূল জীবনদর্শন জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, জীবনদর্শন এবং শিক্ষার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ছাত্রদের ভালমন্দের জ্ঞান যদি বিদ্যালয়ের ভালমন্দের জ্ঞানের সঙ্গে

সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে শিক্ষাকার্য কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। জীবনদর্শন হইতেই মানুষের ভালমন্দের জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সংক্ষেপে, আদর্শবাদ ব্যতীত শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণরূপে অচল। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বয়সের গুণেই যে ছাত্রেরা আদর্শবাদী থাকে একথাও আমরা জানি। কাজেই শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য সমাজ, তথা বিদ্যালয় যে জীবনদর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে ছাত্রদের মনে সেই জীবনদর্শন জন্মাইতে সাহায্য করা। সমাজের জীবনদর্শন শিক্ষকের মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে; তাই শিক্ষককে ছাত্রদের জীবনদর্শনের কর্ণধার (Philosopher) বলা হইয়া থাকে।

৩। জীবনদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য মাত্র স্থির করে। কোন্ কোন্ ধরণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব তাহা পৃথকভাবে স্থির করিতে হয়; এই কার্যকে সাধারণতঃ আমরা পাঠ্যক্রম রচনা করা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ছাত্রেরা তাহাদের নিজের অন্তরের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নিজেরাই গ্রহণীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নির্বাচন করিবে বটে কিন্তু ঐ কার্যে শিক্ষকের পরামর্শ তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষ শিক্ষা শব্দের অর্থই সুপরিকল্পিত শিক্ষা—শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কি ধরণের অভিজ্ঞতা দিতে হইবে তাহা মোটামুটিভাবে পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিতে হয়। এই কার্যে শিক্ষককে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়। কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঠ্যক্রমের কাঠামো রচনা করিয়া দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত প্রয়োগ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয় সমাজের নেতা হিসাবে শিক্ষক ছাত্রদিগকে এমনভাবে পরিচালিত করিবেন—তাহাদিগকে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন করাইবেন যাহাদের সমাধান করিতে গিয়া ছাত্রেরা পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলি লাভ করে।

৪। বিদ্যালয়-সমাজকে লক্ষ্যপথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন (ছাত্র-সংসদ, লাইব্রেরী, সাহিত্য সভা, হবিক্লাব ইত্যাদি)। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার প্রাথমিক পরিকল্পনা শিক্ষককেই করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনে এবং পরিচালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এই কার্যেও শিক্ষককেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। বিদ্যালয়-সমাজের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন

এবং উহারা যাহাতে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনেও শিক্ষক বিদ্যালয়-সমাজের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন।

৬। ছাত্রেরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞানলাভ করে; ঐ জ্ঞানকে সংহত এবং কার্যকরী করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব শিক্ষকের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষককে অনেক সময় ছাত্রদের সহিত আলোচনা-সভায় মিলিত হইতে হয়; প্রয়োজন-বোধে তাঁহার বক্তব্য ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়; তাহাদিগকে পুস্তকপাঠে সাহায্য করিতে হয়—সংক্ষেপে "পড়ানো" বলিতে আমরা যাহা কিছু বুঝি তাহার সব কিছুই করিতে হয়।

৭। শিক্ষকের আর একটি প্রধান কাজ হইল পরীক্ষা গ্রহণ করা। প্রদত্ত অভিজ্ঞতা কোন্ ছাত্রকে শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে কতখানি অগ্রসর করিয়া দিল তাহা শিক্ষককে সর্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হইতেছে তাহার উপযুক্ততাও শিক্ষককে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। ছাত্রদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ এবং তাহা বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে (কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা ইত্যাদি)।

৮। শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য দানের চেষ্টাও শিক্ষককে করিতে হয়। যে সব ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দিয়াছে তাহার মানসিক সমস্যা সমাধানের কার্যেও শিক্ষককে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

৯। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাও শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনে তাঁহাকেই অগ্রণী হইতে হয়। ছাত্রের প্রগতিপত্র (Progress Report) শিক্ষকই প্রস্তুত করিয়া অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করেন। ছাত্রেরা সমাজসেবা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিলে শিক্ষককেই তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিদ্যালয়ে এমন কোন কর্ম নাই যাহাতে শিক্ষককে অংশ গ্রহণ করিতে না হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কোন কাজই শিক্ষক একা করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই ছাত্র-শিক্ষকের সম্মিলিত দায়িত্ব। আবার বিদ্যালয় জীবনের অধিকাংশ কাজেই শিক্ষককেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বন্ধুর মত তিনি ছাত্রদের কর্মে সহযোগিতা করেন—তাহাদের আনন্দে-নিরানন্দে, সফলতায়-বিফলতায় অংশ গ্রহণ করেন। আবার নেতা হিসাবে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই

উহার সমাধানের চেষ্টায় শিক্ষকের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাই এক শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন যে, শিক্ষক হইবেন ছাত্রদের বন্ধু, দার্শনিক এবং সচিব (Friend, Philosopher and Guide)। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের "পাঠদান" করিয়া শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয় না। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কার্যে (পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত) শিক্ষক এবং ছাত্র সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন ইহাই আধুনিক শিক্ষানীতি। শিক্ষকের মধ্যেই ছাত্র তাহার জীবনের আদর্শকে খুঁজিয়া পাইবে। যে জ্ঞানদান এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষক হইবেন তাহার জীবন্ত প্রতীক। ইহা না হইলে ছাত্রদিগকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে ছাত্রেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নেতারূপে গ্রহণ করিবে না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে তাঁহাকে যাহা কিছু করিতে হইত (পাঠদান এবং শৃঙ্খলা রক্ষা) এখনও তাহার সবকিছুই করিতে হয়; কিন্তু ঐ কাজগুলি সুকৌশলে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে করিতে হয়। পূর্বে যে সব কাজ হইতে শিক্ষক দূরে থাকিতেন (খেলা ইত্যাদি) বর্তমানে সেই সব কাজেও তাঁহাকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। অধুনা অনেক নূতন ধরণের কাজের (কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা ইত্যাদি) দায়িত্বও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। মোটকথা. শিক্ষাকার্যের জটিলতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে শিক্ষকের দায়িত্বও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব—প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও একজন শিক্ষক; কিন্তু বিদ্যালয় সমাজে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ব্রিটেনে প্রধান শিক্ষকের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে; প্রাচীন ভারতের আচার্যের মত বিদ্যালয়ে তিনি প্রায় সর্বেসর্বা। আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষকদের কিন্তু ততটা স্বাধীনতা নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এবং শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয় তথা প্রধান শিক্ষককে অনেক অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তারপর প্রত্যেক বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালনের জন্য ম্যানেজিং কমিটি রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। শিক্ষকের সম্বন্ধ সাধারণতঃ ছাত্রদের সঙ্গে; কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সম্বন্ধ ছাত্র এবং শিক্ষক

উভয়ের মধ্যেই সম্প্রসারিত। প্রত্যক্ষ হউক আর অপ্রত্যক্ষ হউক বিদ্যালয় জীবনের সকল সমস্যার নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। আলোচনায় সুবিধার জন্য প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—১। ছাত্রদের সম্বন্ধে দায়িত্ব, ২। সহকর্মীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব, ৩। অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজ সম্বন্ধে কর্তব্য, ৪। বিদ্যালয়ের কর্মসচিবরূপে দায়িত্ব।

১। প্রধান শিক্ষককে সর্বদা মনে করিতে হইবে যে তিনি প্রধানতঃ শিক্ষক ; শিক্ষক না হইলে বিদ্যালয় সমাজে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব রক্ষা করা চলে না। বিদ্যালয় সমাজে ছাত্রদের শিক্ষাকার্যে সাহায্য করাই সর্বপ্রধান কর্ম। সুশিক্ষক হইতে না পারিলে, সমাজের সভ্যেরা সহজে কাহাকেও অন্তর হইতে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। কাজেই অন্যান্য কর্মে প্রধান শিক্ষক যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, কিছু কিছু অধ্যাপনা তাঁহাকে করিতেই হইবে ; যত বেশী সংখ্যক শ্রেণীতে তিনি অধ্যাপনা করিতে পারেন ততই ভাল। পাঠ্যক্রমের অনুসরণ করাই তাহার অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাপনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং সাধারণভাবে তাহাদিগকে শিক্ষালাভকার্যে উদ্বুদ্ধ করাই প্রধান শিক্ষকের অধ্যাপনার প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহার পাঠদানপদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিবেন ইহাও তাঁহার পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই প্রধান শিক্ষক কোন এক শ্রেণীতে বেশী অধ্যাপনা না করিয়া যত বেশী সংখ্যক শ্রেণীতে সম্ভব অধ্যাপনা করিবেন ; নীতি হিসাবে ইহা গ্রহণ করা উচিত। তাঁহার অধ্যাপনা কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রদের প্রধান শিক্ষকের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রয়োজন অল্প নহে।

২। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষকের বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা উচিত। প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের জীবন্ত প্রতীক ; তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে ছাত্রেরা সহজেই উদ্বুদ্ধ হইবে ; ফলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের সমস্যা পৃথকভাবে বোঝা সহজ হইবে। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, খেলা প্রভৃতি যে সব কার্যে অনেক ছাত্র একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে সেই সব কার্যে প্রধান শিক্ষকের (শুধু উপস্থিতি নহে) যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তারপর ছাত্রদের সহিত প্রধান শিক্ষকের এমন ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের

ধারণা জন্মায় যে, তিনি তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট গিয়া তাহার সুখ-দুঃখের কথা জানাইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। ঐরূপ ধারণা জন্মাইতে পারিলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজতর হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যে প্রধান শিক্ষক তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহেন, তাঁহার পক্ষে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করা সম্ভব নহে।

৩। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজেরও নেতা। শিক্ষক সমাজ যাহাতে তাঁহাকে অন্তরের সহিত নেতারূপে গ্রহণ করেন সে দিকে তাঁহার সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ঐরূপ নেতৃত্ব লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে সব কাজে আদর্শানুরূপভাবে চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষকদের নিকট হইতে তিনি যে ধরণের কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি প্রত্যাশা করিবেন তাঁহার নিজেরও সেই ধরণের কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ প্রধান শিক্ষককে তাঁহার সহকর্মিগণের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পারস্পরিক ভালবাসার সম্বন্ধ ব্যতীত পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিদ্যালয় জীবনেই হউক, আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক যখনই কোন শিক্ষক কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবেন প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হইবে যে নিজে অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের চেষ্টা করা। তৃতীয়তঃ, প্রধান শিক্ষকের মনে রাখা কর্তব্য যে, বিদ্যালয়ের সকল ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষকই সমান আগ্রহশীল। মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের সকল নীতি এবং কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল রাখা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। শুধু তাহাই নহে, বিদ্যালয় সমাজের আইন-কানুন প্রণয়ন এবং শিক্ষকের কাজ ও দায়িত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অন্ততঃ পাক্ষিক সম্মেলন প্রধান শিক্ষকের আহ্বান করা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, শিক্ষকদের মধ্যে মেলামেশা এবং সহযোগিতা গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত শিক্ষক সমিতি স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষকের অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ সমিতি গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে। শিক্ষকদের পাক্ষিক সভা আহ্বানের দায়িত্ব ঐ সমিতি গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য

হইতেছে যে, শিক্ষকদের তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা (শ্রেণী-পাঠ, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে)। যে শিক্ষকের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, মোটামুটি স্বাধীনভাবে তাঁহাকে ঐ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হয়। আমাদের অনেক প্রধান শিক্ষকই এই নীতির কথা বিস্মৃত হইয়া পড়েন। ষষ্ঠতঃ, শিক্ষকদের কাজের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধীনভাবে কাজে অগ্রসর হইলে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে দেখা যায় যে, প্রধান শিক্ষক শিক্ষকের কৃতিত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব কখনও নিজ স্কন্ধে বহন করেন না।

অধুনা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর শিক্ষকদের মধ্যে সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপ্রদ নহে। বিদ্যালয়ের কার্যের ত্রুটির জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করা যেন রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রধান শিক্ষক অপরাপর শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকরা যতটুকু কাজ করেন যেন সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলকভাবেই করিয়া থাকেন। উপরোক্ত নীতিগুলি স্মরণ রাখিয়া প্রধান শিক্ষক কাজে অগ্রসর হইলে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। বিদ্যালয় এবং অভিভাবদের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসাবেও প্রধান শিক্ষককে কার্য করিতে হয়। শিশুর শিক্ষা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইলে তাহার বিদ্যালয় এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রধান শিক্ষককে অভিভাবকদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। অভিভাবকদের নিকট ছাত্রদের প্রগতিপত্র পাঠাইবার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন গঠন ও তাহার পরিচালনে অগ্রণী হইতে হয়। ব্যক্তিগতভাবেও প্রধান শিক্ষককে অনেক সময় অভিভাবকদের সহিত দেখা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের মত প্রত্যেক অভিভাবকের সহিতও প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। অভিভাবকগণ ব্যতীত বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সমাজের সহিতও প্রধান শিক্ষককে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। বিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক সমাজের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ (functional relationship) রহিয়াছে। প্রধানতঃ আঞ্চলিক সমাজের প্রয়োজনে এবং উহার চেষ্টায়ই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া থাকে।

উহাকে উন্নততর করিতে হইলেও ঐ সমাজের চেষ্টারই প্রয়োজন। ফলে প্রধান শিক্ষককে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হয় যাহাতে আঞ্চলিক সমাজ বিদ্যালয়কে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া উহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিদ্যালয় কর্ম-পরিষদের (School Managing Committee) মাধ্যমে সাধারণতঃ আঞ্চলিক সমাজ বিদ্যালয় পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আঞ্চলিক সমাজের প্রতিনিধি লইয়া বিদ্যালয়-কর্ম-পরিষদ গঠিত হয় এবং কর্মসচিব হিসাবে প্রধান শিক্ষক ইহার সহিত যুক্ত থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-কর্ম-পরিষদ বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রদের শিক্ষালাভে সাহায্য করা বিশেষজ্ঞদের হাতে (শিক্ষকদের) অর্পণ না করিলে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিদ্যালয় আঞ্চলিক সমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ম পরিচালনায় শিক্ষকদের স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পারে না। তাই কর্ম-পরিষদের সহিত কলহ সৃষ্টি না করিয়া বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাহাতে শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পারে প্রধান শিক্ষককে সেইরূপভাবে চলিতে হয়। সংক্ষেপে আঞ্চলিক সমাজের উপর প্রধান শিক্ষকের অন্ততঃ কিছুটা প্রভাব থাকা আবশ্যক। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রধান শিক্ষক গ্রাম্য দলাদলি বা রাজনীতিতে লিপ্ত হইবেন। সমাজের উপর তাঁহার প্রভাবের উৎস হইবে তাঁহার চরিত্র, তাঁহার সমাজসেবার প্রবৃত্তি এবং তাঁহার জ্ঞান।

তারপর আঞ্চলিক সমাজ যত শিক্ষাসচেতন হইবে বিদ্যালয়ের কাজও ততই ভালভাবে চলিবে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। আঞ্চলিক সমাজ, বিশেষ করিয়া অভিভাবকগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না থাকিলে বিদ্যালয়ের সংস্কার সহজ হয় না। তারপর, বিদ্যালয়ের কার্যে আঞ্চলিক সমাজের অবদান কতখানি সে সম্বন্ধেও ঐ সমাজের অনেকের প্রকৃত ধারণা নাই। তাই প্রধান শিক্ষককে আঞ্চলিক সমাজকে শিক্ষাসচেতন এবং শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে উহাকে কিছুটা ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান বা সমাজসেবার কর্মে বিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই সব কর্মে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব (ধরা যাউক—গ্রাম্য

মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ)। সংক্ষেপে বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের কার্যে প্রধান শিক্ষককেই অগ্রণী হইতে হয়।

৬। প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের কর্মসচিব। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার। বিদ্যালয়ের অফিস (কর্ম পরিচালনার নিমিত্ত) প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তাই অফিসের কর্মচারীদের সম্বন্ধেও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদিগের সহিতও তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত। শিক্ষকদের সহিত ব্যবহার করিতে তিনি যে সব নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন অফিসের কর্মচারীদের (পিওনসহ) সহিত ব্যবহারের কালেও তাঁহাকে সেই সব নীতি অনুসরণ করিতে হইবে)। শিক্ষকগণ এবং অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যাহাতে যথাসথ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে সেই দিকেও প্রধান শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হয়। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও অফিসের কর্মচারীরা শিক্ষকদের মত বিদ্যালয় সমাজের সভ্য এবং বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ একথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন হইতে ইঁহারা যাহাতে পৃথক না থাকেন সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে অবহিত হইতে হইবে।

বিদ্যালয়ের কর্মসচিব হিসাবে প্রধান শিক্ষককে নানারূপ "খাতাপত্র" রক্ষা করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষক এবং ছাত্রদের উপস্থিতির খাতা, বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির খাতা, লাইবেরীর খাতা, কর্ম পরিষদের কার্যবিবরণীর খাতা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের খাতা ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সচিব হিসাবে শিক্ষাবিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রধান শিক্ষককে পত্র বিনিময়াদি করিতে হয়। সকলেই প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও প্রধান শিক্ষককেই অগ্রণী হইতে হয়।

৭। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে। ছাত্র ভর্তীকরণ, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়ন, দৈনন্দিন কর্মসূচীর প্রস্তুতি (Time table), বিধিবদ্ধভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ, ছাত্রদের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণকরণ ইত্যাদি সকল কার্যের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়।

তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রধান শিক্ষকের কর্মসম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া

সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন ইহাই আশা করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার চাবিকাঠি তাঁহার নিকট। উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক লাভ করা বিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র বিদ্যালয় সমাজের (শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারী) সহযোগিতা ব্যতীত তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না।

সুশিক্ষকের গুণাবলী—শিক্ষকের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিলেই সুশিক্ষক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা জন্মাইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ কি ধরণের শিক্ষক পাইলে সুখী হয় সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা কর্তব্য—বস্তুতঃ পক্ষে ছাত্রেরাই শিক্ষকের ভালমন্দ বিচারের প্রধান মাপকাঠি—তাহাদের সাহায্যদানের যোগ্যতার উপরই শিক্ষকের যোগ্যতা-বিচার প্রধানভাবে নির্ভর করে। ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছে যে, মোটামুটিভাবে শিক্ষকের মধ্যে তাহারা নিম্নলিখিত গুণাবলী দেখিতে চায়। (ক) বিষয়বস্তুতে গভীর জ্ঞান; (খ) পাঠদানে দক্ষতা; (গ) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী (ছাত্রদের সম্বন্ধে); (ঘ) ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিবার ক্ষমতা। শিক্ষকের কার্যাবলী এবং ছাত্রদের উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলির কথা স্মরণ রাখিয়া সুশিক্ষক হইতে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্বপ্রথমেই শিক্ষকতা কার্যের প্রতি শিক্ষকের নিজের শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরিয়া অর্থহীন কাজ করিতে করিতে শিক্ষকদের নিজেদের কার্যের উপর নিজেদের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে—"পড়াইয়া" যে কোন লাভ হয় একথা সর্বাগ্রে শিক্ষকরাই বিশ্বাস করেন না। নিতান্ত পড়াইতে হইবে তাই পড়ান। পড়াইলে যাহা হইবে, না পড়াইলেও তাহাই হইবে এইরূপ একটি ধারণা লইয়াই যেন শিক্ষকেরা শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হন। যে কর্মী নিজের কার্যের ফলাফল সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহে, তাহার কার্য কখনও আশানুরূপ হইতে পারে না। সে নিজের কার্য হইতে কখনও আনন্দও পাইতে পারে না—কার্য তাহার কাছে অপ্রীতিকর। শিক্ষকতা কার্যে শিক্ষকের আনন্দ পাওয়া একান্ত আবশ্যক; কেবলমাত্র অর্থের জন্য শিক্ষকতা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। জীবনের প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা জন্মাইলে শিক্ষকদের নিজেদের কার্যের উপর অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মাইবে আশা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির উপরও শিক্ষকের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকতা এরূপ ধরণের কার্য যে, গতানুগতিকতা সম্পূর্ণরূপে ইহার পরিপন্থী। প্রগতিধর্মী না হইলে—কার্যকারণ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইলে শিক্ষকতাকার্যে সফলতা লাভ অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি শিক্ষাসমস্যা এক একটি নূতন সমস্যা। কার্যকারণ বিবেচনা না করিয়া অন্ধভাবে গতানুগতিককে অনুসরণ করিলে, উহার সমাধান করা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া বর্তমানে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিকতা এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে, শিক্ষকদের মধ্যে সর্ব প্রযত্নে প্রগতিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

জাতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের উপর শিক্ষকের আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রধানতঃ জাতির আদর্শেই শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হইবে। শিক্ষক যদি জাতীয় আদর্শ বা ঐতিহ্যের পরিপন্থী শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন তবে তাহা নিতান্ত অবাঞ্ছিত কার্য হইবে (দৃষ্টান্ত—শিক্ষকের সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষাদানের চেষ্টা)।

শিক্ষকের নিজের জীবনে আদর্শবাদ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। আদর্শবাদ ব্যতীত শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইতে পারে না। জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে মনে একটি আদর্শ থাকিবে এবং ঐ আদর্শলাভের চেষ্টার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ হইবে ইহাই শিক্ষার নিয়ম। শিক্ষকের সাহচর্যে থাকিয়া ছাত্রেরা তাহার জীবনের আদর্শবাদ গ্রহণ করিবে ইহাই আশা করা হয়। তারপর ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতে ছাত্রেরা নিজেরা এত আদর্শবাদী হইয়া পড়ে যে, শিক্ষকের মধ্যে আদর্শবাদ না থাকিলে তাহার পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না।

আচরণ ব্যতীত চরিত্র শিক্ষাদান যে সম্ভব নহে একথা আমরা বর্তমানে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তাই ছাত্রদের মধ্যে যে সব চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইবে বলিয়া আশা করা হয় (পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, মানসিক স্থৈর্য ইত্যাদি) শিক্ষকের মধ্যেও ঐসব চারিত্রিক গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক-জীবনে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সহিষ্ণুতা, স্নেহপ্রবণতা, পরার্থপরতা ইত্যাদি আরও কয়েকটি চারিত্রিক গুণ শিক্ষকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশুদের জীবনের চাহিদা এবং বয়স্কদের জীবনের চাহিদার মধ্যে অনেক সময় এত পার্থক্য থাকে যে, উপরোক্ত গুণগুলি না থাকিলে শিশুর সাহচর্য হইতে আনন্দলাভ করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার পারস্পরিক সম্বন্ধ আনন্দপূর্ণ না হইলে শিক্ষালাভও হইতে পারে না।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে শিক্ষকদের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা আবশ্যক (objective outlook)। তাহার বিচার এবং সিদ্ধান্তে শিক্ষক সবপ্রকার ব্যক্তিগত প্রভাবের উর্ধ্বে থাকিবেন। পক্ষপাতিত্বহীন না হইলে শিক্ষক কিছুতেই ছাত্রসমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিবেন না। শিশু-সুলভ মনোভাব সুশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ। শিশুর সমস্তরে নিজেকে নামাইয়া আনিতে না পারিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারেন না। তারপর শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকা যে আবশ্যক ইহা বলা-বাহুল্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছাত্রসমাজের নেতা বলিয়া নিয়োগ করিলেই যথেষ্ট হইল না। ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে শিক্ষাকার্যে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন না। নেতা হইতে হইলে এক দিকে যেমন জ্ঞান, কর্মকুশলতা, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি স্বাধীনভাবে নূতন কাজে অগ্রসর হইবার সাহস পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ইত্যাদি নানা চারিত্রিক গুণ থাকা প্রয়োজন। চারিত্রিক গুণাবলী ব্যতীত শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্ততঃ যে কোন একটিতে শিক্ষকের জ্ঞান বিশেষজ্ঞ স্তরের হওয়া আবশ্যক। নীচু ক্লাসগুলিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া তাহা ছাত্রদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারিলেই তাহারা শিক্ষালাভ করিবে ইহা আশা করা যায় না। পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ জ্ঞান শিক্ষকের নিজের উপলব্ধির মধ্যে না আসিলে, ছাত্রদিগকে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করিতে তিনি সাহায্য করিতে পারেন না। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে পৌঁছিতে না পারিলে জ্ঞান উপলব্ধিগত হওয়া সম্ভব নহে। তাই শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা দিবেন সে বিষয়ে তাঁহার উচ্চতর স্তরের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর শিক্ষককে যদি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, তবে কোন্ অভিজ্ঞতা হইতে কোন্ জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধজ্ঞান সংহত ও বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্তও "বিষয়বস্তু" সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের উচ্চতর স্তরের জ্ঞান

থাকার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিকতরভাবে অনুভূত হইতেছে। কোন বিষয়ে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ঐবিষয় মাধ্যমিকস্তরে "পাড়াইবার" যোগ্যতা জন্মায় না, এই এইকথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষককে কেবলমাত্র একটি বিষয় পড়াইলেই চলে না ; অন্ততঃ আর একটি বিষয় তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে "পড়াইতে" হয়। নীতির দিক হইতেও ইহাতে আপত্তি করিবার খুব বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষকের জ্ঞান উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষক যে বিষয়ে "পাঠদান" করেন সে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয় (Correlated Subject) গুলিতেও তাঁহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসের শিক্ষকের ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞান না থাকিলে তিনি যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজের বিষয় ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্ততঃ আরও একটি বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়।

শিক্ষকের "সাধারণ জ্ঞান" (General knowledge)-ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। উদার ভিত্তির উপর জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ জ্ঞানের যথোচিত সংক্রমণ (Transfer) হয় না। তারপর শিক্ষাকার্যকে যত বেশী করিয়া জীবনভিত্তিক (Life-Centred) করা হইবে ততই শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর পরিমাণে অনুভূত হইবে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইলে শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইবে। আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন না হইলে আধুনিক পদ্ধতিতে তাহার পক্ষে শিক্ষাদান সম্ভব নহে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষকদের "সাধারণ জ্ঞান" আশানুরূপ-ভাবে থাকে না ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শিক্ষাদানে তাঁহাদের ব্যর্থতার ইহা অন্যতম কারণ।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমন অনেক বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহা শিক্ষা দিতে হইলে বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষকের যথেষ্ট পরিমাণ কর্মদক্ষতা থাকার প্রয়োজনও রহিয়াছে (শিল্প, গার্হস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রয়োগধর্মী বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য বিষয়গুলির জ্ঞানও বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা শিক্ষকের না থাকিলে

তিনি সুশিক্ষক হইতে পারেন না। বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা না জন্মান পর্যন্ত জ্ঞান সক্রিয় হয় না। শিক্ষকের নিজের জ্ঞান সক্রিয় না হইলে, ছাত্রদের জ্ঞান সক্রিয় করিতে তিনি সাহায্য করিতে পারেন না (দৃষ্টান্ত, সাহিত্যের শিক্ষক নিজে সুসাহিত্যিক হইলে, তাহার শিক্ষাদান ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়)। আধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ কৌশল উভয়কেই বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদিগকে "শিক্ষাদান" করিলেই যথেষ্ট হইল না ; যথাযথ পদ্ধতিতে "শিক্ষাদান" করিতে না পারিলে সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার আধুনিকতম শিক্ষাদান-পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যথাযথ শিক্ষণ শিক্ষার উপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব সম্বন্ধবর্জিত নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নহে ; বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ কৌশলকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। "শিক্ষাদান" কার্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে শিক্ষককে আরও কতকগুলি বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা এবং তাহাতে নম্বর দান, ডায়গনিস্টিক (Diagonitic Test) প্রশ্নপত্র রচনা এবং উহার উত্তর-পত্রের বিশ্লেষণ, ভিসুয়েল এইড (Visual Aid) প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কৌশলের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

শিশু মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানে (Sociology) শিক্ষকের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। শিশু মনস্তত্ত্বে জ্ঞান না থাকিলে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকতা করা সম্ভব নহে। ডাক্তারের যেমন দেহতত্ত্বে (Physiology) জ্ঞান থাকা আবশ্যক শিক্ষকেরও তেমনি শিশু মনস্তত্ত্বে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঐ জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষাকার্যে একপাও অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তারপর বিদ্যালয় একটি সমাজ। এই সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই সমাজের সভ্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যথাযথ ভিত্তিতে স্থাপনের নিমিত্ত শিক্ষকের সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

ছাত্রদের বিভিন্ন আগ্রহের ক্ষেত্রে (Field of interest) শিক্ষকের আগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব করিতে হইলে তাহাদের আগ্রহ, অনাগ্রহ, ভাললাগা, মন্দলাগা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ না করিলে চলে না। ইংরেজিতে যাহাকে কো-কেরিকুলার এক্টিভিটি (Co-

Curricular activity) বলে তাহাতে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে, তিনি অতি সহজেই ছাত্রসমাজের একজন বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। বর্তমানে কো-ক্যারিকুলার এক্টিভিটির মাধ্যমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা "শিক্ষাদান কার্যের" অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। তাই অন্ততঃ দুই একটি কো-ক্যারিকুলার এক্টিভিটিতে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা প্রত্যেক শিক্ষকের থাকা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষকের স্বাস্থ্য ভাল হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি সৌম্য ও প্রিয়দর্শন হইলে সহজেই ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারেন—দেহ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষক ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিলে তাঁহার কার্যে অনেক সুবিধা হয়।

তালিকা প্রস্তুত করিয়া সুশিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষেপে, চরিত্রে, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে শিক্ষকসমাজের আদর্শস্থানীয় না হইলে শিক্ষাকার্যে সাফল্য লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

শিক্ষণ-শিক্ষা এবং শিক্ষক—শিক্ষণ-শিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষক প্রস্তুত করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনেকে মনে করেন যে, সুশিক্ষকের যেসব লক্ষণের কথা উপরে আলোচিত হইল, তাহার অধিকাংশই জন্মগত—সুশিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন—শিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে প্রস্তুত করা যায় না। এই আলোচনায় মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু শিক্ষা কেন, যে কোন কার্যে দক্ষ হইতে হইলে (ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) কিছুটা জ্ঞান, কিছুটা কর্মপদ্ধতিতে দক্ষতা এবং কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মানুষের জ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ নিরপেক্ষ নহে একথাও স্বীকার্য। তবে মানুষ যে অনেকখানিই তাহার পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি —তাহার জ্ঞান, ক্ষমতা, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি সব কিছুই যে বিশেষভাবে শিক্ষালব্ধ একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত করা চলে, তবে শিক্ষকও শিক্ষা দ্বারা তৈয়ারী করা যায়। অনেকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, চারিত্রিক গুণাবলী বুঝি জন্মগত; কিন্তু ইহা সত্য নহে। বিশেষ পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে চারিত্রিক গুণাবলীর সৃষ্টি করা চলে। আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলি যথাযথ কাজ করিতেছে না বলিয়া সুশিক্ষক শিক্ষাসাপেক্ষ নহে বলিয়া আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি—শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের নিমিত্ত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ছাত্রের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং বাড়ীর অভিজ্ঞতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক না হইলে শিশু আশানুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র বিদ্যালয়ে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা তাহার অভিজ্ঞতাসমষ্টির অংশ মাত্র। ছাত্র বিদ্যালয়ে যতক্ষণ থাকে তাহার চাইতে বেশী সময় থাকে বাড়ীতে; তাহার উপর পিতামাতা, ভাইবোনদের প্রভাব অনেক সময় শিক্ষকের প্রভাব অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ফলে "বাড়ী" এবং বিদ্যালয় এক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত না হইলে শিশুর শিক্ষাকার্য আশানুরূপভাবে চলিতে পারে না। আবার সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিভাবকের মাধ্যমে বিদ্যালয়, সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমাজকে যদি "বিদ্যালয়ে আনিতে হয়" তাহা হইলে অভিভাবকদের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। অভিভাবকদের সাহায্যে বিদ্যালয় সমাজের সুযোগ-সুবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে। কাজেই অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত।

আমাদের দেশে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপনের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হইতেছে না। অধিকাংশ বিদ্যালয় হইতেই শোনা যায় যে, সমিতির সভা আহ্বান করিলে, অভিভাবকগণ প্রায় কেহই উপস্থিত হন না। অভিভাবকেরা যদি কখনও বিদ্যালয়ে আসেন তাহা হইলেও তাঁহারা সহযোগিতার মনোবৃত্তি লইয়া আসেন না। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্যের সমালোচনা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি কার্যকরী করিবার চেষ্টায় অভিভাবকদের উপর দোষারোপ করিয়া কোন লাভ নাই। বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে সম্বন্ধ কি কারণে ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের অধঃপতনের ফলে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি সামাজিক সম্বন্ধেই পারস্পরিক দোষারোপ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে—অভিভাবক শিক্ষকের উপর, শিক্ষক অভিভাবকের উপর, শিক্ষক ছাত্রের উপর, ছাত্র শিক্ষককের উপর, পিতা সন্তানের উপর, সন্তান পিতার উপর ক্রমাগত দোষারোপ করিয়া চলিয়াছেন। এই পরিস্থিতির কথা স্মরণ রাখিয়া

শিক্ষক যদি একটু সহিষ্ণু হন এবং অভিভাবকদের সম্বন্ধে নিজের মন হইতে বিরুদ্ধ-ভাব দূর করিতে পারেন, তবে অভিভাবক-শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শিক্ষক এবং অভিভাবকের সম্বন্ধ সত্য সত্যই পারস্পরিক দোষারোপের সম্বন্ধ নহে—ইহা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি কিভাবে সংঘটিত হইবে, ইহার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার কর্মপদ্ধতিই বা কি হইবে এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রকৃত ধারণা না থাকার দরুণ অভিভাবকেরা সমিতির সভায় মিলিত হইয়াও হয়ত দেখেন যে, তাহাদের সন্তানদের দোষের আলোচনা শুনা ব্যতীত তাহাদের আর কিছু করণীয় নাই। বিদ্যালয়কে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অভিভাবকেরা নানা কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের সময় বৃথা নষ্ট হইল। এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের মঙ্গল একান্তভাবে কামনা করেন; তাঁহারা যদি অন্তর দিয়া বুঝিতে পারেন যে, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সন্তানদের মঙ্গল হইবে তাহা হইলে হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁহারা ঐ সভায় উপস্থিত হইবেন।

অবশ্য আমাদের দেশের অনেক অভিভাবকই এখনও অশিক্ষিত থাকার দরুণ বিদ্যালয়ের কার্যে আশানুরূপ সহযোগিতা করিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সার্থকতা বোঝানও কঠিন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হইতেছে যে, শিক্ষাকার্য সম্বন্ধে (চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে) অভিভাবকদের কিছুটা ধারণা দেওয়া এবং তাঁহারা যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন (যেমন সামান্য কারণে বিদ্যালয় হইতে ছাত্রকে অনুপস্থিত না রাখা) সেইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করা।

মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠিত এবং পরিচালিত হইলে তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী থাকিবে।

১। ছাত্রদের শিক্ষায় অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কামনা করিলে সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করিলে চলিবে না। ৪০০।৫০০ শত অভিভাবকের সভায় কোন কার্যকরী সূক্ষ্ম আলোচনা হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বর্তমানে আমরা সমগ্র

বিদ্যালয়ের জন্য যে একটি মাত্র অভিভাবক-সমিতি স্থাপন করিয়া থাকি এই রীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে মধ্যে মধ্যে সকল অভিভাবকদের একসঙ্গে বিদ্যালয়ে আহ্বান করা হইবে না এমন কথা নহে। সাধারণ সামাজিক মেলামেশার জন্য বৎসরে একবার বা দুইবার সকল অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আহ্বান করা উচিত। এই সব মিলন সভায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হইতে পারেন এবং ছাত্র এবং শিক্ষকদের সহিত নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ যাণ্মাষিক বা বার্ষিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের কার্যে অভিভাবকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

২। প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক শাখার (section) জন্য পৃথক পৃথক অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ৩০।৪০ জন অভিভাবকদের বেশী একত্র সম্মিলিত হইলে সোজাসুজি আলোচনা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সমাধানে পৌছান তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। তারপর সমশ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের মধ্যে সমস্যার দিক হইতেও অধিকতর সমতা (similarity) থাকিবার কথা। এইরূপ অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভায়, সমস্যার সমতা হিসাবে অভিভাবকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, সপ্তম শ্রেণীর 'ক' শাখার অভিভাবকদের সভা আহ্বান করা হইয়াছে। ঐ শ্রেণীতে হয়ত ৬টি ছাত্র আছে যাহারা অঙ্কে বিশেষভাবে দুর্বল, আবার হয়ত আরও ৫টি ছাত্র আছে যাহারা ইংরেজিতে পিছাইয়া পড়িয়াছে। অঙ্কে দুর্বল ছাত্রদের অভিভাবকগণকে একদলে এবং ইংরেজিতে দুর্বল ছাত্রদের অভিভাবকদের আর এক দলে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ দলের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে। এই সব আলোচনা সভায় প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য (একাধিক পরীক্ষার ফল, ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণা ইত্যাদি) বিদ্যালয় অভিভাবকদের সরবরাহ করিবেন। আলোচনা বিশেষভাবে অভিভাবকেরাই করিবেন; কিন্তু শিক্ষকগণ (বিশেষ করিয়া বিষয়-শিক্ষক) সব সময়ই তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন আলোচনা শেষে প্রত্যেক দলকেই কিন্তু সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; ঐরূপ লিপিবদ্ধ

কর্মপদ্ধতিতে আবার শিক্ষকের এবং অভিভাবকের অনুসরণীয় কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নির্দেশ থাকিবে। ঐ সব সভায় আমোদ-প্রমোদ এবং সামাজিক মেলামেশার সুযোগও থাকিতে পারে ; ঐ উপলক্ষ্যে শ্রেণীর ছাত্রদের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

৩। বৎসরে ৩।৪ বার ঐরূপ সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। প্রতিবার ছাত্রদের প্রগতি-পত্র প্রেরণ করার পরই একবার করিয়া এই সমিতির অধিবেশন বসিতে পারে। এইরূপ ভাবে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন করিতে বিদ্যালয়ের দিক হইতে প্রধান সমস্যা সময়াভাব। এ সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথক পৃথক ঘরে একসঙ্গে ৫।৬টি সমিতির অধিবেশন হইতে কোন অসুবিধা নাই। সকল শিক্ষকের সকল সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবারও প্রয়োজন নাই ; এমন কি প্রয়োজন অনুসারে এক শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইলেও কার্যে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর (শাখার) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং ঐ শ্রেণীর ছাত্রগণ সেই শ্রেণীর অভিভাবক-সমিতির আয়োজন করিবে।

অনুশীলনী

Q. 1. What the main spring is to the watch, the fly-wheel to the machine or the engine to the steam-ship, the head-master is to the school. Discuss. (B. A. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৫৫-৫৬)

Q. 2. Describe the marks of a good teacher. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৫৬-৬১)

Q. 3. What are the functions of a teacher ? Why is he considred the most important in the educational system. (B. A. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৪৪-৫০)

Q. 4. "Teacher is essentially another name of influence." Show that the function of the teacher is to influence the child to personalise the impersonal experience which coustitute the conrse of study. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ১৪৪-৫০)

Q. 5. "The teacher should not merely be the fountain of facts or the working Encyclopaedia, but the guide, philosopher and friend to the young." Discuss. (B. A, 1960)

Ans. (পৃঃ ১৪৪-৫০)

Q. 6. Write short notes on—Parent-Teacher Association.

(B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৬২-৬৫)

Q. 7. How would you ensure parent-teacher co-operation in the education of the school pupil.

(B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৬২-৬৫)

Q. 8. During school hour the child is handed over to the care of the teacher who is not only responsible for giving instructions but also stands as a locoparent in the regulation of the child's conduct. Discuss fully the implications of the teacher's position visa vis his pupils and show whether this claim can be justified.

(B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৪৪-৫০)

Q. 9. Discuss the changing role of the teacher in modern educational system, specifying his duties and responsibilities.

Ans. (পৃঃ ১৪৪-৪৭)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই ধরণের শিক্ষক দেখা যায়। কেহ কেহ ছাত্রদের স্বাধীন কার্যে বাধা দিতে চান না; আবার এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ছাত্রদের স্বাধীন ইচ্ছা স্বভাবতই মন্দপথগামী মনে করিয়া কঠোর হস্তে তাহা দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর থাকেন। জ্ঞাতসারে হউক আর না হউক, দুই ধরণের শিক্ষক পৃথক পৃথক শিক্ষাদর্শনের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন মতদ্বৈধের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে রহিয়াছে পৃথক পৃথক জীবনদর্শনে বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ে কঠোর শৃঙ্খলার নীতি—দীর্ঘদিন হইতে শিক্ষাকে আমরা শাসন এবং দমনের সহিত সমার্থবাচক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। বাইবেলের গল্প অনুসারে মানুষের আদিমতম পুরুষ আদম (Adam) এবং ইভ্ (Eve) তাঁহাদের অন্তর্নিহিত পাপ-প্রবৃত্তির জন্য স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। আদিতম পুরুষের পাপ-প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে তাহার অন্তর্নিহিত মন্দ প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকেই টানিয়া লইবে। তাই টমাস্ একুইনাস্ (Thomas Aquinas) প্রভৃতি মধ্যযুগীয় খ্রীশ্চান শিক্ষাবিদ্গণ বাল্যকালেই কঠোর শাসন এবং নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা শিশুর "বিষদাঁত" ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই এখনও আমাদের দেশের মিশনারী বিদ্যালয়গুলি কঠোর শাসনের দ্বারা ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্তী রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। মানুষের মন স্বাভাবিক নিয়মেই যে অসৎ পথে ধাবিত হইতে চায় এ বিশ্বাস আমাদের দেশেও ছিল। আমাদের দেশের অনেক শাস্ত্রেই মানুষের মনের সৎ-অসতের দ্বন্দ্বকে দেবাসুরের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের মনে সৎ এবং অসৎ উভয় প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। দমন করিয়া রাখিতে না পারিলে সাধারণতঃ অসৎ প্রবৃত্তিই মানুষের মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। সংযমের দ্বারা, অভ্যাসের

দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সৎ প্রবৃত্তির প্রাধান্যের সুযোগ দেওয়ার নামই শিক্ষা বলিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাই প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত এবং ইন্দ্রিয় দমন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

উপরোক্ত জীবনদর্শনের প্রভাবের ফলে অভ্যাসের দ্বারা শিশুদের ব্যবহার বয়স্কদের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিন্‌ষ্টার কলেজের প্রবেশদ্বারের উপর আজও খোদিত রহিয়াছে, "Train up a child in the way he should go; when he is old he will not depart from it." অর্থাৎ শিশু যেভাবে চলিবে শিশুর মধ্যে সেই ধরণের অভ্যাস গঠন করাইয়া দাও, বয়স্ক হইলে ঐ অভ্যাস হইতে সে বিচ্যুত হইবে না। সংক্ষেপে শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালমন্দের বিচারের কথা চিন্তা না করিয়া বয়স্কদের ভালমন্দের বিচার অনুসারে তাহার অভ্যাস গঠন করিয়া তোল। বয়স্কদের যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করা উচিত শিশুকেও সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। শিশুর জীবনের চাহিদা স্বভাবতই বয়স্কদের জীবনের চাহিদা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া শিশুকে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী করিতে না পারিলে সে সাধারণতঃ বয়স্কদের অনুরূপ ব্যবহার করিবে বলিয়া আশা করা যায় না। শিশুর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলে না। পদে পদে তাহাকে বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। ফলে, শিক্ষা হইয়া দাঁড়াইল নেতিবাচক—বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর হইতেই শিশু কি করা উচিত নয় এসম্বন্ধেই উপদেশ পাইতে লাগিল; তাহার স্বাধীন প্রচেষ্টাকে বিদ্যালয়ের আইন-কানুনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দেখিতে পাইল। শিশুর যাহা ভাল লাগে তাহা সে করিতে পাইবে না, যাহা ভাল লাগে না তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। বিদ্যালয়ের কার্য সম্বন্ধে তাহার মনে এরূপ ধারণা জন্মিল। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই শিক্ষকদের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা যত বেশী সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাও তত ভাল হইতেছে ইহাই হইল সকলের ধারণা। বর্তমানে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরই মনে ঐরূপ ধারণা রহিয়াছে।

বিদ্যালয়ে অবাধ স্বাধীনতার নীতি—অপরদিকে সার্থক শিক্ষার

নিমিত্ত শিশুকে স্বাধীনতা দানের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাও প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অ্যারিস্টটল্ (গ্রীস) এবং কুইন্টিলিয়ান (রোমান) উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দানের নীতি সমর্থন করিতেন। বর্তমান যুগে বিদ্যালয়ে শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হইলেন রুশো। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষ "পুণ্যের" প্রতীক--"পাপ" প্রবৃত্তি মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে এবিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমাজই বরং পাপের প্রতীক—বয়স্কগণ কর্তৃক শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার ফলে তাহার মনে পাপ প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তাই রুশো শিশুকে সম্পূর্ণরূপে "ছাড়িয়া দেওয়ার" নীতি (Laissez-faire) প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষাদর্শনও বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি সমর্থন করিয়া থাকে। এই শিক্ষাদর্শনের মতে শিশুর মধ্যেই লুপ্ত ও অপ্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে তাহার আত্মার পূর্ণপরিণতি। শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই তাহার আত্মার বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়। তাই ফ্রবেল্, মণ্টসরী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ বাধ্যতামূলকভাবে শিশুকে দিয়া কোন কাজ করান সমর্থন করিতেন না। আত্মনক্রিয়তার (self-activity) দ্বারা শিশু শিক্ষালাভ করিবে ইহাই ছিল তাহাদের শিক্ষানীতি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি সমর্থন করে। ইহার মতে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রহিয়াছে। নিজ নিজ জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে শিক্ষালাভের চেষ্টা করিলে শিক্ষা প্রচেষ্টা সহজেই সার্থক হওয়ার সম্ভবনা থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি জানিবার জন্য টেস্ট (test) আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে উপরোক্ত ধারণা আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ফ্রয়েড্ সাহেবের প্রবর্তিত মনোবিক্ষণে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মতেও শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছাকে সহজে দমন করা উচিত নহে; কারণ স্বাভাবিক ইচ্ছা অবদমিত (repressed) হইলে মানসিক বিকৃতি দেখা দেওয়া সম্ভব। শিশুর-স্বাভাবিক ইচ্ছার নিবৃত্তি যত সহজে হইবে তাহার মানসিক স্বাস্থ্যও তত ভাল থাকিবে।

আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাও শিশু-স্বাধীনতার নীতি সমর্থন করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজ শিশুর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকেও স্বীকার করে। তারপর

গণতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে নিজেদের জীবন যথাসম্ভব নিজেরা পরিচালনা করার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের একনায়কত্বের প্রভাবে মানুষ হইলে, শিশু বড় হইয়া গণতান্ত্রিক সমাজে নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবে না।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী—বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাহাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলা নহে। ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ-জীবন উভয় ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক। শৃঙ্খলা মানুষের জীবনে ছন্দ ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম ব্যতীত মানুষ কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবোধ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে শিক্ষাকার্য গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মানো যায় এই বিষয়ে সর্বত্র আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা কি পরস্পর বিরোধী নহে? শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিমিত্ত, তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য এবং নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে তাহাদের শিক্ষা সার্থক করিবার জন্য যে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, কি করিয়া আমরা শিশুকে স্বাধীনতাও দিব অথচ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনেও অভ্যস্ত করিব।

স্বাধীনতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেই কিন্তু উপরোক্ত সমস্যার সমাধান আর কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নহে। কোন মানুষ স্বাধীন কি পরাধীন সে বিচার শুধু সে নিজেই করিতে পারে—স্বাধীনতা বা পরাধীনতা মানুষের নিজের উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। সহজ কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, আমাদের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির নিবৃত্তিতে কোন বাধা না পাইলেই আমরা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া মনে করি। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে নেতিবাচক (negative) সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয়—জীবনের চাহিদা পূরণে বাধা-নিষেধের

অবিদ্যমানতাকেই আমরা স্বাধীনতা আখ্যা দিতে পারি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা (বাধা-নিষেধ) পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষ যখন নিজের চেষ্টায় জীবনের চাহিদা নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হয় তখন তাহাকে স্বেচ্ছায় বাধা-নিষেধকে বরণ করিয়া লইতে হয়। সংসারে এমন কোন কাজ নাই যাহা নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা নহে। প্রকৃতি নিজেই নিয়মে বাঁধা। নিজেকে-নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন না করিয়া কেহ কোন কাজে সফলতা অর্জন করিতে পারে না—নিজের জীবনের চাহিদা নিবৃত্তি করিতেও মানুষকে স্বেচ্ছায় নিয়ম-শৃঙ্খলা বরণ করিয়া লইতে হয়। সিনেমা দেখিতে গিয়া নিতান্ত দুরন্ত বালকও দুই ঘণ্টা স্বেচ্ছায় চুপ করিয়া থাকে, কারণ সে অনুভব করে যে, বিপরীত ব্যবহার করিলে তাহার নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পথেই বাধা সৃষ্টি হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পথে বাধা পাইলেই মানুষ নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া মনে করে। কাজেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষ যখন স্বেচ্ছায় নিজের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং অনুভূতিকে সংযত করিয়া নিয়মানুগভাবে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার মনে স্বাধীনতার উপলব্ধি হয়; এবং ঠিক এই কারণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় নিজেকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে না পারিলে মানুষ নিজেকে পরাধীন মনে করে। বাধা-নিষেধ না থাকিলেই মানুষ স্বাধীন হয় না। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বাধীনতা একার্থবাচক নহে। উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা মানুষের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না; বরং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে উচ্ছৃঙ্খলতা বাধা সৃষ্টি করে; তাই উচ্ছৃঙ্খলতা পরাধীনতার নামান্তর। উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত শৃঙ্খলাকে বরণ করিয়া লইয়াই মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ফলে আত্মসংযম, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দ প্রায় একার্থবাচক—আত্মসংযম ব্যতীত মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব নহে। হুকুম (Order) এবং শৃঙ্খলা বা আত্মসংযম (Discipline) একার্থবাচক মনে করি বলিয়াই আমরা শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। হুকুম স্বাধীনতার পরিপন্থী ইহাতে সন্দেহ নাই। যে কাজে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই—হুকুমের দ্বারা আমাদিগকে সে কাজ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হয়; যে কাজের সহিত আমাদের জীবনের চাহিদার কোন সংযোগ থাকে না, সেই কাজ করিতেই আমাদের প্রবৃত্তির অভাব ঘটে। কাজেই হুকুমের দ্বারা আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি

হয়। হুকুম মান্য করিতে হইলে স্বাধীনতা খর্ব হইল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু (স্বতঃপ্রবৃত্ত) হইয়া শৃঙ্খলতা রক্ষা করিলে মনে বরং স্বাধীনতা উপভোগ করার অনুভূতি আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কেহ যদি কবিকে হুকুম করে যে, তাঁহাকে কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব হইল; আর তিনি যখন কবিতা রচনা করিতে গিয়া কবিতা রচনা করার "আইন-কানুন" মানিয়া চলিতেছেন তখন তিনি স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন। ঐরূপ আইন-কানুন মানিয়া চলায় ক্লেশের পরিবর্তে আনন্দের অনুভূতিই বেশী হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে এত কঠোরতা ছিল, ব্রহ্মচারীরা ইহাতে কিন্তু ক্লেশ বোধ করিতেন না। কারণ, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল মনে করিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় ঐ কঠোরতা বরণ করিয়া লইতেন; অনেক সময় সংযম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর হইতে আসিত বলিয়া ইহাতে মনে কোন কঠোরতার জ্ঞান আসিত না। ব্রহ্মচারীরা পরমানন্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেন।

এই ধরণের নিয়মের অনুবর্তনে মনে আনন্দ এবং ভঙ্গকরণে ক্লেশ জন্মায়। স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্ত সংযমের অপরিহার্য অঙ্গ। যখন স্বেচ্ছায় নিয়মের অনুবর্তন করা হয় তখন বাহির হইতে ঐ চেষ্টায় বাধা আসিলে স্বাধীনতা খর্ব হইল বলিয়া মনে হয়। ধরা যাউক, কোন ছাত্র আগ্রহ সহকারে স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের পাঠ প্রস্তুত করিতেছে, তখন যদি তাহাকে অভিভাবকের আদেশে বাজারে যাইতে হয় তবে তাহার স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে বলিয়া সে মনে করিবে। বস্তুতঃপক্ষে সংসারে এমন কোন কাজ নাই যাহা করিতে হইলে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয় না। যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না সে কোন কার্যেও সফলতা লাভ করিতে পারে না। তাই "পাগলের" দ্বারা কোন কাজ সম্ভব হয় না। কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা এবং ঐ কাজে সফলতা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করাকে পরস্পর হইতে বিযুক্ত করা সম্ভব নহে। স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হইতেছে ঐ কাজের শৃঙ্খলাকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া।

কাজেই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার মূল সমস্যা হইতেছে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জাগরিত করা; শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্যাকে কখনও পৃথকভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নহে। শৃঙ্খলা রক্ষা

করা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র, বিদ্যালয়ে উহার স্বকীয় কোন স্থান নাই। অনেক সময়েই আমরা এই নীতি বিস্মৃত হইয়া, কেবলমাত্র শৃঙ্খলা রক্ষাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে, কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিজ উদ্দেশ্যের প্রতিকূলতাচরণও করিয়া থাকে অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা বিদ্যালয়ের প্রতি-ছাত্রের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেই। বিদ্যালয়ের কাজে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ না থাকিলে ঐ কাজের জন্য প্রবর্তিত শৃঙ্খলা রক্ষা করার কোন প্রবৃত্তিও তাহাদের থাকিতে পারে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে "হুকুমের" (order) দ্বারা শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিতে হয়, এবং শাসন এবং পুরস্কারের সাহায্যে ঐ শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ঐ ধরণের শৃঙ্খালকে বহির্জাত শৃঙ্খলা এবং প্রথমোক্ত শৃঙ্খলাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বহির্জাত শৃঙ্খলা স্বাধীনতার পরিপন্থী। যে কাজে ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বহির্জাত শৃঙ্খলা তাহাদিগকে ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়া যে কাজে তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই উহাতে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করে। তাই উহা ছাত্রদের নিকট শৃঙ্খলাস্বরূপ মনে হয়। জেলখানার কয়েদী বা যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা বহির্জাত শৃঙ্খলা—উহা স্বাধীনতার বিপরীত এবং দাসত্বের সমতুল্য ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ে আমরা ঐ ধরণের শৃঙ্খলা দেখিতে আশা করি না—বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হইবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। হাক্সলি (Aldous Huxley) বলিয়াছেন যে, স্বাধীন হইতে এবং নিজেকে নিজে শৃঙ্খলার অনুগামী করিবার কৌশল মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে ("teach people the arts of being free and governing themselves")। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা স্বাধীনতার পরিপূরক—নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলার অনুবর্তী হইতে কোন বহিঃস্থ শক্তি বাধা দিলে তাহাকেই বরং স্বাধীনতার হরণকারী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। টি, এইচ, গ্রীন (T. H. Green) বলিয়াছেন, যে মানুষ নিজের কৃত আইন নিজে মান্য করিয়া চলিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করে সেই প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন ("That man is free who is conscious of himself as the author of the law which he obeys.")।

শিশুকে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে দেওয়া বা তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে

শাসন বা পুরস্কারের সাহায্যে দমন করা কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বাধীনতা এক নহে। শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের চাহিদা প্রভৃতি এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের কাজ এবং তাহার ইচ্ছার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য এক হইলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার অনুবর্তন করিবে। প্রাচীন ভারতে গুরু এবং শিষ্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলিয়া গুরুর আদেশ অনুযায়ী অতি কঠোর শৃঙ্খলার অনুবর্তনও শিশুরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে করিত। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের জীবনের চাহিদা তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অনেক পরিমাণেই শিক্ষালব্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অঙ্ক, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সৃষ্টি করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের আদর্শকে ছাত্রদের অন্তরে প্রোথিত করিয়া দিতে পারিলে এবং তাহাদের চরিত্রকে গঠন করিয়া দিতে পারিলে ছাত্রেরা নিজের চেষ্টায়ই উচ্ছৃঙ্খলতার পথ পরিত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ের আইন-কানুন প্রণয়নে এবং উহাদের মানিয়া চলার কার্যে ছাত্রেরা যতবেশী অংশ গ্রহণ করিবে ততই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বহির্জাত না হইয়া অন্তর্জাত হইবে। পাঠ-সংক্রান্ত বিষয়ই হউক বা অন্য কোন বিষয়ই হউক বিদ্যালয়ের সব নিয়মেরই ছাত্রদের আন্তরিক সমর্থন লাভ করা আবশ্যক। নিয়ম মান্য করিয়া চলিবার দায়িত্বও ছাত্রদিগের উপর ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে ন্যস্ত থাকিবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বলিতে আমরা বুঝি :

১। অন্তর্জাত শৃঙ্খলাই প্রকৃত শৃঙ্খলা ; স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা একার্থবাচক। এই ধরণের শৃঙ্খলায় মানুষ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কাজে ব্রতী হয় এবং উহা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উহার অপরিহার্য বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলে।

২। প্রকৃত শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতাকে বিযুক্ত করা সম্ভব নহে—একটি ব্যতীত অপরটি সার্থক হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা বিরাজ করিবে। একের বদলে অপরকে লাভ করিতে চেষ্টা করিলে কাহাকেও

প্রকৃতরূপে পাওয়া যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না; আবার শাসন বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কাহাকেও নিয়ম মানিতে বাধ্য করাও উচিত নহে।

৩। বহির্জাত শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা নানাদিকে ক্ষতিকারক। ইহা শিক্ষার পরিপন্থী; কাজেই বিদ্যালয়ে ঐ ধরণের চেষ্টা সর্বদা পরিহার্য।

৪। শিক্ষার সাহায্যে বহির্জাত শৃঙ্খলাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় পরিবর্তন করা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্যা প্রধানতঃ যথাযথ শিক্ষাদানেরই সমস্যা। যথাযথ শিক্ষার ফলে শৃঙ্খলা ছাত্রদের অন্তর্জাত হইবে ইহাই আশা করা হয়।

শাস্তি ও পুরস্কার

অতি প্রাচীনকাল হইতেই শাস্তি এবং পুরস্কার শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষকের হাতের দুইটি বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই ইহা বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, শিশুদের পক্ষে যে কার্য করা বাঞ্ছনীয় তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি নাই; যাহা তাহাদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় তাহাদের দিকেই তাহারা (যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া) আকৃষ্ট। একমাত্র শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে তাহাদিগকে বাঞ্ছিত কাজে প্রবৃত্ত করান কিছুটা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি অথবা শিশুদের জন্মগত স্বভাব ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখি না। শিশু যে আদিতম মানুষের "পাপ" লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা তাহার জন্মগত সকল প্রবৃত্তিই (Instincts) যে মন্দ একথা আমরা বর্তমানে বিশ্বাস করি না। প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ত্রুটির ফলে শিশুদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখিতে পাই। বিদ্যালয়ের ত্রুটি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যেও যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। ধরা যাউক, পাঠ্যবিষয়গুলি পাঠে (ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি) ছাত্রদের যে জন্মগত কোন বিতৃষ্ণা আছে এমন নহে; নানা কারণে বিদ্যালয় তাহাদিগকে ঐ সব বিষয় পাঠে আকৃষ্ট করিতে পারে না বলিয়াই ঐ ধরণের বিতৃষ্ণা তাহাদের মনে জন্মিয়া থাকে। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ছাত্রেরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে চায় না। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে যে এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায় তাহা কুশিক্ষার ফল; সুশিক্ষার সাহায্যে

তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের ব্যবহারের পরিবর্তন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই এই সমস্যা সমাধানের সহজতর পন্থা হিসাবে শাস্তি এবং পুরস্কারকে ব্যবহার করিতে বিদ্যালয় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই পন্থা অবলম্বনে অনেক ক্ষেত্রে আশু ফল লাভ হয় বলিয়া শিক্ষকেরা ইহা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। কিন্তু ঐ পন্থায় যে ফল লাভ হয় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না; অধিকন্তু শাসন ও পুরস্কার প্রয়োগ করিলে আরও অনেক দিকে যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয় ইহা শিক্ষকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন না।

শুধু বিদ্যালয়ে কেন, বৃহত্তর সমাজেও মানুষের অবাঞ্ছিত ব্যবহারকে বাঞ্ছিত ব্যবহারে পরিবর্তন করার সমস্যা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই নানারূপ দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা প্রত্যেক সমাজেই রহিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে যে, দণ্ডের দ্বারা মানুষের ব্যবহারের স্থায়ী পরিবর্তন হয় না। একবার চুরি করিয়া যাহার জেল হয় সে মুক্ত হইয়া পুনরায় চুরি করিয়া থাকে। দণ্ডের ভয়ে কোন অবাঞ্ছিত কাজ হইতে মানুষ নিবৃত্তও হয় না। মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও "খুন" করা কোন সমাজেই বন্ধ হয় নাই। একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া বর্তমানে জেলখানার কয়েদীদের সম্বন্ধেও ভিন্ন নীতি গ্রহণের আন্দোলন চলিতেছে।

আর বিদ্যালয়, যাহা শিক্ষার ক্ষেত্র, সেখানে কি এখনও আমরা জেলখানার নীতি চালাইব? শাস্তি এবং পুরস্কার বলিতে আমরা কি বুঝি এবং উহাদের প্রয়োগের ফলে শিশুর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ইহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

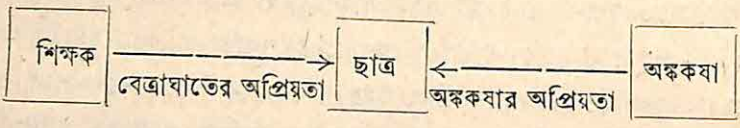
কৃত্রিম উপায়ে শাসিতকে ক্লেশ দানই শাস্তির উদ্দেশ্য। মানুষ স্বভাবতঃ ক্লেশ পরিহার করিতে চায়—এই বিশ্বাস হইতেই শাস্তিদানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ তিন প্রকারে আমরা ছাত্রদের ক্লেশদানের চেষ্টা করিয়া থাকি ১। শারীরিক ক্লেশ, ২। মানসিক ক্লেশ, ৩। শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরণের ক্লেশের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ চড়চাপড়, কানমলা, বেত ইত্যাদির দ্বারা ছাত্রদের শারীরিক ক্লেশ প্রদানের চেষ্টা করা হয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, মানুষ সহজেই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; ফলে,

শারীরিক শাস্তিতে ক্লেশের অনুভূতি বার বার প্রয়োগের ফলে কমিয়া যায়। তাই শিক্ষককে সব সময়েই কঠোর হইতে কঠোরতর শারীরিক ক্লেশদানের পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে হয়। ধরা যাউক, যখন দেখা গেল যে, কেবলমাত্র দাঁড় করাইয়া রাখায় ছাত্রের আর যথেষ্ট ক্লেশ বোধ হইতেছে না, তখন তাহাকে হয়ত নাড়ুগোপাল ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে বলা হইল; আরও কঠোরতর ক্লেশদানের জন্য ইহার পর তাহাকে হয়ত পা ফাঁক করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দুহাতে দুখানা থান ইট লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে নানারূপ শারীরিক ক্লেশদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল—উহাদের বর্ণনা পড়িতেও গা শিহরিয়া উঠে। বর্তমানে শিশুকে বিশেষ শারীরিক ক্লেশদানের অধিকার শিক্ষকের নাই। ফলে, প্রচলিত শারীরিক শাস্তিগুলি সহজেই ছাত্রদের অভ্যস্ত হইয়া পড়ে বলিয়া আর তেমন কার্যকরী থাকে না।

অনেক সময় মানসিক ক্লেশ শারীরিক ক্লেশ অপেক্ষা তীব্রতর হয় এবং মানসিক ক্লেশদানের পদ্ধতিতে অধিকতর উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ থাকে। মানসিক ক্লেশদানের ক্ষেত্রে সমাজ এখনও শিক্ষকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় নাই। দৈহিক ক্লেশদানের ফলে শরীরের ক্ষতি হইলে তাহা চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু মানসিক ক্লেশদানের ফলে মনের ক্ষতি হইলে তাহা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। ফলে, মানসিক ক্লেশদানে কেহ খুব গুরুতর আপত্তি করেন না। তাই বিদ্যালয়ে বর্তমানে মানসিক শাস্তিদানের প্রথাই অধিকতর প্রচলিত। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের মানসিক শাস্তি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হয়—

১। সকলের সমক্ষে ছাত্রকে অপদস্থ করা বা তাহার ব্যবহারকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করা। ২। ছাত্রের কামনার বস্তু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা (খেলা করিতে না দেওয়া)। ৩। শিক্ষকের সমর্থন হইতে ছাত্রকে বঞ্চিত করা—সে যে শিক্ষকের স্নেহ এবং সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে—তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। ৪। একঘরে করণ—শিক্ষকের নির্দেশে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রেরা অপরাধী ছাত্রকে একঘরে করিয়া রাখিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ক্লেশের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক সময় দৈহিক এবং মানসিক শাস্তি একই সঙ্গে দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে একত্রিত করিয়া অপরাধী ছাত্রকে বেত্রাঘাত করা হইল বা শ্রেণীকক্ষের বাহিরে তাহাকে কান ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল।

শাস্তির প্রতিক্রিয়া—শাস্তি প্রদানকালে ছাত্রের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। শিক্ষক ছাত্রকে দিয়া যে কাজ করাইতে চাহেন তাহা তাহার নিকট অপ্রীতিকর (দৃষ্টান্ত—অঙ্ক কষা)। তাই তিনি শাস্তিদানের ভয় (বেত্রাঘাত) দেখাইয়া ছাত্রকে ঐ কাজ করিতে বাধ্য করিতে চান। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্র দুইটি বিপরীতগামী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া বিব্রত বোধ করে। নিম্নে প্রদত্ত নক্সাটি অনুধাবন করুন।



অঙ্ককষার ছাত্রের নিকট অপ্রীতিকর, তাই উহার অপ্রিয়শক্তি তাহাকে ঐ কাজ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে। অপরদিকে বেত্রাঘাতও তাহার নিকট ক্লেশদায়ক তাই উহার অপ্রিয়শক্তি তাহাকে কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।

১। বলাবাহুল্য যে, ছাত্রকে লইয়া এই টানাটানিতে দুইটি অপ্রিয়শক্তির মধ্যে যেটি অধিকতর ক্লেশদায়ক তাহারই জয় হইবে। যেমন, অঙ্ককষা ছাত্রের নিকট খুব অপ্রিয় না হইলে বেত্রাঘাতের ক্লেশ এড়াইবার জন্য অঙ্ককষার ক্লেশ সে স্বীকার করিয়া লইবে। তাই অনেক সময় শিক্ষক শাস্তি প্রদান করিয়া সফলকাম হন এবং শাস্তির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নিজেকে ছাত্রের নিকট অধিকতর অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়া শিক্ষক আপাততঃ তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিলেন বটে কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে অধিকতর অপ্রিয় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠার ফলে শিক্ষাদানকার্য তাঁহার পক্ষে সহস্রগুণে কঠিন হইয়া পড়িল। তারপর শাস্তির ভয়ে কাজ করিতে ছাত্রেরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, কোন কাজেই তাহাদের আর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থাকিবে না। শুধু বিদ্যালয়ে নহে, সারাজীবন ব্যাপিয়াই এই বদভ্যাস তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকিবে। বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজ করিয়া তাহাতে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা যায় না।

২। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ ছাত্রের নিকট এত অপ্রিয় যে, সে শাস্তির ক্লেশকে বরণ করিয়া লয়। ঐ সব ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান করিয়াও শিক্ষকেরা আশানুরূপ ফল পান না। লাভের মধ্যে ছাত্রেরা শাস্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে

এবং তাহাদের চরিত্রের অধোগতি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দিনের পর দিন শিক্ষক ছাত্রকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে দাঁড় করাইয়া রাখিতেছেন তবু সে বাড়ী হইতে পড়া তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষক শাস্তির পরিমাণ এবং নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করিয়া অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের অবনতি এবং শিক্ষকের চরিত্রের-ও অধোগতি হয়।

৩। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র অপ্রীতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্লেশ এবং শাস্তি পাওয়ায় ক্লেশ উভয়কেই এড়াইতে চেষ্টা করে; এই উদ্দেশ্যে সে নানা ধরণের প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন শিক্ষকের প্রধান কাজ হয় ছাত্রের প্রতারণা ধরিয়া ফেলা এবং প্রতারণার জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা। এই অবস্থায় ছাত্র এবং শিক্ষক প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। যে কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা গৌণ হইয়া শিক্ষক-ছাত্র দ্বন্দ্ব প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাক, ছাত্র জানে যে, বাড়ীর অঙ্ক কষিয়া না আনিলে ক্লাশে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বাড়ীতে অঙ্ক কষা তাহার নিকট ক্লেশদায়ক। তাই কোন ছাত্রের খাতা হইতে অঙ্ক নকল করিয়া ক্লাসে সে দাঁড়াইয়া থাকিবার শাস্তি এড়াইতে চেষ্টা করে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সব ছাত্র নকল করিয়া অঙ্ক লইয়া আসিয়াছে তাহাদের প্রতারণা ধরিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে দুষ্ট হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে শাস্তি এড়াইবার চেষ্টায় ছাত্রদের মধ্যে অনেক ধরণের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয় (মিথ্যা কথা বলা, নকল করা, ক্লাশ হইতে পালানো ইত্যাদি)।

শাস্তিপ্রদানের নীতি—শাস্তিপ্রদান ছাত্রদের মধ্যে যে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সমাজ ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আদর্শানুগ হইলে শাস্তিদানের কোন প্রয়োজন থাকে না। ছাত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়ই বাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত হইবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ; বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শিশুর মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়কেও কোন প্রকারেই আদর্শ বলা চলে না—উহার দোষ-ত্রুটির জন্যও ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় হইতে শাস্তিপ্রদান সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়ত সম্ভব নহে।

কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির দ্বারা যে আশু ফললাভ হয় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শাস্তিপ্রদানকে necessary evil হিসাবে কখনও কখনও ব্যবহার করিলেও শাস্তিপ্রদানের কুফল সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্তি-প্রদানকালে আমাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—

১। শাস্তিপ্রদানের দ্বারা সাময়িকভাবে মাত্র সমস্যার সমাধান করা চলিতে পারে। শাস্তিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের মূল কারণ বাহির করিয়া তাহা দূর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাস্তি প্রদানের দ্বারা ছাত্রকে একদিকে যেমন অঙ্ক কষিতে বাধ্য করা হইবে, অপর দিকে ঐ কাজে তাহাকে এরূপ সাহায্য দিতে হইবে যাহাতে অঙ্ক কষা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। অঙ্ক কষিতে যেন সে আনন্দ পায়।

২। "বাঞ্ছিত কাজ" ছাত্রের নিকট কি পরিমাণে অপ্রীতিকর এবং পরিকল্পিত শাস্তিই বা তাহার নিকট কতখানি ক্লেশদায়ক তাহা পূর্বেই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্তির দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের সম্ভাবনা না থাকিলে শাস্তিপ্রদান না করাই উচিত। কারণ শাস্তি গ্রহণের দ্বারা ছাত্রের চরিত্রের অধোগতি ঘটে।

৩। শারীরিক শাস্তি অধিকতর নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়; ইহা শিশুর মনের কোমল প্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে অনেকখানি পশুর স্তরে নামাইয়া লইয়া আসে। অনেক সময় ইহা অভিভাবক এবং শিক্ষকের মধ্যেও অপ্রীতিকর সম্বন্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তারপর ছাত্রেরা সহজে শারীরিক শাস্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু শারীরিক শাস্তি শিশুকে ভীরু ও দুর্বলচরিত্র করিয়া তোলে। তাই শারীরিক শাস্তিবিধান পরিহার করিয়া চলাই উচিত।

৪। মানসিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা নানাদিক দিয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহাও যে মানসিক বিকাশের গুরুতর ক্ষতি করিতে পারে একথা মনে রাখিতে হইবে। ঐ ধরণের শাস্তিবিধানের ফলে ছাত্রদের মানসিক নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৫। শাস্তিবিধানকালে শিক্ষককে সাধ্যমত নৈর্ব্যক্তিক (objective) থাকিতে হইবে। শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি শাস্তিবিধান করিতেছেন নিজের খেয়ালখুসী তৃপ্তির জন্য নহে। শাস্তিপ্রদানকালে তাঁহাকে নিজেকেও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে; একই অপরাধের জন্য কাহাকেও গুরুতর শাস্তি, কাহাকেও অল্প শাস্তি

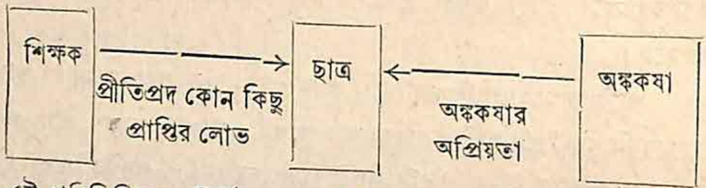
দেওয়া চলিবে না। কোন্ অপরাধের জন্য কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা পূর্ব হইতে সকলেরই জানা থাকিলে শাস্তির বাধ্যতামূলক শক্তি বৃদ্ধি পায়; শিক্ষক ছাত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত শাস্তিপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন এইরূপ মনে করিলে শাস্তিপ্রদানের দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত কম তিক্ত হয়। শাস্তিপ্রদান শিক্ষকের "মর্জির" উপর নির্ভর করে এরূপ ধারণা ছাত্রদের মনে সৃষ্ট হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

৬। শাস্তিপ্রদানকালে শিক্ষক নিজে কখনও রাগান্বিত হইবেন না। ছাত্রের উপকারের নিমিত্ত তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি শাস্তি দিতেছেন না। শাস্তির দ্বারা তিনি ছাত্রকে যে ক্লেশ দিতেছেন তাহার জন্য তাঁহার মনেও কষ্ট হইতেছে—কিন্তু ছাত্রের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি তাহাকে এই সামান্য ক্লেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন—এইরূপ মনোভাব লইয়া শাস্তিপ্রদান করিলে শাস্তিপ্রদানের ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের তেমন ক্ষতি হয় না।

৭। কোন্ অপরাধের জন্য কোন্ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা পূর্বে নির্দিষ্ট থাকিলেও কখনও কখনও স্থান, কাল, পাত্রভেদে শাস্তিপ্রদান-ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে হইতে পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মনে যাহাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা না জন্মায় তাহার জন্য তাহাদের নিকট ঐ তারতম্যের কারণ ব্যক্ত করা আবশ্যক। শাস্তিদানে শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন ছাত্রদের মধ্যে ঐরূপ ধারণা জন্মানো অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিদ্যালয়ে পুরস্কারের স্থান—অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শাস্তির ন্যায় শিক্ষকেরা পুরস্কারের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। শাস্তির মত পুরস্কারও তিন রকমের হইতে পারে—দৈহিক, মানসিক এবং দৈহিক ও মানসিক পুরস্কারের সংমিশ্রণ। বিদ্যালয়ে শাস্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে যেরূপ জনমতের সৃষ্টি হইয়াছে পুরস্কার প্রদানের বিরুদ্ধে এখনও কিন্তু তেমন হয় নাই। বরং পুরস্কার প্রদানকে শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্তিপ্রদানের প্রতিক্রিয়া এবং পুরস্কার প্রদানের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু খুব বেশী পার্থক্য নাই। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কাজে ছাত্রের স্বাভাবিক রুচি নাই—কাজের অপ্রিয়তা ছাত্রকে কাজ হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, আর শিক্ষক পুরস্কারের

প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। ছাত্র পরস্পর বিপরীতগামী যে দুইটি শক্তির মাঝখানে পড়ে তাহাদের একটি তাহার নিকট প্রীতিকর এবং অপরটি তাহার নিকট অপ্রীতিকর (শাস্তির ক্ষেত্রে উভয়শক্তিই ছাত্রের নিকট অপ্রীতিকর)। ছাত্রকে হয় অপ্রীতিকর কাজে লিপ্ত হইতে হইবে আর না হয়ত প্রীতিকর কোন কিছুর লোভ ত্যাগ করার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে।



এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্লেশ, প্রদত্ত পুরস্কারের লোভ ত্যাগ করিবার ক্লেশ হইতে অল্প হইলে ছাত্র নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরস্কারের প্রলোভন ত্যাগ করার ক্লেশ খুব তীব্র হয় না বলিয়া পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া কার্যোদ্ধার হয় না। পুরস্কার অপেক্ষা শাস্তির কার্যকরী শক্তি বেশী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্তিপ্রদানের ফলে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ যেরূপ তিক্ত হইয়া পড়ে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষক ক্লেশদায়ক শক্তির পরিবর্তে প্রীতিপ্রদ শক্তির প্রতীক। কাজেই শাস্তি এবং পুরস্কারের মধ্যে পুরস্কারের প্রয়োগই যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরস্কার প্রদানের সর্বাপেক্ষা বড় গলদ হইতেছে এই যে, ইহার লোভে ছাত্রেরা প্রতারণা শিক্ষা করে। শিক্ষক-নির্দিষ্ট কাজের অপ্রিয়তাকে বরণ করিয়া না লইয়া সে প্রতারণার সাহায্যে পুরস্কার লাভ করিতে চেষ্টা করে। আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ বিদ্যালয়ে শাস্তি বা পুরস্কার কোনটিরই স্থান নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরস্কার প্রদানকে necessary evil রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরস্কার প্রদানকালে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে—

১। মনে রাখিতে হইবে শাস্তির মত পুরস্কারও অভীষ্টলাভের অস্থায়ী পন্থা মাত্র। চেষ্টা করিতে হইবে যে, ধীরে ধীরে ছাত্র যেন পুরস্কারের লোভ ব্যতীত ও কাজে লিপ্ত হয়—তাহার নিকট কাজ যেন অপ্রিয় না হইয়া প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।

২। অল্পস্বল্প পুরস্কার প্রদানে কার্যোদ্ধার হইতেছে না দেখিয়া পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রদের লোভী করিয়া তোলা সঙ্গত নহে।

৩। পুরস্কার প্রদানকালে শিক্ষক এমনভাবে চলিবেন যাহাতে ছাত্রেরা তাহাকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট মনে না করিতে পারে। এই বিষয়ে সাবধান হইলেই পুরস্কার প্রদানের ফলে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ তিক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পুরস্কার প্রদানের ফলে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধেরও যেন কোন ক্ষতি না হয়। তাই একজনকে পুরস্কার দেওয়ার ছলে অপরকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক সময় শিক্ষক কোন ছাত্রের প্রশংসার মূল্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্য কোন কোন ছাত্রের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া থাকেন। ফলে, যাহা একটি ছাত্রের নিকট পুরস্কার তাহা আর কয়েকটি ছাত্রের নিকট শাস্তি। ইহার ফলে ছাত্রদের মধ্যে ঈর্ষা এবং ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করাও ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ উৎসব—আমাদের দেশের সকল বিদ্যালয়ই এখনও পুরস্কার বিতরণ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রায় সকল বিদ্যালয়ই বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম তিনটি স্থান অধিকারকারী ছাত্রকে পুস্তক বা অনুরূপ কিছু পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করিয়া থাকে। অনেক বিদ্যালয় আছে যাহারা শুধু পাঠের ক্ষেত্রেই নহে, বিদ্যালয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সব ছাত্র শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারে তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকে (খেলা, সমাজসেবা ইত্যাদি)। ছাত্র কোনও একটি বস্তু পুরস্কার হিসাবে (বই, কলম ইত্যাদি) লাভ করে, আবার সভায় দশজনের সামনে ঐ পুরস্কার বিতরণ করা হয় বলিয়া তাহার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে, পুরস্কার লাভের লোভ তীব্রতর হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, ঐরূপ পুরস্কার দানের দ্বারা ছাত্রদের পাঠে উৎসাহ দেওয়া হয়—পুরস্কারলাভের লোভে তাহারা পাঠের ক্লেশকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে, ইহাই প্রত্যাশা। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন শ্রেণীর ছত্রদের মধ্যে (৪০,৮০, বা ১২০ ছাত্রের মধ্যে) ৯।১০টি ব্যতীত অপরে উপরোক্ত ধরণে পুরস্কার বিতরণের দ্বারা পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে না। যে ছাত্র পরীক্ষায় সাধারণতঃ নবম, দশম স্থানও অধিকার করিতে পারে না, সে কখনও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানের মধ্যে কোনটি অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতে পারে না। তাই পুরস্কার বিতরণের দ্বারা শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্র ব্যতীত অপরাপর ছাত্রেরা পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে না। তারপর পুরস্কার

বিতরণ "ভাল" ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার সৃষ্টি করে। সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনে ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা অনুকূল নহে। ঐ ধরণের পুরস্কার বিতরণের পরিবর্তে ছাত্রদের যদি আত্মোন্নতির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা হইলে সকল ছাত্রই পাঠে উৎসাহ পাইতে পারে—অর্থাৎ যে-কোন ছাত্র যদি পূর্ব বৎসরের পরীক্ষার ফল অপেক্ষা পরের বৎসরের পরীক্ষার ফল ভাল করিতে পারে (ঠিক কতখানি ভাল করিলে পুরস্কার পাইবে তাহা অবশ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে) তাহা হইলে সে পুরস্কার পাইবে, তা সে শ্রেণীতে প্রথমই হউক আর সকলের নীচেই হউক। এইরূপভাবে পুরস্কার বিতরণ করিলে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষার সৃষ্টিও হয় না।

অনুশীলনী

Q. 1. Write an essay on "Free Discipline". (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৬৭-১৭৫)

Q. 2. "Discipline is not an external thing like order, but touches the inmost spring of conduct". Explain and indicate the educational implication of the statement. (B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৬৭-১৭৫)

Q 3. What is the place of discipline in child-centre education. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৬৯-১৭৫)

Q. 4. What do you understand by "free discipline" and what is its place in school? (B. A. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৭০-১৭৫)

Q. 5. What are the ostensible aims of punishment? Discuss the value of standard forms of punishments in school. (B.T. 1952)

Ans. (পৃঃ ১৭৬-১৮০)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলী

(Co-curricular activities)

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কার্যাবলীর বিদ্যালয়ে স্থান—শিক্ষা সম্বন্ধে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে বিদ্যালয়কে আমরা শুধু জ্ঞান (knowledge) লাভের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়া থাকি। জ্ঞানদানই বিদ্যালয় তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে (যাহা দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়) ছাত্রেরা কোন্ কোন্ বিষয় পাঠ করিবে তাহার তালিকা ভিন্ন আর কিছু থাকে না। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের কার্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শিশুর বিকাশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে চলে না। তাই জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়কে অন্ততঃ কিছুটা শরীরচর্চা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। তারপর, গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে দেখা গেল যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তুলিতে হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়েই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছুটা অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। ফলে বিদ্যালয়ে বিতর্কসভা ইত্যাদির আয়োজন হইতে আরম্ভ করিল, এবং শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বিদ্যালয় জীবন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কিছুটা ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এদিকে ধর্ম এবং পরিবারের প্রভাব আমাদের জীবনে যত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল, ততই বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইতে আরম্ভ করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের বিখ্যাত "পাবলিক স্কুল"গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া দিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ছাত্রদের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে খেলাধূলা, নানাধরেণর যুব আন্দোলন (বয়স্কাউট) ইত্যাদি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিল। তারপর দেখা গেল যে, সমাজজীবনে প্রবেশ করিয়া লোকে যদি যথাযথভাবে অবসর সময় না যাপন করে তবে তাহাদের জীবনের সকল সুশিক্ষা নষ্ট হইয়া কুশিক্ষায় পরিণত হয় (তাহাদের মদ্যপান ইত্যাদি কদভ্যাস

জন্মায়)। তাই আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, বিদ্যালয়কে "অবসর বিনোদনের জন্য শিক্ষা" (Education for Leisure) দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনও অনুভূত হইল। তাই বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি স্থান পাইল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে নানাধরণের কর্মের স্থান হইলেও পঠন-পাঠনই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া রহিল। বিদ্যালয়ের কাজগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইতে লাগিল—পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্ম (Curricular activities) এবং পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম (Extra-Curricular activities)। পাঠ্যক্রমে পঠনীয় বিষয়ে নির্দেশ থাকে বলিয়া পঠন-পাঠনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত অপরাপর সকল কর্মকেই পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত কর্মগুলি প্রথমোক্ত কর্মগুলির মত তত সুনির্দিষ্ট থাকে না; বিদ্যালয়ের 'টাইম-টেবল (Time-table)-এর মধ্যে ইহারা স্থানও পায় না; সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের "ছুটির" পর ঐসব কাজের জন্য সময় দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কাজগুলি সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয় না। পঠন-পাঠনই বিদ্যালয়ের প্রকৃত কর্ম। যথাযথভাবে পঠন-পাঠন করাইয়া সময় পাইলে তবেই ঐ অতিরিক্ত (Extra) কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে "পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম"গুলি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে পারিলে, তাহাদের চরিত্র গঠিত করিতে পারিলে এবং যাহাকে আমরা পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্ম বলি তাহাতে উহাদিগকে লিপ্ত করিতে পারিলে পঠন-পাঠনেও সাহায্য হয়। তাই ঐ কাজগুলিকে পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কাজ না বলিয়া পাঠ্যক্রমের পরিপূরক (Co-curricular) কাজ আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে ঐসব কাজের কোন কোনটি বিদ্যালয়ের টাইম টেবিলের অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। (যেমন, শরীর-চর্চা)।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পর হইতে শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে পাঠ্যক্রমে পরিপূরক কাজগুলির বিদ্যালয়ে স্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার

আরও প্রগতিশীল হইয়াছে। বর্তমানে আমরা 'সামগ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গী (Whole approach) লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকি। বিদ্যালয়ের সকল অভিজ্ঞতাই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত। বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা ছাত্রের নিকট শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র পঠন-পাঠনই শিক্ষালাভের উপায় নহে। শ্রেণীকক্ষের বাহিরের কাজের গুরুত্ব শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের গুরুত্ব অপেক্ষা কম নহে। পঠন-পাঠন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে (বিষয়কেন্দ্রিক নহে), পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিদ্যালয়ে ছাত্র যতরকম কর্মে লিপ্ত হইবে তাহার ইঙ্গিত থাকে। ছাত্রদিগকে যে সব অভিজ্ঞতা প্রদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে (তাহা পঠন-পাঠন-সংক্রান্ত হউক আর না হউক) বিদ্যালয়ের সময়ের ভিতরেই তাহাদের স্থান করিয়া দিতে হইবে—তাহারা টাইম-টেবলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যে কোন বিষয়েই ছাত্রকে অভিজ্ঞতা দেওয়া হউক না কেন, ঐ অভিজ্ঞতা হইতে সে আশানুরূপ ফল পাইল কিনা তাহাও পরিমাপ করিয়া দেখিতে হইবে। তাই বর্তমানে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে বিদ্যালয়ের সকল কাজেরই—(পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত) ফলাফল লিপিবদ্ধ (পরীক্ষা করিয়া) করার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রের শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই অর্থপূর্ণ (Significant) এবং তাহারা এমনভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে, একেকে অবহেলা করিয়া অপরের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মগুলির আবশ্যকতা—উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের জন্মাইয়াছে। এই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির সাহায্যে নিম্নলিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

১। এই কাজগুলি নানাভাবে শরীর-চর্চার সুবিধা করিয়া দিয়া ছাত্রদের শারীরিক বিকাশে সাহায্য করে। এমনকি ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কাজ আছে যাহারা বিশেষভাবে শারীরিক বিকাশের জন্যই প্রবর্তিত হইয়া থাকে (ব্যায়াম ইত্যাদি)।

২। নানাবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং নানা দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিয়া এই কাজগুলি ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে (নেতৃত্ব, সহযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা ইত্যাদি)। যখনই যে কাজ প্রবর্তন করা হয় তখনই ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলীর উপর উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

৩। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক বিভিন্ন ধরণের কাজে বিভিন্ন রূপ আত্ম-অভিব্যক্তির (Self-expression) সুযোগ থাকে বলিয়া এবং ইহাদের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা (need) নিবৃত্ত করিবার সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়া ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental health) রক্ষা করায় ইহারা বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে; এমন কি, অনেক সময় ছাত্রদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার পরিবর্তনে এই সব কাজ বিশেষ কার্যকরী হয়।

৪। ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিতেও ঐ সব কাজের অবদান প্রচুর। ঐ সব কাজ ব্যতীত বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি যথাযথভাবে স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।

৫। ঐ সব কাজ বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণবৃদ্ধি করে। জীবনে আনন্দ থাকিলে তাহা সকল কাজেই প্রতিফলিত হয়; ঐ সব কাজের আনন্দ পঠন-পাঠনে সংক্রামিত হইয়া উহার একঘেয়েমি হ্রাস করে।

৬। ঐ সব কাজ (বিশেষ করিয়া যুব আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা) ছাত্রদের মধ্যে আদর্শবাদ এবং জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

৭। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশে ঐ সব কাজ সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা জানি যে, চর্চার সুযোগের অভাবে, ক্ষমতা বা আগ্রহ জন্মগত হইলেও তাহা অবদমিত হইয়া থাকিতে পারে এবং বিধিবদ্ধ চর্চার সুযোগ পাইলে তাহারা শুধু বিকশিত নহে বৃদ্ধিও পাইতে পারে। "পাঠ্যক্রমের পরিপূরক" কাজগুলির দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়।

৮। ঐসব কাজের সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের একাত্মবোধ জাগ্রত হয় (প্রার্থনা সভা, বিদ্যালয়-সঙ্গীত ইত্যাদি)।

৯। ঐ সব কাজ ছাত্রদের জ্ঞানলাভের সাহায্যও করে।

১০। বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা (Desirable Experience) এবং শিক্ষা যদি সমার্থবাচক হয় তাহা হইলে পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্মের মাধ্যমেও ছাত্রদের

প্রচুর শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের মাধ্যমে জ্ঞানলাভও কম হয় না।

সংক্ষেপে শিক্ষাক্ষেত্রে "পাঠ্যক্রমের পরিপূরক" কাজগুলির গুরুত্ব "পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কর্মের" গুরুত্ব অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মের প্রকারভেদ—পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির কোন নির্দেশ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে; কারণ ঐগুলি অসংখ্য ধরণের হইতে পারে। তথাপি উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়ার নিমিত্ত উহাদিগকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইল। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতাই এই বিভাগগুলির ভিত্তি।

১। বিদ্যালয়ের প্রতি একাত্মবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত এবং ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকে মেলামেশা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কাজ। প্রার্থনা সভা, বিদ্যালয়-সঙ্গীত গান করা, ছাত্র-ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ ধরণের খেলাধূলা (mixing up games), ঐ উদ্দেশ্যে বনভোজন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

২। ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাজ। শরীর-চর্চা (Physical training), কুস্তি, বক্সিং এবং বিভিন্ন ধরণের স্পোর্টস্ (sports) ঐ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

৩। চরিত্র বিকাশ, কিছুটা শরীরচর্চা এবং নির্মল আনন্দলাভের নিমিত্ত কাজ। ফুটবল, হাডু-ডু-ডু, ক্রিকেট ইত্যাদি দলবদ্ধ খেলাধূলাকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায়।

৪। সাংস্কৃতিক জীবনের এবং চরিত্রের বিকাশের জন্য, রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন ইত্যাদি।

৫। জীবনে আদর্শবাদ সৃষ্টি এবং চরিত্রগঠনের নিমিত্ত কাজ, যথা হিন্দুস্থান স্কাউট, এন, সি, সি, ইত্যাদি।

৬। জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশের নিমিত্ত কাজ। হবিক্লাব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৭। ভবিষ্যৎ শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করিবার জন্য কাজ। যথা, 'কেরিয়ার টক' (Career Talk), প্রদর্শনী ইত্যাদি।

৮। পাঠলব্ধ জ্ঞানকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে কাজ। যথা, এক্সকার্সন (Excursion), প্রদর্শনী ইত্যাদি।

৯। গণতান্ত্রিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দানের নিমিত্ত কাজ। যথা, বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংঘের কাজ, বিতর্কসভা ইত্যাদি।

১০। সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কাজ। যথা, জনসেবা, জনশিক্ষা ইত্যাদি।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজগুলির যথাযথভাবে পরিচালনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—

১। ঐ সব কাজে লিপ্ত হইবার সুযোগ যাহাতে সকল ছাত্র পায় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ সব কাজের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ৩০।৪০ জনের এক একটি দলে বিভক্ত করিতে হইবে।

২। ঐ সব কাজের পরিচালনার দায়িত্ব যথাসম্ভব ছাত্রদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

হবিক্লাব (Hobby club)—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ উভয়েই বিদ্যালয়ে হবিক্লাব স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। প্রত্যেক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে হবিক্লাব স্থাপনের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। তাই পাঠ্যক্রমের পরিপূরক অন্যান্য কার্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা না হইলেও এ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

অবসর বিনোদনের জন্য আমরা যেসব কার্যে লিপ্ত হই তাহাকে সাধারণতঃ 'হবি' আখ্যা দেওয়া হয়। খেলাধূলা, নৃত্যগীত, অভিনয়, পুস্তকপাঠ, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ (hiking), ডাক টিকিট সংগ্রহ, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি কত রকমের হবি যে লোকের থাকিতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। অবশ্য অনেকে অবসর বিনোদনের জন্য জুয়াখেলা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কর্মেও লিপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু 'হবি' শব্দটি কোন অবাঞ্ছিত কর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। অবসর বিনোদনের জন্য আমরা যে সব বাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত হই তাহারাই শুধু 'হবি' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। 'হবি' এমন ধরণের কাজ যাহাতে আমরা নিছক আনন্দের জন্য লিপ্ত হই। সাধারণতঃ জন্মগত ক্ষমতা, আগ্রহ এবং চারিত্রিক গুণাবলী অনুসারেই লোকের 'হবি' গঠিত হইয়া থাকে। কাহারও যে একাধিক হবি থাকে না এমন, নহে। একই লোক ফটোগ্রাফি, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ এবং ডাক টিকিট সংগ্রহ হবি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। তবে জন্মগত ক্ষমতা, আগ্রহ এবং চারিত্রিক গুণাবলীর সহিত সম্বন্ধ থাকে বলিয়া সাধারণতঃ লোকের এক ধরণের

'হবি' থাকে। অর্থাৎ একই লোকের নৃত্যগীত এবং বক্সিং হবি হিসাবে থাকিবার সম্ভাবনা অল্প। পারিপার্শ্বিক সুযোগের উপর মানুষের 'হবি' গ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করে। সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের অনেক ছাত্রের কোন 'হবি'ই নাই। পারিপার্শ্বিকের সুযোগের পার্থক্যের নিমিত্ত জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ এক হইলেও দুইটি ছাত্র বিভিন্ন হবি গ্রহণ করিতে পারে; একজন চিত্রাঙ্কণ অপরে ফটোগ্রাফি।

প্রত্যেক ছাত্রেরই যাহাতে এক বা একাধিক হবি থাকে তাহার জন্য আধুনিক বিদ্যালয় বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কার্যের উপর বর্তমানে এত অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে যে, বিদ্যালয়ে হবিক্লাব পরিচালনার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইউনিয়ন সরকার উভয়েই বিশেষ অর্থের বরাদ্দ করিতেছেন। ছাত্রদিগকে বাঞ্ছনীয় কাজের দ্বারা অবসর বিনোদনের শিক্ষা দেওয়া হবিক্লাব স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য। অবসর সময়ে ছাত্রেরা যে সব কর্মে লিপ্ত হয় তাহা তাহাদের শিক্ষার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সমাজে অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ যত বৃদ্ধি পাইতেছে, বাঞ্ছনীয় কাজের দ্বারা অবসর বিনোদনের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা ততই অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। ছাত্রেরা দিন দিনই অবাঞ্ছিত কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বিদ্যালয়ের কার্যে তাহাদের মনোযোগ কমিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঞ্ছনীয় 'হবি' বাড়িয়া উঠিলে উহা আমাদের মানসিক স্থৈর্য (Mental balance) রক্ষা করায় সাহায্য করে। হবি জীবনের আনন্দ বৃদ্ধি করে এবং ঐ আনন্দ জীবনের অপেক্ষাকৃত নিরানন্দময় কার্যে লিপ্ত হইতে আমাদিগকে মানসিক শক্তি যোগায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের হবিক্লাবগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল ছাত্রদের জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশ সাধন করা। চর্চার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশ হয় এবং চর্চার অভাবে উহারা সুপ্ত থাকে। হবিক্লাবে নিজের ইচ্ছামত কার্যে লিপ্ত হইবার সুযোগ পাইয়া ছাত্রদের নিজ নিজ জন্মগত ক্ষমতা এবং আগ্রহ বিকাশ পাইবে ইহাই আশা করা যায়। আমাদের দেশে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে ছাত্ররা নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আগ্রহ অনুসারে 'বিশেষ বিষয়' পাঠের সুযোগ পায়। কিন্তু ইহার পূর্বে তাহাদের জন্মগত ক্ষমতা এবং স্বাভাবিক আগ্রহের বিকাশ না ঘটিলে পাঠের 'বিশেষ বিষয়' নির্বাচন করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে। কাজেই সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বিদ্যালয়ে হবিক্লাবের প্রয়োজনীনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হবিক্লাবের সংগঠন—নিজ বিদ্যালয়ে এবং প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে যেসব 'বিশেষ-বিষয়' পাঠের সুযোগ আছে তাহা বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ে হবিক্লাব গঠন করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলিতে যে সাতটি বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ আছে (সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি) তাহাদের নাম অনুসারে হবিক্লাবের নাম রাখিলে ভাল হয়। অবশ্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে সাতটি হবিক্লাব স্থাপন করিয়া সাতটি বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশের সুযোগ দেওয়া বাস্তব কারণে সম্ভব নহে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া তিনটি বা চারিটি হবিক্লাব স্থাপন করিলেই হয়ত চলিতে পারে। পাঠ্যবিষয়ের নামানুসারে হবিক্লাবের নামকরণ করিতে হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন বিষয় 'পাঠ্য' হইলেই উহা 'হবি' হইতে পারে না ঐ ধারণা ভ্রান্ত। বরং বিদ্যালয়ে 'হবি' এবং 'পাঠ্যের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ভবিষ্যতে থাকিবে না বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 'হবি' এবং 'পাঠ্য' উভয়ই ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং স্বাভাবিক আগ্রহ অনুসারে স্থির হইবে এবং উভয় কার্যে লিপ্ত হইয়াই ছাত্র সমান আনন্দ পাইবে, ইহাই আশা করা যাইতেছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র যদি কোন একটি বিশেষ কার্যে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সুযোগ পাইলে ঐ ধরণের অপরাপর কার্যেও হয়ত আকৃষ্ট হইবে ইহা আশা করা অন্যায় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন ছাত্র যদি বিতর্কের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সে সুযোগ এবং উৎসাহ পাইলে সাহিত্য রচনায়ও আকৃষ্ট হইতে পারে। তাই প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য (যেমন, বিতর্ক) পৃথক পৃথক হবিক্লাব স্থাপন না করিয়া এক ধরণের সকল কাজের জন্য একটি হবিক্লাব স্থাপন করা সঙ্গত (বিতর্কের জন্য বিতর্ক-হবিক্লাব স্থাপন না করিয়া সাহিত্য-হবিক্লাবের অন্যতম কর্ম হিসাবে বিতর্ককে গ্রহণ করাই ভাল)।

কোন হবিক্লাবের সভ্যসংখ্যা ৪০ জনের বেশী হওয়া উচিত নহে। সভ্য সংখ্যা বেশী হইয়া পড়িলে একই হবিক্লাবের বিভিন্ন শাখা স্থাপন করা উচিত। ধরা যাউক, বিজ্ঞানের হবিক্লাবের সভ্যসংখ্যা যদি হয় ৮০ জন তাহা হইলে উহা দুইটি শাখায় বিভক্ত করিতে হইবে। ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে হবিক্লাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক 'ইউনিট' (unit) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নবম শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীগুলির ছাত্রদিগকে আর একটি ইউনিট

বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পৃথকভাবে লইয়াও হবিক্লাব গঠন করা যাইতে পারে। প্রত্যেক হবিক্লাবের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকিবেন, এবং অন্ততঃ প্রতি দুই সপ্তাহে হবিক্লাবের ১½ ঘণ্টা করিয়া (একসঙ্গে) অধিবেশন বসিবে। শিক্ষকের নেতৃত্বে হবিক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব যথাসম্ভব ছাত্রেরাই গ্রহণ করিবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এক ছাত্রকে একাধিক হবিক্লাবের সভ্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব হইবে না, কারণ সকল হবিক্লাবের অধিবেশন হয়ত একই সময়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম কিছুদিন নিজেদের ইচ্ছানুসারে ছাত্রদিগকে বিভিন্ন হবিক্লাবে যোগদানের অনুমতি দিতে হইবে। ৩।৪ মাস ঐ ধরণের সুযোগ ভোগ করার পর প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন হবিক্লাবের সভ্য হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু ইহার পরও সে যদি মধ্যে মধ্যে অপর কোন হবিক্লাবে যোগ দিতে চায় তবে তাহাকে সে অনুমতি দিতে হইবে।

হবিক্লাবের কার্য—উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া হবিক্লাবের সভ্যেরাই উহার কার্য স্থির করিবে। তথাপি হবিক্লাবে করা যাইতে পারে এমন কয়েকটি কাজ সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাইতেছে—

স্ক্রেপ বুক (Scrap Book) রক্ষা করা—হবিক্লাবের প্রত্যেক সভ্যই একখানি করিয়া 'স্ক্রেপ বুক' রাখিবে। অবসর সময় উহাতে নিজ নিজ আগ্রহ এবং রুচি অনুসারে নিজের হবিক্লাবের বিষয় সম্বন্ধীয় ছবি, লেখা ইত্যাদি—ছাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

প্রশ্নের থলি (Question Box) প্রত্যেক হবিক্লাবেই একটি করিয়া বাক্স রাখা হইবে। সভ্যেরা নিজেদের ইচ্ছামত প্রশ্ন লিখিয়া ঐ বাক্সে ফেলিবে। হবিক্লাবের সভায় ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে (ভারপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বাক্স খুলিয়া পূর্ব হইতেই প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিবে)। প্রশ্ন অবশ্য নিজ নিজ হবিক্লাব বিষয়ক হইবে।

পাঠ—হবিক্লাবের সভায় ছাত্রেরা নিজেদের স্ক্রেপ বুক হইতে পাঠ করিয়া অপরাপর সভ্যকে শুনাইতে পারে। কোন ভাল বই বাড়ীতে পড়িয়া থাকিলে তাহার অংশ বিশেষও পাঠ করিয়া শুনান যাইতে পারে। প্রত্যেক হবিক্লাবের নিজস্ব কতকগুলি পুস্তক থাকিবে। নিজেদের রুচি অনুসারে সভ্যেরা ঐসব পুস্তক

লইয়া পাঠ করিবে। প্রশ্নের থলির প্রশ্নগুলির উত্তরও হবিক্লাবের অধিবেশন কালে দেওয়া হইবে।

প্রাচীরপত্র—প্রত্যেক হবিক্লাবেই একখানা করিয়া প্রাচীরপত্র থাকিবে।

অন্যান্য কাজ—প্রত্যেক হবিক্লাবই নিজ নিজ বিষয়ে অভিনয়, বিতর্ক, এক্সকার্শন প্রভৃতি আরও নানারূপ কার্যে ব্রতী হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, হবিক্লাবের কার্যের মধ্যে কিছুটা হইবে ব্যক্তিগত এবং কিছুটা হইবে দলবদ্ধ।

অনুশীলনী

Q. 1. Write an essay on the place of extra-curricular activities in educational institutions. (B. A. 1955, '59 ; B. T. 1951)

Ans. (পৃঃ ১৬৭ ৭২)

Q. 2. Describe the utility of extra-curricular activities in schools. Why are these activities now-a-days called co-curricular activities ? (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ২৬৯ ; ১৬৭-৬৯)

Q. 3. Write an essay on Hobby Clubs in schools.

Ans. (পৃঃ ১৭২-১৭৬)

নবম পরিচ্ছেদ

চরিত্রগঠন

চরিত্রের সংজ্ঞা—চরিত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। চরিত্রই মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং চরিত্রের বিকাশ প্রায় সমার্থ-বাচক বলা যাইতে পারে। ব্যবহারের মধ্য দিয়াই মানুষের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে—মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality) বা চরিত্র আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবহারের মধ্য দিয়া। মানুষ কতকগুলি প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারের মধ্যেই আমরা কতকগুলি বিশেষ প্রতিকৃতি (pattern) দেখিতে পাই। যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষ নিজ নিজ গঠিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি (Behaviour pattern) অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। তাই কোন মানুষ বা সত্যবাদী আর কেহবা মিথ্যাবাদী, কোন মানুষ অলস আবার কেহ পরিশ্রমী ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই ব্যবহার-প্রতিকৃতিকে মানুষের চারিত্রিক "গুণ" বলা হইয়া থাকে। ঐ প্রতিকৃতিগুলিই মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality) সৃষ্টি করে। চরিত্রগঠন বলিতে আমরা বাঞ্ছনীয় ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তোলা মনে করিয়া থাকি।

চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা—প্রাচীন ভারতে চরিত্র গঠন ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা শব্দের আধুনিকতম সংজ্ঞা হইতেছে—অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাঞ্ছিত পথে শিক্ষার্থীর ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করা। তাই এক হিসাবে শিক্ষা এবং চরিত্রগঠনকে সমার্থ-বাচক বলা যাইতে পারে। শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিলেও (বিদ্যালয়কে যদি শুধু জ্ঞানদানের স্থান বলিয়া মনে করি) দেখা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত করিতে না পারিলে তাহাদিগকে জ্ঞানদানও সম্ভবপর হয় না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে দিন দিনই যে অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে—যে কোন পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা যে, এত অধিক হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ছাত্রদের চরিত্র যথাযথভাবে গঠিত হইতেছে না। ছাত্রদিগের মধ্যে একাগ্রতা, সততা,

দায়িত্ববোধ, শ্রমসহিষ্ণুতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত করিতে না পারিলে তাহাদের পড়াশুনায় অগ্রগতি সম্ভব নহে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পর হইতে আমাদের বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেয় নাই; সমাজ, পরিবার এবং ধর্মের মধ্য দিয়াই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের প্রভাব আমাদের জীবনে খুবই সামান্য; নানা কারণে সামাজিক অভিজ্ঞতা বর্তমানে আমাদের চরিত্রকে বিকশিত না করিয়া বরং নষ্টই করিতেছে; পরিবার সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় বিদ্যালয়কে চরিত্রবিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে চলিতে পারে না। চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারে ভাঙিয়া পড়ার বিষময় ফল আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবার পূর্বে বিদ্যালয়কে ছাত্রদের চরিত্রবিকাশের চেষ্টা বিধিবদ্ধ ভাবে করিতে হইবে।

চরিত্র জন্মগত নহে—চরিত্র জন্মগত বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেকের ধারণা যে, আমরা সৎ বা অসৎ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণ বিকশিত হয় মাত্র। এমন কি চরিত্র বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অপরাধীদের বংশানুক্রম পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিও অপরাধপ্রবণ হয় বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাদের মতে অনেকে 'পীড়িত-ব্যক্তিত্ব' (psychopathic personality) বা 'নৈতিক শিশুত্ব' (moral imbecility) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ঐরূপ লোক যদিও বা থাকে তথাপি তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। আধুনিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, চারিত্রিক গুণাবলী বিশেষ করিয়া অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন সমাজের লোকের মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী দৃষ্ট হয়। ধরা যাউক, আমাদের দাম্পত্য জীবনে যৌননিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক অপেক্ষা অধিক, অথচ উহাদের কর্মনিষ্ঠা আমাদের চেয়ে বেশী। পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য দেশের লোকের মধ্যে চারিত্রিক গুণের এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা। ফলতঃ বুদ্ধি (Intelligence) এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার (Aptitudes) সহিত তুলনা করিলে চরিত্রের উপর অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব অনেক বেশী বলিয়া প্রতীত হইবে—চরিত্র যে প্রধানতঃ শিক্ষালব্ধ এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানের প্রতিকূল পরিস্থিতি—সমগ্র জীবন বাপিয়াই চরিত্র গঠনের কাজ চলিয়া থাকে। অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং তীব্রতার ফলে যে কোন বয়সে মানুষের ব্যবহার-প্রতিকৃতি পরিবর্তিত হইয়া নূতন ব্যবহার-প্রতিকৃতির সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু শিশুকালই যে চরিত্র গঠনের প্রশস্ত সময় ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তখনও জন্মগত প্রবণতা ব্যবহার-প্রতিকৃতিতে রূপ গ্রহণ করে নাই। পারিপার্শ্বিককে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তখনই শিশুদের মধ্যে বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করার প্রকৃষ্ট সময়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ছাত্রদের চরিত্র গঠিত করিতে গেলে আমাদের তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়—(ক) ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান ছাত্রদের মনে জন্মাইয়া দেওয়া। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ নীতিজ্ঞান বলিয়া থাকি। নীতিজ্ঞান জন্মিলে চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (খ) বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণাবলীর অনুকূল অভ্যাস গঠিত করিয়া দেওয়া। সৎ-অসতের জ্ঞান এবং গঠিত অভ্যাসের ভিত্তিতে মানুষের ব্যবহার-প্রতিকৃতি (Behaviour pattern) গড়িয়া উঠে। (গ) অবাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি গঠিত হইলে তাহার স্থলে বাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিকৃতি গড়িয়া তোলা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকি—

(ক) ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সর্বদা উপদেশ দেওয়া। (খ) শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে ছাত্রদিগকে বাঞ্ছিত ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করা। (গ) উপদেশ এবং শাস্তির দ্বারা অবাঞ্ছিত ব্যবহার দূর করা।

এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়া কাহারো নীতিবোধ জন্মানো যায় না। কোন কিছু শোনা অর্থই তাহা শিক্ষা করা নহে। যে কোন সত্য নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ না হইলে উহাতে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মায় না। সত্য কথা বলিয়া যে তৃপ্তি পাইয়াছে এবং মিথ্যা কথা বলিয়া তিক্তস্বাদ অনুভব করিয়াছে—তাহার মনে সত্যবাদিতা যে ভাল এবং মিথ্যা কথা বলা যে মন্দ সে জ্ঞান কোন উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই জন্মাইবে। যে সব স্থলে উপদেশদাতা সম্বন্ধে মনে প্রচুর শ্রদ্ধা থাকে সে সব স্থলে উপদেশ মনের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। উপদেশদাতার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইতে হইলে

তাহাকে নিজ উপদেশ অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। উপদেশদাতার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে উপদেশ বিপরীত ফল প্রসব করে। অর্থাৎ শিক্ষক সত্যকথা বলার উপদেশ দিলে ছাত্রদের মনে মিথ্যাকথা বলার প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষাদানের চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ প্রচারিত নীতি অনুসারে বিদ্যালয়ের নিজের জীবনই গঠিত হয় না। ছাত্রদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা উপদিষ্ট নীতির প্রতি ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা না জন্মাইয়া অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছাত্র যদি দেখিতে পায় যে, নকল করিয়া অনেক ছাত্র ভাল নম্বর পাইতেছে এবং নকল না করার দরুণ তাহার নম্বর ঐ সব ছাত্রের নম্বর অপেক্ষা কম হইতেছে, তবে নীতি হিসাবে সত্যাচারের প্রতি তাহার আস্থা নষ্ট হইবে। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের নিজেদের ব্যবহার আদর্শানুরূপ থাকে না। যে শিক্ষক সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই হয়ত নিজে ক্লাসে যাইতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু বিলম্ব করিতেছেন। নানা কারণেই শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের উপদেশ বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে।

শাস্তি এবং পুরস্কারের সাহায্যে সু-অভ্যাস গঠন করা যায় না। কারণ যখনই শাস্তি বা পুরস্কারের প্রলোভন থাকে না তখন গঠিত অভ্যাসও নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিপ্ত কর্মের ফলে যে অভ্যাস গঠিত হয় তাহা সহজে পরিবর্তিত হয় না। অধিকন্তু শাস্তি এবং পুরস্কার ছাত্রদের মধ্যে প্রতারণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করে। এক কথায় বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে চরিত্র শিক্ষাদানের প্রতিকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।

বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানের আধুনিকতম পদ্ধতি—চরিত্র শিক্ষাদান সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে—"Character is not taught but caught"। এই কথাটি আমাদের চরিত্র শিক্ষাদানের সর্বপ্রধান নীতি অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের আবহাওয়া হইতে স্বাভাবিক নিয়মে ছাত্রেরা চারিত্রিক গুণাবলী আহরণ করিবে। শুধু ক্লাসে লেখাপড়া করাইয়া এবং উপদেশ দিয়া ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া তোলা সম্ভব নহে। ছাত্রদের মধ্যে কি কি গুণ বিকশিত দেখিতে চাই সে সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে আমাদিগকে মনস্থির করিতে

হইবে। বাঞ্ছিত চারিত্রিক গুণের তালিকা প্রস্তুত করার কালে আমাদের দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী। (খ) সমাজজীবনে সাফল্য লাভের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী। সর্বজন সমর্থিত চারিত্রিক গুণাবলীর কোন তালিকা প্রদান করা সম্ভব না হইলেও নিম্নলিখিত চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে কোন বিদ্যালয়ই হয়ত আপত্তি করিবে না—

১। সত্যাচার, ২। মানসিক স্থৈর্য, ৩। দায়িত্ব বোধ, ৪। অধ্যবসায় এবং শ্রমসহিষ্ণুতা, ৫। সহযোগিতা, ৬। সমস্যা সমাধানে অগ্রগামিতা, ৭। আত্মবিশ্বাস, ৮। যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস, ৯। সৌন্দর্য-বোধ, ১০। নিয়মানুবর্তিতা।

সমগ্র বিদ্যালয়জীবনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, উহার প্রতিটি অভিজ্ঞতা যেন উপরোক্ত চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের অনুকূল হয়; অন্ততঃ কোন অভিজ্ঞতাই যেন উহাদের প্রতিকূল না হয়। বিদ্যালয়-জীবনকে প্রধানতঃ শ্রেণীকক্ষের ভিতরের জীবন এবং শ্রেণী কক্ষের বাহিরের জীবন—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চরিত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত উভয় জীবনকেই কর্মকেন্দ্রিক করিতে হইবে; সকল প্রকার কর্মে ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে।

ছাত্রদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্র হিসাবে যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, চরিত্র গঠনের নিমিত্ত শ্রেণীকক্ষের ভিতরের জীবন অপেক্ষা শ্রেণীকক্ষের বাহিরের জীবনের গুরুত্ব বেশী। শ্রেণীকক্ষের বাহিরের জীবনে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিয়া তাহাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে অনেকটা আপনা হইতেই ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইবে।

প্রার্থনা সভা—ভগবান কিংবা কোন মহান শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ (Security) জন্মায় এবং স্বাভাবিক নিয়মে প্রশান্তি আসে। সমবেতভাবে গান বা আবৃত্তির মাধ্যমে ঐরূপ আত্মসমর্পণ সহজ-তর হয়। গান বা আবৃত্তির বিষয়বস্তু ভগবানকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিবে এবং ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে (আত্মসমর্পণের দ্বারা) ঐ গুণাবলীর প্রতিও একাত্মবোধ জন্মিবে। প্রার্থনা সভায় মহাপুরুষের জীবনী

এবং বাণী পর্যালোচনা ইহাতেও (ছাত্রেরা নিজেরা ইহাতেও অংশ গ্রহণ করিবে) নীতিশিক্ষার সাহায্য হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কার্য প্রার্থনা-সভা দ্বারা আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

আত্ম-বিশ্লেষণ সভা—এই সভার উদ্দেশ্য হইবে নিজ নিজ দোষ-গুণের আলোচনা করিয়া আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক সভা থাকিবে। ঐ সভায় ছাত্রেরা নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আইন-কানুনও প্রণয়ন করিবে। নিজেদের ব্যবহার উন্নততর করার দায়িত্ব যথা-সম্ভব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাসে দুইবার করিয়া ঐ সভার অধিবেশন বসিলেই চলিবে।

যুব-আন্দোলন—বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রেরই কোন না কোন যুব-আন্দোলনের সভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের যুব-আন্দোলনের প্রবর্তন করা উচিত (এন. সি. সি., মনিমেলা, শক্তিসংঘ ইত্যাদি), যাহাতে ছাত্রেরা নিজ নিজ রুচি এবং প্রকৃতি হিসাবে কোনও না কোন আন্দোলনের সভ্য হইতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে যে কোন ধরণের আদর্শবাদ জন্মাইয়া তুলিতে পারিলে এবং ঐ আদর্শ অনুসরণ করিবার কিছুটা সুযোগ তাহাদিগকে দিতে পারিলে তাহাদের চরিত্র বিকশিত হইবে।

হবিক্লাব—হবিক্লাবের মাধ্যমে বাঞ্ছনীয় কর্মে ছাত্রদের আগ্রহ জন্মাইতে পারিলে অবাঞ্ছনীয় কর্মে তাহাদের রুচি জন্মাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে। আপন আগ্রহ অনুযায়ী কর্মে লিপ্ত হইবার ফলে ছাত্রদের মনে যে আনন্দ জন্মে উহা তাহাদের চারিত্রিক বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমাজে ছাত্রদের অবাঞ্ছনীয় কর্মে আগ্রহ জন্মাইবার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে সেই সমাজে বাঞ্ছনীয় কর্মের প্রতি তাহাদের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারিলে উহা তাহাদের মধ্যে বাঞ্ছনীয় চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করিবে।

দলবদ্ধ খেলাধুলা—দলবদ্ধ খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের ফলেও নানারূপ চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের 'পাবলিক স্কুল'গুলি বিশেষ করিয়া খেলাধূলার সাহায্যেই ছাত্রদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে।

ছাত্রসংঘ (School Union)—বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ই শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ছাত্রদের জীবন নিয়ন্ত্রণে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। ছাত্রসংঘ ছাত্রদের শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য

পরিচালনা করিতে গিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহার ভিতর দিয়া ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য আরও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করা চলিতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেই চলিবে না; ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপভাবে পরিচালিত হইবে যে, উহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা যথাযথ চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের প্রতিকূলে কাজ না করিয়া অনুকূলে কাজ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক ছাত্রসংঘ এমনভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে যে, তাহাদের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা বাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিক্রুতির পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ব্যবহার-প্রতিক্রুতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

শ্রেণীকক্ষের ভিতরে জ্ঞানদান আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ইহার ভিতরে চরিত্র শিক্ষাদানের চেষ্টা করাও চলে। পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে (মুখস্থ করা জ্ঞান নহে) উহার ছাপ অবশ্যই চরিত্রের উপর পড়িবে। তাই সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠ মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে এইরূপ বিশ্বাস করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' কবিতা পাঠ করিয়া ছাত্র যদি দুর্গাধিপতি দুমরাজের কর্তব্যনিষ্ঠার মাহাত্ম্য অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে তবে কর্তব্যনিষ্ঠা তাহার নিজের চারিত্রিক গুণ হিসাবে বিকশিত হওয়া সহজতর হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, নিজের অন্তরের প্রেরণায় যখন ছাত্র পাঠে রত হয় এবং পাঠ হইতে আনন্দ লাভ করে তখনই পাঠের বিষয়বস্তু তাহার চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করিয়া থাকে। বিপরীত অবস্থায় তাহার মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তারপর আধুনিকতম শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট সমস্যায় বিভক্ত করা হয় এবং ছাত্রদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের উপর একটি সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করা হয়। এইরূপ পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করিলে স্বতঃই ছাত্রদের মধ্যে নানাবিধ চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনে শিক্ষক সর্বাবস্থায় বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনিই ছাত্রদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ। স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রেরা

তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুসরণ করিয়া থাকে, তাই শিক্ষক যদি আদর্শ চরিত্রের হন তাহা হইলে তাহার চারিত্রিক গুণাবলী সহজেই ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে; উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া পড়িলে ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না; তাহার উপদেশ বরং ছাত্রদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ছাত্রদের পরস্পরের মেলামেশার ভিতর দিয়া যে চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত হয় না, এমনও নহে। অনেক সময় ছাত্রেরা পরস্পরের নিকট হইতে যতখানি শিক্ষা করে—শিক্ষকদের নিকট হইতে ততখানি করে না। তাই বিদ্যালয়কে ছাত্রসমাজের ব্যবহারের মানকেও উঁচু সুরে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুনিয়ন্ত্রিত হইলেই ইহা সম্ভব। তারপর যে সব ছাত্রের মধ্যে কিছুটা অবাঞ্ছিত ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে কৌশলে "ভাল" ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হয়; মন্দ ছাত্রেরা "মন্দ" ছাত্রের সঙ্গে মেলামেশা করিলে পরস্পরের প্রভাবে—মন্দ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্ষেপে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই ছাত্রের চরিত্র গঠিত হইবে।

অনুশীলনী

Q. 1. Discuss whether the school should undertake the development of the character of the pupils.

Ans. (পৃঃ ১৯৫-১৯৮)

Q. 2. Discuss how would you try to develop the character of the pupils in your school.

Ans. (পৃঃ ১৯৮-২০২)

Q. 3. Discuss the contributions of Co-curricular activities in developing character of the pupil.

Ans. (পৃঃ ১৯৮-২০২)

Q. 4. To what extent can one's personality be improved through studies and experience? How can the school improve the personality of its pupil?

Ans. (পৃঃ ১৯৬-২০২)

দশম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র শব্দের অর্থ—বর্তমান যুগকে আমরা বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রের যুগ বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষও নিজেকে গণতান্ত্রিক দেশরূপে গড়িয়া তুলিতে চায়—দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে ইহাই ভারতের কামনা।

যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি ইহার নীতি, প্রকৃতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে অনেকের মনে স্পষ্ট ধারণা নাই। গণতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে; ফলে আমরা অনেকে গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়া থাকি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Democracy is the rule of the people, by the people and for the people." (ইহাকেও রাজনৈতিক সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে।) যাহা হউক, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত গত দুইশত বৎসরের সাধনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান (Institution) গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন, বয়স্কদের ভোটাধিকার (Adult Suffrage), প্রতিনিধিমূলক আইনসভা (Representative Parliament), দায়িত্বসম্পন্ন সরকার (Responsible Government) এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা (Independent Judiciary)। জনসাধারণের দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে হইলে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অপরিহার্য—পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশই উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গণতন্ত্র বুঝি সমার্থ-বাচক। বস্তুতপক্ষে অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক জীবনও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে অর্থ নৈতিক জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তারপর কোন দেশে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিলেই সেই দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাও বলা যাইতে পারে না। দেশের জনসাধারণ যদি প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একথা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হইলে এবং তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত না হইলে প্রাপ্ত বয়স্কদের আইনের দ্বারা ভোটাধিকার প্রদান করিলেও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসিতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র একটি সমাজ দর্শন (Social philosophy)—একটি আদর্শবাদ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণে কতগুলি বিশিষ্ট নীতিতে বিশ্বাস করার নামকেই গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গণতন্ত্রের আসন প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে। কাজেই গণতন্ত্র কাহাকে বলে জানিতে হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল দেশ এখনও সম্পূর্ণ একমত নহে। আমাদের শাসনতন্ত্রে যে সব আদর্শকে গণতান্ত্রিক আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে নীচে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা হইল।

১। আমাদের শাসনতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে (Individual liberty) সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে, প্রত্যেকেরই নিজ রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে জীবন যাপনের স্বাধীনতা থাকিবে। কোন ব্যক্তিকেই সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র মাত্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না। আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করার যেমন চেষ্টা করিব অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইতেও তেমনি বিরত থাকিব।

২। প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব পথ এবং মত অনুসারে চলিবার (স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদিগকে পরমতসহিষ্ণুতাকে (Tolerance) নীতি হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রসঙ্গে পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং পরভাষা এবং সংস্কৃতি-সহিষ্ণুতার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও আমাদিগকে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পারস্পরিক আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি ব্যতীত সমাজজীবন সার্থক হইতে পারে না। আর সমাজজীবন সার্থক না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশও সম্ভব নহে। তাই পরস্পর সহযোগিতাকে গণতন্ত্র অন্যতম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪। পারস্পরিক সম্বন্ধ ন্যায় (Justice) এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাও গণতান্ত্রিক জীবনের আর একটি আদর্শ। বাস্তববাদের প্রভাবের ফলে অনেকক্ষেত্রে বর্তমানে গণতন্ত্রই জীবন দর্শনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গণতান্ত্রিক জীবনযাপনই অনেকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিক্ষা ও গণতন্ত্র—শিক্ষা ও গণতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে কোন দেশের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে শিক্ষারও বিস্তার ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা না করিয়া পারেন না। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে জনসাধারণই দেশের কর্তা ; কর্তাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে (Educate thy master) গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সাফল্যের সহিত দেশ শাসন করা সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কালে ১০ বৎসরের মধ্যে দেশের সকলকে লেখাপড়া জানা করিয়া তুলিব বলিয়া আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলাম। সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশশাসনে সাফল্য অর্জন করা যে সম্ভব হইবে না তাহা প্রথম হইতেই আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তারপর পূর্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, গণতন্ত্র একটি সমাজদর্শন। শিক্ষার সাহায্যে এই সমাজ দর্শনের প্রতি দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস জাগাইয়া তোলা আবশ্যক। গণতন্ত্রের যে পাঁচটি মূলনীতির কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে ঐ নীতিগুলির সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইতে না পারিলে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ইত্যাদি) গড়িয়া তুলিলেই গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করিবে না। গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে, গণতন্ত্রের আদর্শানুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলী নাগরিকদের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য বিধিবদ্ধভাবে করিতে হইলে বিদ্যালয়ের শরণ

লওয়া অপরিহার্য। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা খুব জটিল হইয়া থাকে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলেও বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্ত জ্ঞান, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা সবকিছু অর্জন করাই প্রয়োজন। তাই শিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব কল্পনা করাও চলে না। অপরদিকে গণতান্ত্রিক আদর্শ এত ব্যাপক যে ইহাকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ইহার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও অন্যতম উদ্দেশ্য। আবার গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিলে স্বভাবতই তাহাদের শিক্ষা সমাজজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তাই গণতন্ত্রকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে দুইটি প্রধান মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা চলে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি—ছাত্রদিগকে গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই গণতান্ত্রিক সমাজ দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধেও ছাত্রদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অবশ্য ঐ সব জ্ঞান ছাত্রদের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সাধারণ বিকাশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ সমাজবিদ্যা (Social studies) পাঠের মাধ্যমেই এই জ্ঞান ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিষয়ে ছাত্রকে যে জ্ঞানই দেওয়া হউক না কেন তাহা সক্রিয় জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান সক্রিয় না হইলে উহা শিক্ষার্থীর ব্যবহারের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে সম্ভব হইবে না। তাই ছাত্রেরা সমাজবিদ্যার জ্ঞান যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিলেই ভাল। শিক্ষকের বক্তৃতা বা পুস্তক মুখস্থ করা জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসাবে যত অল্প ব্যবহৃত হয় ততই মঙ্গল।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ছাত্রদের প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং উহাদের পরিচালনা সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে কিছু অভিজ্ঞতা দিতে পারিলেও ভাল হয়। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘ গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে এই সংঘের কর্মকর্তাগণ ছাত্রদের ভোটের দ্বারা প্রতি বৎসর নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব

(খেলাধূলা, উৎসবাদি, সাহিত্যিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) ছাত্রসংঘের উপর অর্পিত হইয়া থাকে। ছাত্রসংঘের কর্মকর্তাগণ ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের পরিচালনায় যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে; আমাদের দেশে সকল কলেজেই ছাত্রসংঘ গঠিত হইলেও অনেক বিদ্যালয়েই এখনও উহা গঠিত হয় নাই। তবে পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কর্মগুলি পরিচালনার ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার নীতি প্রায় সকল বিদ্যালয়েই গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক কর্ম পরিচালনার নিমিত্ত পৃথক পৃথক ভাবে ছাত্রদিগকে ভারপ্রাপ্ত করিয়া দেওয়া হয় (যথা, ফুটবল খেলার জন্য ক্যাপ্টেন, ভাইস-ক্যাপ্টেন ইত্যাদি) অনেক বিদ্যালয়ে নির্বাচনের পরিবর্তে শিক্ষক তাঁহার বিবেচনামত বিভিন্ন ছাত্রকে বিভিন্ন কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিয়াছেন। আমাদের কলেজগুলিতে ছাত্রসংঘের কাজ আশানুরূপভাবে চলিতেছে না বলিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘ স্থাপন অনেকে সমর্থন করেন না। ছাত্রসংঘের মাধ্যমে সমাজের নোংরা রাজনীতি কলেজে আমদানী করা শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করেন। আবার অনেকের মতে এত অল্প বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয় না।

কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিলে সমাজের সকল স্তরে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়ই আমাদের গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। বিদ্যালয়ে জীবন সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না। একনায়কতন্ত্রের (শিক্ষকের) মধ্যে বাস করিয়া ঐ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ছাত্র কিছুতেই গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শিক্ষা দিতে হয়—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এমন কোন কথা নহে। দায়িত্ব প্রদান করিয়া উহা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিলে ছাত্র ধীরে ধীরে দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা লাভ করে। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে আজও প্রাথমিক স্তরের ছাত্রেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সাহিত্যসভা পরিচালনার দায়িত্ব অতি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। বিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্রকেই বিদ্যালয় জীবন পরিচালনার দায়িত্বে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রসংঘ গুলিতে যে আমাদের সমাজের রাজনৈতিক গলদ ঢুকিয়া পড়ে তাহার কারণ আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘ স্থাপন না করিয়া

আমরা নিজেদের গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুতও করিতে পারিব না। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক, রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক ছাত্রদিগকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা দিতে হইলে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে বিদ্যালয় জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—শ্রেণী কক্ষের ভিতরের জীবন এবং শ্রেণী কক্ষের বাহিরের জীবন। শ্রেণী কক্ষের ভিতরের জীবন নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকদের বিশেষ ক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যাপারে ছাত্রদের কোনরূপ মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকিবে না ইহাও ঠিক নহে। একনায়কত্বের সুযোগ পাইলে শিক্ষকই হউন আর রাষ্ট্র নায়কই হউন অতি সহজে পথে ভ্রান্ত পরিচালিত হইয়া পড়িতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা না করার ফলে শিক্ষক হয়ত এমন ভাবে ক্লাসে পড়াইয়া যান যাহার ফলে ছাত্রদের বিন্দুমাত্র উপকারও হয় না। আবার বিদ্যালয় জীবনের এক অংশ একনায়কত্বের নীতিতে পরিচালিত হইলে বিপরীত মুখী অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ছাত্রদের চরিত্র গঠন ব্যাহত হইবে। তাই শ্রেণী কক্ষের ভিতরের জীবন ও যাহাতে গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইতে পারে তাহার নিমিত্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য একটি করিয়া পরামর্শ-দাতৃ সভা গড়িয়া তোলা আবশ্যক। এই সভায় শিক্ষক নেতৃত্ব করিতে পারেন। কিন্তু উহাতে ছাত্রদেরও অংশ গ্রহণের অধিকার থাকিবে।

শ্রেণী কক্ষের বাহিরের জীবন পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছাত্রদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রসংঘ স্থাপিত হইবে, এবং উহার দায়িত্ব প্রতিপালনের ভিতর দিয়াই ছাত্রেরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কৌশল আয়ত্ত করিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রধানতঃ চরিত্রগঠনের শিক্ষা। ছাত্রেরা যদি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অন্তরে অন্তরে গ্রহণ না করে, গণতান্ত্রিক সমাজে বাসোপযোগী চারিত্রিক গুণাবলী যদি তাহাদের মধ্যে গঠিত না হয় তাহা হইলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও তাহারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা পায় নাই বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। গণতন্ত্রের উপযুক্ত চারিত্রিক গুণাবলী গঠিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

পরিচালনা কালে এত গলদ দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক চরিত্র গঠিত করিয়া দিতে না পারার দরুণ আমাদের বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা অনেক সময় বিফল হয়। সমগ্র বিদ্যালয় জীবনকে গণতান্ত্রিক আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ঐ সমাজে বাসের অভিজ্ঞতার ফলে ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিবে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সম্বন্ধ—ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র এবং শিক্ষক-শিক্ষক গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী গঠিত হওয়া আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের কথা নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে (প্রার্থনা সভা, হবিক্লাব, খেলাধূলা, যুব-সংঘ ইত্যাদি) তাহাদের মধ্য দিয়াও গণতান্ত্রিক গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। যদি গণতন্ত্রই আমাদের জীবনদর্শন হয় তবে গণতান্ত্রিক চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ করিতে পারিলেই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। বিদ্যালয় যদি আধুনিকতম নীতি হিসাবে পরিচালিত হয় তাহা হইলে পৃথকভাবে উহাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে না; গণতান্ত্রিক-শিক্ষা এবং "প্রকৃত শিক্ষার" মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; একের ব্যবস্থা করিতে গেলে অপরের ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইবে।

অনুশীলনী

Q. 1. "It is said that objective of democratic education is the full all around development of every individual personality. Discuss. State some of the ways by which this objective would be attained in school.

(B.T. 1956)

Ans. (পৃঃ ২০৬-২০৯)

Q.2. Discuss what do you understand by Democracy? How can you 'educate the people for democracy.'

Ans. (পৃঃ ২০৩-২০৫, ২০৬-২০৯)

একাদশ পরিচ্ছেদ

বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষা

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ—ছোট মানবশিশু কত অসহায়! কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হইয়া উঠে। সে লম্বা হয় এবং তাহার ওজনও বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌পিণ্ড, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরে যে সব যন্ত্র আছে তাহাদের সব কয়টিই ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং তাহাদের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বুদ্ধি এবং অপরাপর মানসিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেক কাজ (যেমন হাঁটা), অনেক রকম মনের ভাব প্রকাশ করা (যেমন রাগ) সে আপনা হইতেই শিক্ষা করে। এই যে 'বড় হওয়া' উহা অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ। —প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু বড় হইয়া থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্যে ২½ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে মুক্ত করার কয়েক দিনের মধ্যেই সে হাঁটিতে শিখিয়াছে; এই কাজের জন্য অপরাপর শিশুদের মত তাহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, কোনরূপ অভ্যাস করার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশুর মাংসপেশীগুলি এত দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাদের উপর তাহার কর্তৃত্ব এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, হাঁটিবার ক্ষমতা তাহার মধ্যে আপনা হইতেই জন্মাইয়াছে।

জন্ম হইতে 'বড় হওয়া' পর্যন্ত মানুষের শরীর এবং মনের এই যে স্বাভাবিক বিকাশ হইতে থাকে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন—

১। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর এবং মন উভয়ের বিকাশ হইতে থাকিলেও উহাদের বিকাশ যে পরস্পরের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবে এমন কোন কথা নাই; অনেক সময় শরীরের বিকাশ না হইলেও মনের বিকাশ এবং মনের বিকাশ না হইলেও শরীরের বিকাশ হইতে পারে। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ পৃথক পৃথক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিকাশ হইতে থাকিলেও ঐ বিকাশ যে

সকল ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে তাল রাখিয়া চলে এমন নহে। অনেক সময় হয়ত দেখা যাইবে যে, ছয় মাস বা এক বৎসরের মধ্যে শিশুর তেমন কোন শারীরিক বা মানসিক উন্নতি হইল না; কিন্তু তার পরের দুই-তিন মাসের মধ্যে তাহার এত দ্রুত উন্নতি হইল যে, পূর্বের ত্রুটি পূর্ণ করিয়া সে আরও অগ্রসর হইয়া গেল। মোটকথা শিশুর বিকাশ ব্যাঙের মত অনেকটা লাফাইয়া লাফাইয়া অগ্রসর হয়। ঠিক কোন্ বয়সে কোন্ শিশু যে 'লাফ' দিবে—ঠিক কখন যে কাহার শারীরিক বা মানসিক বিকাশ দ্রুততর হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না।

৩। ২।৩ বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে অধিকাংশ শিশুর মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ আশা করা যাইতে পারে। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া জন্ম হইতে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর বিকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্তরে কি পরিমাণ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ আশা করা যায় তাহার একটা মানও মনোবিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ তাহার বয়সের জন্য নির্দিষ্ট মানের সঙ্গে মিলিয়া না গেলেও খুব বেশী আশঙ্কার কারণ নাই।

৪। শিশুর বিকাশ যদিও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহাতে পারিপার্শ্বিকের যেকোন অবদান নাই ইহাও সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক শরীরিক বিকাশ যে ব্যাহত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আবার গবেষণার দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ মানসিক-শক্তি-বিকাশকারী অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে। তাই শিশুর মানসিক বিকাশে পারিপার্শ্বিকের অবদান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা চলে না।

শিক্ষা এবং শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ—প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন দুই কারণে হইতে পারে—১। অন্তর্নিহিত শারীরিক এবং মানসিক শক্তির বিকাশের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন। ২। অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের পরিবর্তন। শেষোক্ত উপায়ে ব্যবহারের পরিবর্তনকেই আমরা শিক্ষা আখ্যা দিয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ ব্যবহারই শিক্ষালব্ধ; কিন্তু শিক্ষাদান শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ-

নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যে কোন বয়সের শিশুকে যে কোন ধরণের অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে তাহা ফলপ্রসূ হয় না। শিশু তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বলেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়—অভিজ্ঞতা গ্রহণের যোগ্যতা আসে শরীর ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহিত শিক্ষাকে তাল রাখিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ফলে বিভিন্ন বয়সের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান কালে ঐ সব চাহিদার কথা শিক্ষককে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর—জন্ম হইতে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে ভাগ করা যাইতে পারে—

১। শৈশব (Infancy)—১ বৎসর বয়স হইতে ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

২। বাল্যকাল (Childhood)—৪ বৎসর বয়স হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

৩। বয়ঃসন্ধি (Adolescence)—১১ বৎসর বয়স হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

উপরোক্ত প্রত্যেক স্তরকে আরও স্বল্পস্থায়ী স্তরে ভাগ করা চলে। শৈশবকে অতি শৈশব (১—২ বৎসর) এবং শৈশব (২—৪ বৎসর), বাল্যকাল (৪—৭ বৎসর) এবং পরবর্তী বাল্যকাল (৭—১১ বৎসর), এবং বয়ঃসন্ধিকে কৈশোর (১১—১৪ বৎসর) এবং নবযৌবন (১৪—১৮ বৎসর) এইরূপ স্বল্পস্থায়ী স্তরেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে, শিশুর ক্রমবিকাশকে যে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছিল উহারা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের (নার্সারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) সহিত সম্বন্ধযুক্ত। শৈশব সাধারণতঃ 'নার্সারি' শিক্ষার, বাল্যকাল, প্রাথমিক শিক্ষার এবং বয়ঃসন্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাহাকে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন করে এবং ওই বয়সের শিক্ষাকে কিভাবে শিশুজীবনের সমস্যা-কেন্দ্রিক করা চলিতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধি কালের প্রকৃতি—সাধারণতঃ শিশুকাল হইতে বয়স্ক পদলাভের অন্তর্বর্তী কালকে বয়ঃসন্ধি আখ্যা দেওয়া হয়। ১১ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে কোন্ শিশু কখন যে বয়ঃসন্ধি স্তরে প্রবেশ করে এবং ঐ স্তরের ক্রমবিকাশ

পূর্ণ করে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। অন্তর্নিহিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা সমান হইলেও দুই শিশুর মধ্যে এই স্তরের ক্রমবিকাশে ২।৩ বৎসরের পার্থক্য থাকাও কিছু আশ্চর্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন মেয়ে হয়ত ১২ বৎসর বয়সেই ঋতুমতী হইতে পারে আবার কাহারও ক্ষেত্রে উহা হয়ত ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিশুরই ক্রমবিকাশের একটি স্বকীয় ধরণ আছে। বয়ঃসন্ধিকালে ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ফলে একটা নির্দিষ্ট বয়সের সকল শিশুর একই রূপ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হইয়াছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইলে ভুল করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত হইতে থাকে; অন্ততঃ ঐ স্তরের পরিবর্তন বেশী করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। আর এই স্তরের পরিবর্তন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়—হঠাৎ একদিন আমাদের চোখে ধরা পড়ে—এ যেন আর আগের সে শিশু নাই। বয়ঃসন্ধিকালের আবির্ভাব হঠাৎ চোখে ধরা পড়ার দরুণ, উহা শিশু এবং তাহার আশেপাশের সকলকে বিস্মিত এবং বিমূঢ় করে। বয়ঃসন্ধি-স্তরে প্রবেশ করিলে শিশু যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া পড়ে। শৈশব এবং কৈশোরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তুলনা করিলে মনে হয় যে, ইহা যেন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পরিবর্তন। শিশুর জীবনে যেন এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী জোয়ার আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়—ঐ জোয়ারের বন্যা কোথায় যে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহার সঙ্কেত শিশু নিজেও পায় না। বন্যার স্রোতে ভাসমান লোকের মত শিশুর (তীরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। জোয়ার শেষে সে যেন নূতন দেশে পৌছায়—তাহার নবজন্ম লাভ হয়। বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী স্ট্যান্‌লী হল্‌ (Stanley Hall) বয়ঃসন্ধিকালকে 'নবজন্ম' (a new birth) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি শিশুকে সমাজ-জীবনের মুখোমুখী লইয়া আসে বলিয়া উহারা নানাভাবে শিশুর মনে নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই স্ট্যান্‌লী হল বয়ঃসন্ধিকে শিশুর পক্ষে ঝঞ্ঝা এবং ক্লেশের কাল (period of storm and stress) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৈশোরের সমস্যাগুলি শিশুর নিকট এত জটিল যে, তাহার সমগ্র জীবনের শুভাশুভ ইহাদের সমাধানের উপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধিকালে শিশু যেন

এক আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া থাকে—পতন হইলে আগ্নেয়গিরির অন্ধকার গহ্বরে চিরদিনের জন্য সে বিলীন হইয়া যাইবে।

বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত ধারণা কিন্তু আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন আপাত-দৃষ্টিতে খুব দ্রুত এবং যুগান্তকারী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিবর্তন শিশুর ক্রমবিকাশের অন্যান্য স্তরের পরিবর্তন অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নহে। বয়ঃসন্ধি-কালে হঠাৎ শিশুর জীবনে "জোয়ার" আসে একথাও সত্য নহে। শিশু দিনে, দিনে পলে পলে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ ক্রমবিকাশ যখন অনেক-খানি অগ্রসর হইয়া যায়—তখন উহা শিশুর আশেপাশের সকলের চোখে ধরা পড়ে। শিশুর নিজের কাছে ঐ পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; সে ঐ পরিবর্তন লইয়া বিব্রত বোধ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাহার মনে অনুরূপ ধারণা জন্মাইয়া না দেই। বিখ্যাত বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী বার্ট সাহেব (C. Burt) লিখিয়াছেন—"Tho mental changes are so gradual that it is impossible to say whether 11, 12, 13 or even later is the age at which the characteristics of adolescence first "emerge". There is no sudden "Crisis" no Rubican to be crossed"—The crisis, if there is one, lies rather in the mind of the administrator than in the life of the child". (শিশুর মানসিক পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে সাধিত হয় যে, ১১, ১২, ১৩ বৎসর বা ইহার পরে ঠিক কোন বয়সে বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতিগুলি তাহার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। হঠাৎ সে কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় না—তাহার জীবনের কোন আমূল বা বিপ্লবকারী পরিবর্তনও ঘটে না। যাহাকে ঐ বয়সের গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে তাহা শিক্ষকের মনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করে শিশুর মনে কিন্তু ততখানি করে না।) বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর পক্ষে ভীষণ মানসিক অশান্তির সময় ; এই বয়সে সামান্য মাত্র পথভ্রষ্ট হইলেই তাহার সমগ্র জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই সমস্ত ধারণাও অনেকখানি ভ্রান্তিপ্রসূত। অপেক্ষাকৃত আদিম সমাজে বয়ঃসন্ধিকাল শিশু বা সমাজ কাহারও নিকট বিশেষ সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ স্বীকার করিয়া লয় এবং ঐ পরিবর্তন-

গুলির নিমিত্ত শিশুর মনে যে সব চাহিদার সৃষ্টি হয় তাহাদের নিবৃত্তির পথ সমাজ সুগম করিয়া দেয়। বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ মার্গারেট মিড (Margaret Mead) এর মতে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি বিশেষ করিয়া আধুনিক সমাজের সৃষ্টি।

১। বয়ঃসন্ধিকাল (১৮ বৎসর) অতিক্রম করিলে প্রাচীন সমাজগুলি শিশুকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ বয়স্কের অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু বর্তমান সমাজে অর্থনৈতিক কারণে পূর্ণবয়স্কদের অনুরূপ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও নবযুবককে পূর্ণবয়স্কের অধিকার লাভ করার নিমিত্ত অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হয়। "নবযুবকের" (বয়ঃসন্ধিকাল) জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা (needs) সমাজ নানাভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহার মনে সমস্যার সৃষ্টি করে।

২। ঐ স্তরের যৌনক্ষমতার বিকাশ লইয়া অনেক সমাজেই "ঢাক ঢাক নীতি" (hush hush) প্রচলিত আছে। ইহার ফলেও শিশুর মনে বয়ঃসন্ধিকালে নানারূপ সমস্যা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

৩। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুকে তাহার মানসিক চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীনতা না দিলে অভিভাবকদের সম্বন্ধে তাহার মনে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া অশান্তি জন্মায়।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে—

১। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় তাহা তাহার পূর্ব পূর্ব স্তরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হইতে ভিন্ন প্রকৃতির নহে।

২। ঐসব পরিবর্তন জোয়ারের মত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না এবং তাহাদিগকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়াও চলে না। ঐসব পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিলে বয়ঃসন্ধিকালকে শিশুজীবনের বিশেষ সঙ্কটের কাল বলিয়া গণ্য করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের সমাজব্যবস্থার ত্রুটির জন্য বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর কাছে নানা সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন—১। বয়ঃসন্ধিকালে সর্বশরীরই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া বয়স্কদের অনুরূপ হইয়া পড়ে—ঐ সময় গ্ল্যাণ্ড, মাংসপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক প্রত্যেক অঙ্গই বিকাশ লাভ করে। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা (puberty) জন্মানোর অনতিপূর্বে এই বৃদ্ধির গতি খুব দ্রুত হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা জন্মানোর প্রধান লক্ষণ হইতেছে ঋতুমতী হওয়া; আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা জন্মানোর নিশ্চিত লক্ষণ হইতেছে প্রস্রাবে শুক্রকীটের

উপস্থিতি। Pubertyর পূর্বে শিশুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তাহার হাত এবং পায়ের হাড়গুলি এত দ্রুত লম্বা হয় যে, অনেকের ক্ষেত্রে এক বৎসরে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। শরীরের ওজন কিন্তু দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। তাই এই বয়সে অনেক শিশুকে লম্বা, টিঙ্‌টিঙে মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, শিশুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব সময় একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। ধরা যাউক, শিশুর হাত বা পায়ের হাড় হয়ত অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; ফলে তাহার দেহের গঠন বেমানান হইয়া পড়িল। কিন্তু এই বেমানান ভাবটা ধীরে ধীরে দূর হইয়া যায়—ধীরে ধীরে লম্বার অনুপাতে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায়; তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মধ্যেও সামঞ্জস্য আসে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি বেমানান থাকে ততদিন পর্যন্ত তাহার মনে ভীষণ অশান্তি হয়। কাহারও সঙ্গে সে সহজে মিশিতে পারে না।

সকল শিশুর দৈহিক বিকাশ একই হারে হয় এমন নহে। প্রথম দিকে মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশী লম্বা হয়; কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েকে ছাড়াইয়া যায়। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এমন অনেক আছে যাহারা অল্পবয়সে লম্বা হইয়া যায়, আবার অনেকে এমন আছে যাহারা অপেক্ষাকৃত পরে লম্বা হয়। যাহারা অল্প বয়সে হঠাৎ লম্বা হইয়া পড়ে—তাহারা অনেক সময় নিজেদের এত দিনের খেলার সাথী হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া নিজেদের নিঃসঙ্গ বোধ করে।

২। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর মুখমণ্ডল বিকশিত হয়। কিন্তু হাত এবং পায়ের বৃদ্ধির মত মুখমণ্ডলের সকল অংশও সমান হারে বৃদ্ধি পায় না। বয়ঃসন্ধিকালে ইহাও অনেক শিশুর মনোকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত মেয়েদের মুখ কোমল এবং লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া উঠে এবং ছেলেদের মুখ পুরুষোচিত রূপ ধারণ করে (কাঠিন্যের ছাপ পড়ে এবং চোয়ালের হাড় উঁচু হইয়া বাহির হইয়া পড়ে)।

৩। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরে মাংসপেশী-গুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হয়। মানসিক স্থৈর্য নষ্ট না হইলে তাহার কর্মক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

৪। এই বয়সে ছেলেদের স্বরনালী লম্বায় অনেকখানি বাড়িয়া যায়;

তাহাদের লেরিক্স (Larynx) বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে ছেলেদের এবং মেয়েদের গলার স্বর সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া যায়। ছেলেদের গলার স্বর পূর্বের মত মিহি থাকে না ; উহা অনেকটা ভাঙাভাঙা হইয়া পড়ে।

৫। যৌন অঙ্গ (Sex-organ) ব্যতীত অপর যে সব শারীরিক লক্ষণের দ্বারা (Secondary sex characteristics) ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, বয়ঃসন্ধিকালে তাহাদের বিকাশ হয়—ছেলেদের গলার স্বর ভাঙাভাঙা হওয়া ব্যতীতও তাহাদের গোঁফদাড়ি দেখা দেয় এবং মেয়েদের স্তনযুগল স্ফীত হয়।

৭। নবযুবক এবং যুবতীর এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড (Endocrine gland)-সমূহ হইতে সেক্স হরমোন (Sex hormons) নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার যৌন অঙ্গের বিকাশ সাধন করে এবং তাহার যৌনচেতনা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে শিশুর মানসিক চাঞ্চল্য জন্মায়।

৬। এই সব পরিবর্তন ব্যতীত ও বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পরিপাক ক্রিয়া দ্রুততর হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সাময়িক ভাবে কোন কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা (বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর শারীরিক বিকাশ সম্বন্ধে দুইটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—

১। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ একসঙ্গে চলিতে নাও পারে। কোন শিশু হয়ত শারীরিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তাহার মানসিক বিকাশ হয়ত তখনও "বাল্যকালের" স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। আবার ইহার বিপরীতও হইতে পারে অর্থাৎ কোন শিশুর মানসিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও শারীরিক বিকাশ বিলম্বিত হইতে পারে।

২। শিশুর উপর সমাজের প্রতিক্রিয়ার দরুণ বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর প্রায় প্রতিটি শারীরিক পরিবর্তনই তাহার মনে কোন না কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশ—বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশ যে খুব দ্রুত হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত পক্ষে বয়ঃ-সন্ধি কালের পরিসমাপ্তির পর শিশুর বুদ্ধির আর বিকাশ হয় না। ঠিক

কত বৎসর বয়সে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ চরমস্তরে পৌঁছায় তাহা এখনও আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। এক সময় ধারণা ছিল যে, ১৪ বৎসর বয়সেই আমাদের মানসিক বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমানে এমন প্রমাণ-পাওয়া গিয়াছে যাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে যে, কাহারও কাহারও ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে পারে। ঠিক কোন্ বয়সে কাহার বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হইবে তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ঠিক পিউবার্টির (puberty) পূর্বে বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হয় এবং তারপর উহার বিকাশ ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কে কোন্ বয়সে পিউবার্টিতে পৌঁছিবে তাহা নির্দিষ্ট না থাকার দরুণ কাহার বুদ্ধির বিকাশ কখন দ্রুততর হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কেবল বুদ্ধি কেন, বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর অন্যান্য মানসিক ক্ষমতারও (special abilities) বিকাশ হইতে আরম্ভ করে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে এবং মেয়ের ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশে কোন উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ সব সময় পরস্পরের সহিত তাল রাখিয়া চলে না। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালের উপযুক্ত শারীরিক বিকাশ কোন শিশুর হইয়া গেলেও তখন পর্যন্ত তাহার অনুরূপ মানসিক বিকাশ নাও হইতে পারে; ইহার বিপরীতও সত্য হইতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে অনুভূতির (Emotion) বিকাশ—বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি শিশুকে তাহার পূর্বের ধারণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হইতে এত দূরে সরাইয়া লইয়া যায় যে, এই বয়সে সময়ে অনেক শিশুর মধ্যেই একটা মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মনে কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাবের সৃষ্টি হয়। সে ঠিক কি চায় তাহা সে নিজেই ঠিক করিতে পারে না। কোন কিছুতেই সে যেন মনস্থির করিয়া পূর্ণভাবে একাগ্র হইতে পারে না।

যৌন চেতনার বিকাশের ফলে স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে প্রবল হইয়া উঠে। এই বয়সে শিশু বিশেষভাবে বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়। তাহার এই বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা চলে—১। প্রথম স্তরে ছেলেরা ছেলে বন্ধু এবং মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পছন্দ করে। এই স্তরে কোন একটি শিশুর সহিত অপর একটি শিশুর খুব ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়

না—বন্ধুত্ব সাধারণতঃ দলগত থাকে। কয়েকটি শিশু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একটি বন্ধুগোষ্ঠীর বা দলের সৃষ্টি করে। ২। দ্বিতীয় স্তরে কিন্তু একটি শিশুর অপর আর একটি শিশুর (সমলিঙ্গ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। পরস্পরের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানে এবং সমস্যার আলোচনায় তাহারা তন্ময় থাকে। অনেকক্ষেত্রে এই বয়সের বন্ধুত্ব সাংসারিক জীবনেও স্থায়ী হইতে দেখা যায়। ৩। তৃতীয় স্তরে ছেলে, মেয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে। উহারা পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ভালবাসে এবং একে অপরের শ্রদ্ধা লাভ করিতে কামনা করে।

বয়ঃসন্ধিকালে শিশুজীবনের সমস্যা—বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের শিশুদের মধ্যে যে সব বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এই সময় শিশুরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করে। তাহারা আর শিশু নহে—পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে তাহারা নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান পাইতে চায়। বয়স্কদের সহিত তাহাদের যে পার্থক্য রহিয়াছে ইহার জন্য তাহাদের অবচেতন মনে একটা হীনতাবোধও (Inferiority Complex) থাকে। ইহার ফলে বিশেষ করিয়া পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বাধীনতা পাইতে চায়। বড়দের সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা বিদ্রোহীভাব প্রকাশ পায়। কথায় কথায় বড়দের সঙ্গে তাহাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। সুযোগ পাইলেই বড়দের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাহারা মুখর হইয়া উঠে।

কিন্তু একদিকে বড়দের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইলেও ঐ বয়সে শিশুরা বিশেষ কোন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত একাত্মবোধও স্থাপন করিতে চায়। এই সময় সে এমন কোন লোকের অনুসন্ধান করে যাহার সহিত একাত্মবোধ স্থাপন করিয়া সে নিজের হীনতাবোধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। শিশুর কাছে সে হইবে অনেকটা আদর্শ মানব; সে শিশুকে ভালবাসিবে এবং সর্বান্তঃকরণে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবে। এমন লোকের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শিশু বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকে। স্বাধীনতালাভ এবং বশ্যতা স্বীকার পরস্পর বিপরীত ভাব হইলেও বয়ঃসন্ধিকালে এই উভয় প্রকার মনোভাবই নবযুবকের মনে পাশাপাশিভাবে বিরাজ করে।

পিতা, মাতা এবং শিক্ষক ইঁহাদিগকে সে একই সঙ্গে ভালবাসিতে চায়, শ্রদ্ধা করিতে চায় এবং সমালোচনাও করিতে চায়। দুঃখের বিষয় আমাদের পরিবার

এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থায় নবযুবকের মনের এই চাহিদা পূর্ণ হইবার সুযোগ না থাকায় তাহার মনে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, আমাদের পরিবার এবং বিদ্যালয়গুলি একনায়কত্বের নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে; পিতামাতা বা শিক্ষক কেহই নবযুবকের মনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বিদ্রোহ মনে করিয়া কঠিন হস্তে দমন করিতে চান। নবযুবকের সহিত যে অনেকটা বয়স্কদের অনুরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত—তাহাদিগকে দায়িত্ব দিলে, বিশ্বাস করিলে তাহারা যে উহার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে একথা বিস্মৃত হইয়া পিতামাতা এবং শিক্ষক তাহার সহিত "বালকের" মত ব্যবহার করেন। তাঁহারা নবযুবক কর্তৃক তাহাদের সমালোচনাও সহ্য করিতে পারেন না। ইহার প্রধান কারণ তাঁহাদের নিজেদের মনে অপরাধবোধ (Guilt feeling) প্রবল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের ঐতিহ্যে বয়স্কদের ঐরূপ সমালোচনা অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয়। অপরদিকে পিতামাতা এবং শিক্ষক কেহই কিন্তু নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা নবযুবকের মনের আদর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না—সে তাঁহাদের কাহাকেও নিজের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ফলে আমাদের দেশে পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে নবযুবকের সহিত পিতামাতা এবং শিক্ষকের সম্বন্ধ দিন দিনই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। পিতামাতা এবং শিক্ষককে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহারা 'রাজনৈতিক নেতা', 'ফিল্‌ম ষ্টার' (Film star) দুর্দান্ত ছাত্রপ্রভৃতির সহিত নিজের মনের একাত্মবোধ সৃষ্টি করিয়া অনেক ক্ষেত্রে জীবনকে অবনতির পথে লইয়া যাইতেছে।

নবযুবকের মনের আদর্শবাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বয়সে সে নিজের জন্য জীবনদর্শন খুঁজিয়া বেড়ায়। সংসার এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাল্যকালের শিশু-সুলভ ধারণা তাহাকে আর তৃপ্ত রাখিতে পারে না। পিতামাতার ভালবাসা পাওয়া এবং তাহার প্রতিদান দেওয়াই আর তাহার নিকট জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হয় না। মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ হওয়ার দরুণ সে অনেক সময় মানুষ কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, এই সব গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায়ও রত হয়। নবযুবক বাস্তবরাজ্য অপেক্ষা ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেই অধিক পছন্দ করে। যৌনবোধ হইতে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা এবং উহা হইতে আত্মবিসর্জনের স্পৃহা নবযুবকের মনে দেখা দেয়। আদর্শবাদী কোন কাজ করিয়া আত্মবিসর্জন করার কোন সুযোগ পাইলে সে বিশেষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

আত্মসচেতনতা নবযুবকের আর একটি লক্ষণ। নবযুবক অনেক সময়েই মনে মনে নিজের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া থাকে; অধিকাংশ সময় সে নিজের কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকে। তার অন্তরের অপূর্ণতাবোধকে পূর্ণ করিবার জন্য সে শিল্পকলা, ধর্ম, সমাজসেবা, রাজনীতি, দেশভ্রমণ এবং বিভিন্ন ধরণের বীরত্বপূর্ণ কর্মের (Gallant actions) প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উপরোক্ত ধরণের কাজে লিপ্ত হইবার সুযোগ ছাত্রেরা অল্পই পাইয়া থাকে। ছাত্রদের মধ্যে বাঞ্ছিত জীবনদর্শন সৃষ্টি করিয়া দিবার নিমিত্ত বিদ্যালয় কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা করে না। আমাদের সমাজেও দিন দিনই আদর্শবাদী কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ কমিয়া আসিতেছে। ফলে রাজনৈতিক নেতারা নবযুবকের মনের আদর্শবাদ এবং আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছেন।

যৌন পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং বিপরীত লিঙ্গ (opposite sex) লোক সম্বন্ধে সুস্থ মনোভাব পোষণ করা নবযুবকের জীবনের আরও দুইটি প্রধান সমস্যা। যৌন প্রসঙ্গ মাত্রেই আমাদের সমাজ "ঢাক ঢাক" নীতি (hush hush) অনুসরণ করিয়া থাকে। ফলে এই বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানও আমাদের সমাজের নবযুবকদের থাকে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে আমাদের দেশের নবযুবকেরা অনেক সময় অনর্থক মানসিক উদ্বেগ ভোগ করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রথম ঋতুমতী হইলে অনেক মেয়ে মনে করে যে, তাহাদের গুরুতর কোন রোগ হইয়াছে বা তাহারা বিশেষ কোন অন্যায় করিয়াছে—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং অপরাধবোধের ফলে তাহারা আধমরা হইয়া থাকে। কোন নবযুবকের "স্বপ্নদোষ" দেখা দিলে তাহার মনেও অনুরূপ ধারণা জন্মে। স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষাকেও নবযুবকেরা বিশেষ পাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিপরীত লিঙ্গ লোকের সহিত মেলামেশা করা এবং তাহাদের শ্রদ্ধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক নিয়মেই নবযুবকের মধ্যে জাগরিত হয়। কিন্তু সমাজের বিধিনিষেধের নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে তাহারা এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারে না—বিপরীত লিঙ্গ লোকের সহিত সুস্থ এবং স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধেও নবযুবকের মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। নবযুবক বুঝিতে পারে যে, পরিবারের এবং বিপরীত লিঙ্গ লোকের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা অনেকটা তাহার অর্থোপার্জন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আমাদের সমাজ বেকার সমস্যায় পরিপূর্ণ। ইহার ফলে নবযুবকের মনে ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশের নবযুবকদের মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ নবযুবকের জীবনের উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের নিমিত্ত আমরা বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করি না।

বয়ঃসন্ধিকাল ও শিক্ষা—বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ যত্ন করিয়া যে শিশুকে শিক্ষা দিতে হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুণ অনেকে ঐ বয়সের শিক্ষা সম্বন্ধেও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর মনে মন্দ প্রবৃত্তির জোয়ার আসে। ঐ জোয়ার হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত সর্বদা তাহাকে বাঞ্ছিত কর্মে নিযুক্ত করিতে হয়, যাহাতে মন্দ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইবার মত অবসর সে না পায়। তারপর চারুকলা, ক্রীড়া ইত্যাদি কর্মে নবযুবককে ব্যাপৃত করিয়া তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে সাব্লিমেশন (Sublimation)এর সুযোগ দানের চেষ্টাও করিতে হয়।

কিন্তু নবযুবকের প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিয়াছি যে, তাহার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের অপরাপর স্তর হইতে এই স্তরের প্রকৃতি কোন হিসাবে ভিন্ন নহে। ঐ বয়সের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার দরুণ বয়ঃসন্ধি কালকে আমরা বিশেষ বিপদের কাল বলিয়া মনে করি। বাড়ীতে পিতামাতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক নবযুবককে যথাযথভাবে সাহায্য করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই সে বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করিয়া জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

শিক্ষককেই সর্বপ্রথমে নবযুবকের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে হইবে। এই বয়সে তাহার এমন একজন লোকের প্রয়োজন যাহাকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। যাহার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিয়া সে পরামর্শ চাহিতে পারে। তাহার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সব সময়েই তাহাকে নূতন নূতন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে—পদে পদে সে নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে—

কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা সে নিজের বুদ্ধি দিয়া ধরিতে পারিতেছে না। বন্ধুর সহিত সে পরামর্শ করিতে পারে। কিন্তু তাহাও ত অনেকটা এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখানোর মত। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে তিনি ছাত্রকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন অপর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ধরা যাউক, কোন ছাত্র হয়ত বয়ঃসন্ধি-কালে হঠাৎ বেমানান লম্বা হইয়া পড়িয়াছে ; এই লইয়া তাহার মনে অশান্তির শেষ নাই। শিক্ষক দৃষ্টান্ত দিয়া, পুস্তক হইতে ছবি দেখাইয়া, তাহাকে সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, উহা কিছু অস্বাভাবিক নহে ; অনেকের এই বয়সে এইরূপই হইয়া থাকে ; বেশীদিন তাহার দেহের বেমানান ভাব থাকিবে না। শিক্ষককে নবযুবকের মনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে হইলে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানের মত ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব থাকিলে চলিবে না। বন্ধুর মত ছাত্র তাহার মনের গোপনতম সমস্যাও শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে এবং তাহার পরামর্শ লইবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রকে শিক্ষকের সহিত একা দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

যৌন বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য নবযুবকের মনে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। যৌন বিষয়ে নিম্নতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে সমাজজীবনে শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। সমাজজীবনে দাম্পত্য জীবন যাপন করার নিমিত্তও যৌন বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেকের বিবাহিত জীবন এই জ্ঞানের অভাবে বিষময় হইয়া পড়ে। আধুনিক শিক্ষা-বিদ্‌দের মতে বিদ্যালয়ে যৌন বিষয়ে জ্ঞান দানের চেষ্টা করা আবশ্যক। ছাত্রেরা নবযৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই ঐ জ্ঞানদান আরম্ভ করিতে হয়। তাহারা যাহাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যৌন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে সেই-ভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয়। বয়ঃসন্ধিকালেও বিধিবদ্ধভাবে যৌন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হয়।

নবযুবকের মনের আদর্শবাদের তৃপ্তির নিমিত্ত তাহাকে কোনও না কোন যুব আন্দোলনে (Youth Movement) যোগদানের সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বিভিন্ন ধরণের যুব আন্দোলন গড়িয়া তোলা আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অল্প নহে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ও আলোচনার সুযোগ থাকা

প্রয়োজন। নিজের আচরণের দ্বারা শিক্ষক ছাত্রদের মনে আদর্শনিষ্ঠা জাগরিত করিয়া তুলিবেন। ছাত্র এবং শিক্ষক পরস্পর মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মধ্যে মধ্যে পরস্পরের ব্যবহারের ভাল-মন্দের আলোচনা করিলে ভাল হয়। ইহার ফলে মনের হীনতাবোধের জন্য ছাত্রের মধ্যে বয়স্কদের সমালোচনা করিবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মায় তাহা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ ঐরূপ আলোচনা হইতে পরস্পরের সম্বন্ধ তিক্ত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে। ঐরূপ আলোচনা আত্মোন্নতিরও কারণ হয়। ছাত্রদের মনের স্বাধীনতা ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির নিমিত্ত বিদ্যালয় জীবন গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিদ্যালয় জীবন সংগঠনের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর যত অধিক পরিমাণে পড়িবে ততই তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে ঐ দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। ঐরূপ অভিজ্ঞতার ফলে নবযুবকের আত্মবিশ্বাস জন্মায় এবং তাহার মনের হীনতাবোধ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়।

নবযুবকের শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। নবোন্মেষিত চিন্তা এবং কল্পনা শক্তির উপযুক্ত খোরাক না যোগাইতে পারিলে তাহার মনে তৃপ্তি থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তা এবং কল্পনা শক্তি প্রয়োগের প্রচুর সুযোগ থাকিবে। ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা এবং আগ্রহের বিকাশ হিসাবে তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ দিতে হয়।

আমরা জানি যে, ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে এই বয়সে ছাত্রদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা থাকে। কাজেই সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে নবযুবককে কিছুটা জ্ঞান দিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর দিক হইতে বিচার করিলে সে কোন্ বৃত্তির বিশেষ-ভাবে উপযুক্ত সে সম্বন্ধেও তাহার ধারণা জন্মাইলে ভাল হয়। নবযুবক মোটামুটি-ভাবে যে বৃত্তির উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে সে যে বৃত্তি গ্রহণ করিতে চায়, তাহার জন্য তাহাকে তাহার পাঠের ভিতর দিয়া সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমূখী বিদ্যালয় স্থাপন এবং এডুকেশন্যাল ও ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স (Educational & Vocational Guidance) প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে কোন যৌন কদভ্যাস না জন্মায় এবং বিপরীত লিঙ্গ লোকের প্রতি যাহাতে তাহাদের সুস্থ মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহার জন্য শিক্ষককে

বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হয়। যৌন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদান এই উদ্দেশ্য সাধনে কিছুটা সাহায্য করে বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যৌন আকাঙ্ক্ষার মূলে রহিয়াছে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি ভাবের আদান-প্রদান করার বাসনা। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সমাজে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ (personal relationship) স্থাপনের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সুযোগ থাকিলে, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মধ্যে একত্রে আদর্শমূলক বা সংস্কৃতিমূলক কার্যে লিপ্ত হইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে ভাল। মনে রাখিতে হইবে যে, নবযুবকের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা (যেমন বিপরীত লিঙ্গ লোকের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা) স্বাভাবিক নিয়মে যত বেশী পরিতৃপ্ত হইবে ততই তাহার মানসিক স্বাস্থ্য দৃঢ় হইবে। ছাত্রদের সাধারণ জীবন যত তিক্ততাপূর্ণ হইবে, তাহাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যত অধিক পরিমাণে অপরিতৃপ্ত থাকিবে, যৌন বিষয় লইয়া তত অধিক পরিমাণে তাহাদের মন ব্যাপৃত থাকিবে—হয়ত অনেক যৌন কদভ্যাস তাহাদের মনে গড়িয়া উঠিবে।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হিসাবে আবার বলিতে হয় যে, বয়ঃসন্ধি কালকে বিশেষ সঙ্কটের কাল বলিয়া গণ্য করার কোন কারণ নাই। সমাজ বিশেষ করিয়া পরিবারের ত্রুটির জন্য নবযুবকের মনে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় যদি বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ সমস্যাগুলির বিধিবদ্ধ সমাধানের চেষ্টা করে তাহা হইলে নবযুবকের জীবন সার্থকতা এবং তৃপ্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে যে খুব একটা বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এমনও নহে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করিলে আপনা হইতেই বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাসমূহের সমাধান হইয়া যাইবে।

অনুশীলনী

Q. 1. What are the special needs of the adolescent? Examine how far those are satisfied in a multipurpose school. (B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ২২০-২২৫)

Q. 2. "There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of eleven or twelve ... If that tide can be taken at the flood and a new voyage begun along the flow of its current we think, it will move on to fortune". Critically examine the statement. (B.T. 1958)

Ans. (পৃ: ২১২-২১৪, ২২২-২২৫)

Q. 3. "The imagination of a young boy is healthy ; and the nature of imagination of a man is healthy ; but there is a space of life in between in which the soul is in a ferment, the character undecided, the way of life uncertain". Explain the above with special reference to the mental characteristics of a boy during the period referred to in the above question. (B. T. 1957)

Ans. (পৃ: ২১২-২২৫)

Q. 4. "The adolescent period is also critical for the development of criminality". Do you agree ? Justify your answer with reasons and state how the teacher can be of help to the pupils at this stage. (B.T. 1956)

Ans. (পৃ: ২১২-২২৫)

Q. 5. Physical growth is rhythmic, not regular. Explain with special reference to the successive cycles of general growth. What are the mental characteristics of a boy of the age of eleven. (B.T. 1956)

Ans. (পৃ: ২১৫-২২৫)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা-ব্যবস্থা

পরীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা—আমাদের সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা যেরকম গুরুত্বপূর্ণস্থান অধিকার করিয়া আছে এমন আর কোন দেশে নাই। এই সেদিনও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নপত্র সর্বপ্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও অসাধু, অর্থলোলুপ লোকের চেষ্টায় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের লোহদ্বার কক্ষের ভিতর হইতে প্রায় 'যাদুবলে' বাহির হইয়া কল্পনাতীত মূল্যে পরীক্ষার্থীদের নিকট বিক্রীত হইল। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উত্তর করিলেন যে, বি.এ. এবং বি.এস-সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গোপন রাখার জন্য মানুষের সাধ্যয়ত্ত সব রকম সতর্কতাই অবলম্বন করা হইয়াছে ; কিন্তু প্রশ্নপত্র যে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকিবে একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র জানা-জানি হইয়া যাওয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন কিছু নহে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি এই অবস্থা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা পরীক্ষার উপর এত গুরুত্ব দেয় না। 'এত কাণ্ড' করিয়া প্রশ্নপত্র জানা-জানি করা তাহাদের কাছে মূল্যহীন। পরীক্ষায় পাশ না হইলে শিক্ষাই হয় না এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে নাই। একবার ফেল করিলে, অল্পদিন পর পর পরীক্ষা দিয়া পাশ করিবার সুযোগ তাহারা পায়। কেহ কোন পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিলে তাহার জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে বা মানুষ হিসাবে পরিবার এবং সমাজের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে না এমনও নহে। আমাদের দেশে পরীক্ষার উপর একদিকে যেমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হয় অপর দিকে আবার পরীক্ষাব্যবস্থা তেমনি ত্রুটিপূর্ণ হইয়া আছে। প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া বা জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াও পরীক্ষায় আশানুরূপ সফলতা লাভ করা সম্বন্ধে কেহ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। পরীক্ষা 'ভাগ্যের ব্যাপার' ইহা আমাদের প্রচলিত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—পরিশ্রম বা জ্ঞানলাভের সহিত তাহার নিশ্চিত কোন সম্বন্ধ নাই। উহা যেন প্রশ্নপত্র রচনাকারী এবং উত্তরপত্র পরীক্ষকের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করে। তাই পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এত উদ্বেগ, এত উৎকণ্ঠা, এত

ভয়; আর পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য সাধু, অসাধু সর্বপ্রকার চেষ্টা গ্রহণের জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা। নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ সম্ভব হইলে. পরীক্ষাকে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে উঠাইয়া দিতে চাই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষাব্যবস্থা বা কোন সমাজই পরীক্ষা করার কাজ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। এক হিসাবে আমরা সমস্ত জীবনব্যাপীই পরীক্ষা দিয়া চলিয়াছি। যখনই আমরা পরস্পর মিলিত হই তখনই জ্ঞাতে হউক বা অজ্ঞাতে হউক আমরা পরস্পরের সম্বন্ধ জানিতে চেষ্টা করি; ঐ জ্ঞানই আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তি। বর্তমানে আমরা যেরূপ নৈর্ব্যক্তিক সমাজে বাস করিতেছি তাহাতে যে-কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিবার পূর্বে (যেমন চাকুরি) পরস্পরকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে গ্রামের ব্যক্তিগত সমাজে আমরা পরস্পরকে এরূপ অন্তরঙ্গভাবে জানিতাম যে, পরীক্ষা ব্যতীতও পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গেও অনেক সময় আমাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। ফলে সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে পরীক্ষার দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়া না লইলে ঐ সব সম্বন্ধ সার্থক এবং সুন্দর হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ক্লাবে নূতন সভ্য বা বিদ্যালয়ে নূতন ছাত্র লওয়া, কোন প্রতিষ্ঠানে লোকনিয়োগ করা, বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করা প্রভৃতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরীক্ষার প্রচলন অতি প্রাচীন; সম্ভবতঃ চীনদেশেই ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। সকল দেশে সকল সময়ে বিদ্যালয়ে এবং সমাজে নানা ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; যেমন গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা ও শক্তির পরীক্ষা, তর্কবিদ্যার পরীক্ষা ইত্যাদি। বর্তমানে দেশ, কাল ও সমাজ ভেদে পরীক্ষাব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। সংক্ষেপে আমাদের সমাজ-জীবনে পরীক্ষা করার প্রয়োজন না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের সমস্যা, পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার নহে, পরীক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। মনে রাখিতে হইবে যে, পারস্পরিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ছাত্র এবং শিক্ষকের প্রথম মিলনে, শিক্ষকের প্রধান-

কাজ ছাত্রসম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা করা। ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ ও অর্জিত জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকিলে শিক্ষা-দানকার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, এক শ্রেণীতে একসঙ্গে ৪০টি ছাত্রকে পড়াইবার চেষ্টা করিলেও তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক পৃথক সত্তা এবং তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা-ভাবে স্পষ্ট ধারণা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসা করার ন্যায় শিক্ষাদান-কার্যেও একটা ধারাবাহিকতা আছে। কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া যেমন পরের ঔষধ নির্বাচন করিতে হয় তেমনি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর তাহাদের কার্যকারিতা বুঝিয়া তবে পরের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এমন হইতে পারে যে, প্রথম চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া গিয়াছে; এরূপ অবস্থায় পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হয়। এমনও হইতে পারে যে, প্রথম চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিপরীত ফললাভ হইয়াছে; তাহা হইলে ঐরূপ হওয়ার কারণ ভালভাবে বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আবার এমনও হইতে পারে যে, শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় আংশিক ফল লাভ হইয়াছে; তাহা হইলে হয়ত ঐ ধরণের চেষ্টা আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে। মোট কথা জ্ঞানদানই হউক, আর চরিত্রগঠনই হউক অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলাফল বার বার বিবেচনা না করিয়া শিক্ষক নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। যে সব ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষাদান চেষ্টার ফলাফল বিধিবদ্ধভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ব্যক্তিগত (নানারূপ) পার্থক্য থাকার দরুণ একই শ্রেণীর সকল ছাত্র একই শিক্ষকের শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতে সমান ফল লাভ করে না। তাই শ্রেণীতে শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা সাধারণভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে কিনা এবং কোন্ ছাত্রের ক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টা কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে ইহা প্রতি প্রচেষ্টার পরই শিক্ষকের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি সমগ্র শ্রেণীর কাছে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে তবে নূতনভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি সাধারণভাবে চেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে তবে 'পিছনে পড়া' ছাত্রদের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতি শিক্ষাদান-প্রচেষ্টার পরই মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক ইহার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পরই শিক্ষাদানপ্রচেষ্টার

ফলাফল কিরূপ হইতেছে তাহা লিখিতভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন—ঐ ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই নিজ নিজ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলে শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান কার্য আশানুরূপভাবে চলিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রের পরীক্ষা, অপর দিকে তেমনি শিক্ষকের পরীক্ষাও বটে। ইহার উদ্দেশ্য কে ভাল, কে মন্দ নির্ধারণ করা নহে ; ইহার উদ্দেশ্য নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার উন্নতি সাধন করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া। এই দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া পরীক্ষা-কার্যে অগ্রসর হইলে ছাত্রদের মনে পরীক্ষা সম্বন্ধে ভীতির সঞ্চার হইবে না এবং শিক্ষকগণও ইহাকে অপ্রীতিকর কর্মভার বলিয়া মনে করিবেন না—নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক বলিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উভয়পক্ষই পরীক্ষাগ্রহণ এবং পরীক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইবে। আরও একটু বিশদভাবে বলিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হইবে তিনটি—

(ক) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রচেষ্টা হইতে কোন্ ছাত্র কতখানি ফললাভ করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা।

(খ) যে ছাত্র আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারে নাই সে কি কারণে বিফল হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা করা। ইংরাজিতে ঐ ধরণের পরীক্ষাকে ডায়গনষ্টিক (Diagnostic) পরীক্ষা বলা হয়। ডাক্তারের পক্ষে কোন রোগীর জ্বর হইয়াছে ইহা নির্ধারণ করাই চিকিৎসা করার পক্ষে যথেষ্ট নহে ; রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যতক্ষণ তিনি জ্বর হওয়ার কারণ নির্ধারণ করিতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসাকার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। ঠিক একইভাবে কোন ছাত্র আশানুরূপভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই—পরীক্ষার দ্বারা ইহা নির্ণয় করাই শিক্ষাদানের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক অন্যধরণের পরীক্ষা (Diagnostic Test) না করিয়া কোন্ ছাত্রের ঠিক কোথায় আটকাইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহার উন্নতির চেষ্টায় অগ্রসর হইতে পারেন না। ধরা যাউক, কোন ছাত্র অঙ্ক পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর পায় নাই। ইহা নানা কারণে হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে— ১। ভাল নামতা না জানার জন্য সে অঙ্ক কষিতে ভুল করিতে পারে। ২। অঙ্কের মূল পদ্ধতিগুলি (যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি) ঠিকভাবে বুঝিতে না পারার দরুণ অঙ্ক ভুল হইতে পারে। ৩। ভাজ্য, ভাজক প্রভৃতি গণিতের

বিশেষ বিশেষ শব্দগুলির অর্থ না জানার জন্যও তাহারা অঙ্কে ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। ৪। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপ্রসূত মানসিক চাঞ্চল্যের নিমিত্ত সে ছোট ছোট যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি করিতে ভুল করিয়া সমগ্র অঙ্কটিই ভুল করিয়া দিতে পারে। এই ছাত্রের অঙ্কের জ্ঞান উন্নত করিতে হইলে ঠিক কোথায় কি কারণে তাহার অসুবিধা হইতেছে তাহা প্রথমেই স্থির করিতে হইবে। সুতরাং কারণ-নির্ণয়ণ-পরীক্ষা (Diagonstic Test) না করিয়া শিক্ষক পিছাইয়া-পড়া ছাত্রদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।

(গ) শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে কোথায় কোন্ দোষ-ত্রুটি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা। কারণ-নির্ণয়ণ-পরীক্ষা হইতে ইহা কিছুটা ধরা পড়িলেও আলাদাভাবে ইহার পরীক্ষা করারও প্রয়োজন রহিয়াছে। ঐ ধরণের পরীক্ষাগ্রহণ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় শেষোক্ত দুই ধরণের পরীক্ষার সহিত আমরা এখনও তেমন-ভাবে পরিচিত নহি। হয়ত অধিকাংশ শিক্ষকই উহাদের নামও শুনেন নাই।

বাহ্যিক পরীক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) আভ্যন্তরীণ ও (২) বাহ্যিক। ইতিপূর্বে যে সব ধরণের পরীক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বলা যাইতে পারে—শিক্ষাদানের প্রয়োজনে বিদ্যালয় ঐ ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমাজের প্রয়োজনেই বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক সমাজে অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে যে পরীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ের প্রথমেই করা হইয়াছে। ঐ সব পরীক্ষার ফলাফল সামাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অভিজ্ঞান-পত্র। ঐসব অভিজ্ঞানপত্র-দানের ক্ষমতা কোন বিদ্যালয় বা কলেজকেদেওয়া হয় না। ইহার কারণ অভিজ্ঞানের মূল্য সাধারণতঃ অভিজ্ঞানদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। তারপর একরূপ অভিজ্ঞানদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মর্যাদাও সমান হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাউক, কলিকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সামাজিক মূল্য সমান না হইলে সমাজ-জীবনে নানা ধরণের জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। তাই শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান

(স্কুল ও কলেজ) এবং সামাজিক অভিজ্ঞানদানের প্রয়োজনে পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ এক হয় না। এই কারণেই বাহ্যিক পরীক্ষার সৃষ্টি।

প্রাচীন ভারতে উপাধ্যায়ই সামাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে ছাত্রকে উপাধি প্রদান করিতেন। এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের সামাজিক মর্যাদা এত বেশী যে, তাহারা নিজেরাই সামাজিক অভিজ্ঞান হিসাবে উপাধিপত্র দিয়া থাকেন। বাহ্যিক পরীক্ষা নানা কারণে অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই; এইজন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ ইহা উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। প্রথমতঃ, বাহ্যিক পরীক্ষা ছাত্রের প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপ করিতে পারে না। দুই বা তিন বৎসর ধরিয়া যাহা অধ্যয়ন করা হইল তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেল—এই পরীক্ষা যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টার সহিত পরীক্ষা জড়িত থাকিলেই জ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-রচনাকারী সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐ শিক্ষাস্তরের শিক্ষা-দানের সহিত জড়িত থাকেন না। ফলে অনেক সময় প্রশ্নপত্রের মান এবং শিক্ষা-দানের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। অধীত জ্ঞানের পরীক্ষার প্রকৃত মান শুধু শিক্ষকই নির্ণয় করিতে পারেন। পাঠ্যতালিকা যত বিশদভাবেই রচিত হউক না কেন তাহা দেখিয়া 'বাহিরের লোক' প্রশ্নপত্র রচনা করিলে পরীক্ষার্থীরা যাহা শিক্ষা করিয়াছে এবং যাহা পরীক্ষা করার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষক যে ছাত্রকে যে বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন তিনিই শুধু তাহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন। তারপর আমাদের অজ্ঞতার জন্য প্রশ্নপত্ররচনা ও নম্বরদানের ব্যাপারে আমরা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছি না। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ভ্রম-প্রমাদ, দোষ-ত্রুটি অধিকতর হইতেছে। বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিয়া বা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া খুব কম লোকই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন। একদিকে পরীক্ষার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, অপরদিকে পরীক্ষাগ্রহণ-ব্যবস্থা ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ। ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। সর্বশেষে ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণ সমাজকে জানানোই যদি বাহ্যিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে ঐ পরীক্ষাদ্বারা পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে আমরা প্রয়োজনারূপ জানিতে পারিতেছি কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে

হয়। বর্তমানে আমরা শুধু অধীত জ্ঞানেরই পরীক্ষা করিয়া থাকি। বাহ্যিক পরীক্ষা আমাদের যে সামাজিক অভিজ্ঞান দেয়, তাহা শুধু অধীত জ্ঞানেরই অভিজ্ঞান। আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী, বিশেষ ক্ষমতা, আগ্রহের ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ে ঐ অভিজ্ঞানপত্র হইতে কিছুই জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা ঐসব নির্ণয় করাও যায় না। ফলে বাহ্যিক পরীক্ষা আংশিকভাবে এবং অত্যন্ত ত্রুটি-পূর্ণভাবে সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতেছে ; অথচ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ছাত্রেরা 'শিক্ষাগ্রহণের' উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া, 'সামাজিক অভিজ্ঞান-সংগ্রহের' উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। সমাজের ছাত্রের পিতামাতার নিকটও তাহার মূল্য তাহার সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারও হইয়া থাকে উহার ছাত্রদিগকে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করাইয়া দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তিতে। শিক্ষাপদ্ধতির ভালমন্দ, শিক্ষকের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারও একই ভিত্তিতে হইতেছে। এই অবস্থায় বাহ্যিক পরীক্ষা বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষায় পাশের গুরুত্ব অধিকতর হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষা, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (পূর্বে আলোচিত) বিস্মৃত হইয়া বাহ্যিক পরীক্ষার অনুকরণ করিতেছে ; বিদ্যালয়ের পাঠের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাপদ্ধতি শুধু বাহ্যিক পরীক্ষার চাহিদা মিটাইতেই ব্যস্ত। এই অবস্থায় বাহ্যিক পরীক্ষাকে সংস্কার বা উহাকে একেবারে উঠাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষার কোন সংস্কারই সম্ভব হইবে না। বাহ্যিক শিক্ষার চাহিদা মিটাইতে গিয়া শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্র কুশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে (না বুঝিয়া মুখস্থ করার অভ্যাস, অর্থপুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি প্রভৃতি)। শিক্ষাপদ্ধতির কোন সংস্কারের চেষ্টা করিতে গেলে শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই শঙ্কিত হইয়া পড়েন, পাছে বাহ্যিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির কোন ব্যাঘাত ঘটে।

তবু শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বাহ্যিক পরীক্ষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কোন দেশই এখনও তাহা করে নাই। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরি-স্থিতিতে, যেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর আস্থা রাখিতে পারি না সেখানে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র দানের প্রয়োজনে বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের চিন্তা করা যায় না। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশনও এই মতই পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যিক পরীক্ষার সংখ্যা সম্ভবমত কমাইয়া দিতে

হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দিয়া কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হইতে ছাত্রদের অব্যাহতি দিলেন বলিয়া মনে করেন। প্রি-ইউনিভারসিটি এবং প্রিপেরেটরি কোর্সের শেষে একটা করিয়া পরীক্ষা থাকিবে বটে কিন্তু ঐগুলি বাহ্যিক পরীক্ষা না হইয়া আভ্যন্তরিক পরীক্ষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নপত্র-রচনা এবং নম্বরদান উভয়ই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের প্রশ্নপত্র-রচনাকারী বা পরীক্ষা কেহই নবলব্ধ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতেছেন না। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে বাহ্যিক পরীক্ষার গলদ কিছুটা কমিবে বলিয়া কমিশন আশা করেন। সর্বশেষে কমিশনের মতে কোন পরীক্ষাই সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক থাকা উচিত নহে। ছাত্রের জ্ঞানের মান নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া আভ্যন্তরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরও গুরুত্ব দিতে হইবে। কিভাবে পরীক্ষাপদ্ধতিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক করা চলে এবং কিভাবে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্রদানে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া চলে তাহা ক্রমে ক্রমে আমরা আলোচনা করিব।

এই আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আমাদের সমাজে যে এক নূতন ধরণের বাহ্যিক পরীক্ষার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার সহিত ঐ সব পরীক্ষার এখনও তেমন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক অভিজ্ঞানপত্র-দানের জন্য গৃহীত বাহ্যিক পরীক্ষার মত ইহারাও হয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ I.A S., B.C.S. পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃত্তিতে নিয়োগকারীর প্রয়োজনেই ঐ ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; উপযুক্ত লোককে বাছাই করিয়া কর্মে নিয়োগ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে সরকার সমাজের সর্বপ্রধান নিয়োগকারী হইয়া পড়িতেছেন এবং সরকারী নিয়োগ যাহাতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে হয় তাহার জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন। বর্তমানে কেরানী নিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম পদে নিয়োগের জন্য নানা ধরণের পরীক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট যখন অধিকাংশ সরকারী কার্যের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে তখন প্রায় প্রত্যেক

সরকারী চাকুরিতেই সম্ভবতঃ পরীক্ষার ভিত্তিতে লোকনিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। কাজেই সমাজ-জীবনে তথা শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ সব পরীক্ষা প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সরকার ছাড়াও "টাটা" প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও হয়ত লোকনিয়োগের জন্য পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে পারে। ইহা ছাড়াও এমন অনেক বৃত্তিশিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের প্রবেশ পরীক্ষা (Admission Test) যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। সংক্ষেপে, বাহ্যিক পরীক্ষার অপকারিতা হইতে শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের যতগুলি সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক পরীক্ষা আছে তাহাদের সবগুলিকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সহিত একটি করিয়া পরীক্ষাগ্রহণ বিশেষজ্ঞ সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনের কথা অনেকে এখনই আলোচনা করিতেছেন।

আভ্যন্তরিক পরীক্ষা—আভ্যন্তরিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যভেদে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা যে বিভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়-গুলি শুধু অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা ব্যতীত অন্য দুই ধরণের পরীক্ষার সহিত মোটেই পরিচিত নহে। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার ব্যাপারেও নিজের উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া বিদ্যালয় বাহ্যিক পরীক্ষার (স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার) অনুকরণ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষাগুলিও স্কুল ফাইন্যালের মত ৩ ঘণ্টা ধরিয়া হয় (প্রতিটি পেপার) ; উহাদের প্রশ্নপত্রের ধরণ এবং নম্বরদানের পদ্ধতিও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মত। ফলে বাহ্যিক পরীক্ষার অধিকাংশ দোষ-ত্রুটিই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষায়ও বর্তাইয়াছে। এমনকি আভ্যন্তরিক পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তাহাও আমরা একবারে বিস্মৃত হইয়াছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষা শিক্ষার কোন প্রয়োজনেই লাগিতেছে না। কি উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষকগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা আশা করেন যে, পরীক্ষা ছাত্রদিগকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করিবে। প্রকৃতপক্ষে কোন ছাত্রই পরীক্ষা দিতে উৎসাহ বোধ করে না। পরীক্ষার 'ভয়ে' পড়াশুনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন বিদ্যালয়কে

এই ভয় আরও কার্যকরী করিবার জন্য বছরে ৩।৪ বার মার্ক রিডিং (mark-reading) করিতে দেখিয়াছি—স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষকগণের সামনে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রেরা পরীক্ষায় নিজ নিজ নম্বর অনুসারে দাঁড়ায় এবং ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে নিজ ক্লাসে গিয়া বসে। অর্থাৎ পরীক্ষা, ছাত্রদিগকে পড়াশুনা করিতে বাধ্য করার নিমিত্ত এক ধরণের পুরস্কার বা শাস্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'মার্ক রিডিং প্যারেডে' যাহাদের প্রথম দিকে স্থান হইল তাহারা প্রশংসা এবং বিদ্যালয়ে সামাজিক মর্যাদা পুরস্কার হিসাবে পাইল এবং যাহারা নিচের দিকে পড়িল তাহারা তিরস্কার এবং সামাজিক হীনতা শাস্তিহিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্রথম ৫।৬টি ছাত্রের নিকট পরীক্ষা পুরস্কারের প্রলোভন এবং অবশিষ্টদের নিকট শাস্তির আশঙ্কা লইয়া উপস্থিত হয়। আমাদের মনে থাকে না যে, সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন বা শাস্তির আশঙ্কায় কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে উপযুক্তভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশই যে শুধু হইতে পারে না এমন নহে, ইহার ফলে চরিত্রের বিকৃতিও অনিবার্য। তারপর একরকমের পুরস্কার বা শাসন দীর্ঘ দিন কার্যকরী থাকে না। তাই পরীক্ষার প্রলোভন বা আশঙ্কা ছাত্রদের সম্মুখে সমানভাবে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পড়াশুনার প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতেছে। অপর দিকে তাহাদের মধ্যে নকল করা, মুখস্থ করা প্রভৃতি নানা রকমের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাদের চরিত্রের বিকৃতি ঘটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের বিদ্যালয়ের পড়াশুনার উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবকদের জানানো উচিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন ইহা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কারণ-নির্ণয়কারী (Diognostic) না হওয়ার দরুণ অভিভাবকগণ পরীক্ষার ফলাফল হইতে ছাত্র পড়াশুনায় ভাল কি মন্দ এই সংবাদ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই জানিতে পারেন না—কিভাবে তাহাদিগকে পড়াশুনায় উন্নততর করা যায় তাহার কোন ইঙ্গিতই ঐ ধরণের পরীক্ষার ফলাফল হইতে পাওয়া যায় না। ফলে অভিভাবকগণ ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাহাকে তিরস্কার করিতে পারেন বা তাহার জন্য গৃহশিক্ষক রাখিতে পারেন, কিন্তু পড়াশুনায় উন্নতি করিতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না (শুধু গৃহশিক্ষক রাখিলেই পড়াশুনায় উন্নতি হয় না, এসত্য এখন হয়ত অনেকে

উপলব্ধি করিয়াছেন)। তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করিবার পূর্বে তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া সকল বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই মনে করেন। এই প্রয়োজনের কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু ছাত্রদের এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করার ব্যাপারে বৎসরের শেষে একটি পরীক্ষাগ্রহণই যথেষ্ট, না সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যান্মাসিক পরীক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন, একথা কেহই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক বা যান্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অনুকরণে শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ছাত্রদিগকে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়া থাকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-রচনার ধরণ এবং উত্তর-পত্র পরীক্ষার পদ্ধতিও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মত হওয়ায় ঐসব পরীক্ষার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাহাতে গুরুতর গলদ থাকে (ঐসব গলদের কথা পরে আলোচিত হইবে)। সংক্ষেপে বর্তমানে আমরা যেভাবে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছি তাহাতে শিক্ষার কোন প্রয়োজন সাধিত না হইয়া বরং অপকারই হইতেছে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা-সংস্কারের চেষ্টা—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক পরীক্ষা উভয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ের সকল কার্যে উহাদের অবাঞ্ছিত প্রভাব শিক্ষাদানকার্যকে প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর পরীক্ষার কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন লিখিয়াছেন, "..." the dead weight of the examination has tended to curb the teacher's initiative, to stereotype the curriculum, to promote the mechanical and lifeless methods of teaching, to discharge all spirit of experimentation and to place the stress on wrong or unimportant things in education." পরীক্ষার বোঝা শিক্ষাব্যবস্থার ঘাড়ের উপর চাপিয়া থাকিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গতানুগতিক পাঠ্যসূচী, যান্ত্রিক এবং প্রাণহীন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার জন্যও এই ধরণের পরীক্ষা অনেকখানি দায়ী। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করিয়া ভ্রান্ত বা অপেক্ষাকৃত গৌণ শিক্ষার

উদ্দেশ্যের উপর জোর দিতে বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা আমাদিগকে প্ররোচিত করিতেছে। ভারত সরকারের পরীক্ষা-সংস্কার বিষয়ে আমেরিকান পরামর্শদাতা ডাঃ ব্লুম আমাদের শিক্ষাসংস্কার-সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত পোষণ করেন— "The (present education) System consisting of examinations, syllabi, teaching methods and instructional materials—has formed a grand conspiracy to persuade every one involved in it to be lieve that learning is to be equated with rote memorization." বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা, পাঠ্যসূচী, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক সকলে যেন এক মহা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আমাদের সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, শিক্ষা এবং তোতাবৃত্তি একই কথা। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা এক 'পাপচক্রের' (vicious circle) মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই পাপচক্রের অবসান ঘটাইতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হার্টস তাঁহার 'An Examination of Examinations' পুস্তকে আমাদের নম্বরদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া (পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে) উহার সংস্কারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এই সংস্থা পরীক্ষাসংস্কারের জন্য বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের উদ্যোগে ভারতের শিক্ষাবিদ্ এবং স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া ভূপালে এক 'আলোচনা সভা' (Seminar) আহ্বান করা হয়। এই সভা পরীক্ষাসংস্কার-সমস্যা সকল দিক হইতে আলোচনা করিয়া ইহার সমাধানের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। এই পরামর্শগুলি মোটামুটিভাবে সর্বত্রই সমর্থিত হইয়াছে। তারপর পরীক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডাঃ ব্লুমকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনানো হয়। ডাঃ ব্লুম্ যেমন একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত পরীক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা চালান অপরদিকে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের সহিত এই সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে আলোচনাসভায় যোগ দেন। অধুনা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন দিল্লীতে পরীক্ষাসংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসংস্কার সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্

সেকেণ্ডারী এডুকেশন স্থায়িভাবে একটি পরীক্ষাবিষয়ক সাব-কমিটিও (Evaluation Sub-Committee) গঠন করিয়াছেন। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার জন্য এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত প্রতি রাষ্ট্রে একটি করিয়া ষ্টেট ইভেলিউসন ইউনিট্ (State Evaluation unit) স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিম বাংলায় এখনও ষ্টেট্ ইভোলিউশান ইউনিট স্থাপিত হয় নাই। ব্যুরো অব্ এডুকেশন্যাল ও সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ নিজের দায়িত্বের অংশ হিসাবে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ চালু করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই সংস্থা ষ্টেট্ ইভোলিউশান ইউনিট্ যে ধরণের কাজ করিবে বলিয়া আশা করা যায় সে ধরণের কাজে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। তারপর প্রতি বৎসরই অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের উদ্যোগে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি) একত্র মিলিত হইয়া পরীক্ষাসংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিম বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরীক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটি এই ব্যাপারে কিছুটা কাজও করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষাসংস্কারের কাজে যে দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কাজে বাধা এত বেশী যে বিশেষ কোন সফলতা এখনও লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

পরীক্ষাগ্রহণের বৈজ্ঞানিক নীতি—পরীক্ষাসংস্কারের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা আমাদের এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। গতানুগতিকতার দাসত্ব না করিয়া সমগ্র পরীক্ষাগ্রহণ কার্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সংগৃহীত জ্ঞানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি একটি পরিমাপ যন্ত্রমাত্র। যেমন, কাপড় পরিমাপের জন্য গজের প্রচলন হইয়াছে, চাউলের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য দাড়িপাল্লা তৈরী করা হইয়াছে, রাসায়নিক দ্রব্যের ওজন ঠিক করিবার জন্য মেজার গ্লাস (Measure glass) উদ্ভাবন করা হইয়াছে, তেমনি শিক্ষার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এই কার্যে সর্বপ্রথমই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পরিমাপের বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে পরিমাপ-যন্ত্রের পার্থক্য হইয়া থাকে। কাপড়ের এবং চাউলের পরিমাপ যেমন এক মানযন্ত্র দ্বারা করা যায় না, অর্জিত জ্ঞান এবং চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের পরীক্ষাও তেমনি একই পদ্ধতিতে করা সম্ভব

নয়। তাই পরীক্ষায় উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর পার্থক্য পরীক্ষা-পদ্ধতির পার্থক্য অনুসারে হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিমাপ-যন্ত্র নির্ভরযোগ্য না হইলে পরিমাপ নির্ভুল হইতে পারে না। অর্থাৎ কাপড় মাপিবার 'গজ' যদি এমন হয় যে একই কাপড় দুই বার মাপিলে দুই মাপ হয় তবে ঐ গজের উপর নির্ভর করা চলে না। একই কাপড় অল্প সময়ের ব্যবধানে পরিমাপ করিলে কম-বেশী হইতে পারে না ; হয়ত বা গজটি ইলাষ্টিক দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া বারবার টানাটানিতে লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, তাই ঐ 'গজ' দিয়া একই কাপড় দ্বিতীয় বার মাপিলে প্রথমবারের চেয়ে মাপ কম হইয়া পড়িয়াছে, পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই কথা সত্য। প্রথমতঃ, আমাদের পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বা রিলায়েবিলিটির (Reliability) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে ; অর্থাৎ অল্প সময়ের ব্যবধানে কোন ছাত্রকে একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্য লইয়া বার বার পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি একই হওয়া উচিত। ইহা না হইলে পরীক্ষাপদ্ধতি নির্ভরযোগ্য (Reliable) নয় বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ঐ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা অনুচিত মনে করিতে হইবে।

তারপর, মনে রাখিতে হইবে যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া নহে ; সমান বয়সের বা এক-শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে কাহারও স্থান নির্ণয় করাই পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধরা যাউক, আমরা কোন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্রের ইংরেজীর জ্ঞান পরীক্ষা করিতে চাই। আমরা জানিতে চাই যে, ঐ শ্রেণীর ৪০টি ছাত্রের মধ্যে তাহার ইংরেজীর জ্ঞান কাহার অপেক্ষা কতখানি কম বা বেশী। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া নম্বর দেওয়া হয়। অর্থাৎ দুইটি ছাত্রের মধ্যে ইংরাজীর পরীক্ষায় একটি ৩০ অপরটি যদি ৪০ পায় তাহা হইলে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাত্রটির ইংরেজী জ্ঞান ১০ নম্বরের পরিমাণ বেশী এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি। কিন্তু নম্বর না দিয়া আমরা যদি বলিতে পারি যে. ইংরেজী জ্ঞানে প্রথম ছাত্রটি শ্রেণীর মধ্যে মাঝামাঝি এবং দ্বিতীয় ছাত্রটি তাহার এক "পয়েণ্ট" উপরে। সমগ্র শ্রেণীকে পাঁচটি বিভাগে বা পয়েণ্টে ভাগ করিলে উহা মোটামুটি এই ধরণের হইতে পারে।

অনেক নীচে | নীচে | মাঝারি | উপরে | অনেক উপরে

ইংরেজী জ্ঞানে শ্রেণীতে ছাত্রটির স্থান আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হইতে পারে। আবার কোন পরীক্ষায় ছাত্রটির স্থানের সহিত অপর পরীক্ষায় তাহার স্থানের তুলনা করিতে হইলে (সে উন্নতি বা অবনতির পথে চলিতেছে ইহা বিচারের উদ্দেশ্যে) নম্বর দেওয়া অপেক্ষা উপরি-উক্ত ধরণের বিচার বেশী কার্যকরী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দুই পরীক্ষার মানের তারতম্যের বিচারে এক পরীক্ষায় ৩০ নম্বর পাওয়ায় ছাত্রটির স্থান 'মাঝারি' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে অথচ অপর পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থান মাঝারির নীচে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কাজেই, কেবল মাত্র নম্বরের দ্বারা শ্রেণীতে কোন ছাত্রের 'স্থান' নির্ধারণ করা যায় না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু নিজ বিদ্যালয়ে নিজ শ্রেণীতে ছাত্রের স্থান নির্ধারণের সার্থকতা অপেক্ষা সমগ্র রাষ্ট্রের (যেমন, পশ্চিমবঙ্গ) ছাত্রদের (নিজ শ্রেণীর) মধ্যে তাহার স্থান নির্ধারণ করার সার্থকতা অধিক। পরীক্ষায় নম্বরদান কালে নম্বরদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা আমাদের অনেকরই মনে থাকে না।

সর্বশেষে, যে বস্তু পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, ঐ পরীক্ষার দ্বারা উহা ঠিক ঠিক পরিমাপ হইতেছে কিনা ইহাও যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। কোন পার্থিব (material) বস্তু পরিমাপের বেলা ঐ ধরণের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ, বস্তুটি আমাদের চোখের সামনে থাকে; কাপড় মাপিতেছে কি চাল মাপিতেছে, পাগল না হইলে এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবে না। কিন্তু জ্ঞান, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, আগ্রহ, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতিতো আর দৃশ্যবস্তু নহে। উহাদের একটি পরিমাপ করিতে গিয়া অপরটি পরিমাপ করা অসম্ভব নহে; অনেক সময়ই আমরা ঐরূপ ভুল করিয়া থাকি। ধরা যাউক, রচনামূলক প্রশ্নের সাহায্যে ইতিহাসের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা হয়ত ছাত্রের ভাষাজ্ঞান ও রচনার ক্ষমতাই বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি। তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতিতে নানারূপ পদ্ধতি ও কৌশলের সাহায্যে যাহা পরিমাপের চেষ্টা করা হইতেছে, ঠিক তাহাই পরিমাপ করা যাইতেছে কিনা উহা বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। এই যাচাই করাকে ইংরেজীতে ভ্যালিডিটি (validity) যাচাই করা বলে।

আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা—উপরি-উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশের প্রচলিত বাহ্যিক পরীক্ষাগুলির সংস্কারের বিষয়

আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া আমরা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার কথাই আলোচনা করিব। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য অপরাপর সকল বাহ্যিক পরীক্ষা সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটি প্রযোজ্য।

শিক্ষা-পরিমাপ যন্ত্রের রিলায়েবিলিটি ও ভ্যালিডিটি—অধুনা, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় থিওরিটিক্যাল (Theoretical) ও প্র্যাকৃটিক্যাল (Practical) উভয়বিধ পরীক্ষাই গ্রহণ করা হইতেছে। বর্তমান আলোচনা মোটামুটি থিওরিটিক্যাল (Theoretical) পরীক্ষার বিষয়েই সীমাবদ্ধ করা হইল।

এই আলোচনার প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র (উহার নম্বরদান-পদ্ধতিসহ) এক একটি পরিমাপ যন্ত্র। এই মানযন্ত্র প্রতিবৎসর নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাপড় পরিমাপের মানযন্ত্র 'গজের' সহিত তুলনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন নহে যে, একটি গজ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল এবং তাহার সাহায্যে কাপড় ধুতি, শাড়ি, জামার ছিট ইত্যাদি সব কিছু বৎসরের পর বৎসর পরিমাপ করা যাইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে প্রতি বৎসর প্রতিটি প্রশ্নপত্রের রিলায়েবিলিটি (Reliability) এবং ভ্যালিডিটি (Validity) নূতন ভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে তাহা সম্ভব না হইলে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 'মানসিক পরীক্ষার' (Mental Test), 'রিলাইয়েবিলিটি' ও 'ভ্যালিডিটি' বৃদ্ধি পায় বলিয়া আমরা জানি বিধিবদ্ধভাবে সেই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রশ্নপত্র রূপ পরিমাপ যন্ত্র—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের শিক্ষা-পরিমাপের উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। ডাঃ ব্লুম তাঁহার বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়া আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দোষ ত্রুটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন—The questions I found in these examinations required little more than rote memorization of some details presumably learned in the class-room. Inspection and comparison of examinations in different years revealed something of the pattern of these questions : favourite questions are repeated ; slight changes are made in the wording of questions in successive years. Most of the questions appeared to be of a sort that might be thought about on the last day or a

short time before the examination-material was due. Rarely did I encounter questions which suggested that the paper-setter had given careful thought to the matter over an extended period of time. In short, the questions were routine and stereotyped—as though every one was quite weary with the system and was mainly going through the formalities required by it. সংক্ষেপে ডাঃ ব্লুমের মন্তব্য এরূপ দাঁড়ায়—স্কুল ফাইন্যালের প্রশ্নপত্রগুলি (সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ে শিখাইয়া দেওয়া) শুধু তোতাবৃত্তিরই পরীক্ষা করে। তারপর বিভিন্ন বৎসরের পরীক্ষাপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় এক ধরণের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। প্রশ্নপত্র রচনাকারীর হয়ত কয়েকটি প্রিয় প্রশ্ন আছে; সামান্য ভাষার পরিবর্তন করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহাই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। প্রশ্নগুলির ধরণ এমন যে দেখিয়া মনে হয়, প্রশ্নপত্র, কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আগের দিন বসিয়া উহা রচনা করা হইয়াছে—প্রশ্নপত্রগুলিকে যথোচিত যত্ন এবং দীর্ঘদিনের চিন্তা এবং পরিশ্রমের ফল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। সংক্ষেপে প্রশ্নপত্রগুলি একেবারেই যান্ত্রিক এবং গতানুগতিক। মনে হয় সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন এই ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কোন রকমে বাহ্যিক আইনকানুনগুলি বাঁচাইয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

যে সব উপরি-উক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার প্রথমেই মনে রাখিতে হয় যে, ঠিক কি পরিমাপ করার চেষ্টা করা হইতেছে, এ বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনাকারীর কোন সঠিক ধারণা থাকে না। প্রশ্নপত্র রচনার জন্য পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠ্যসূচী থাকে বটে কিন্তু উহা হইতে কোন বিষয় পাঠ করার বা তাহা পরীক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় না। ডাঃ ব্লুম আমাদের মাধ্যমিক পাঠ্য-সূচী সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন ইহা প্রাসঙ্গিক হইবে মনে করি।

ডাঃ ব্লুমের মতে ঐ পাঠ্যসূচীগুলি কতকগুলি বিষয়ের (topics) তালিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করা সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষকদের চেষ্টা থাকে যে কোন রকমে বিষয়গুলি, (পাঠ্য পুস্তকে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ছাত্রদের মুখস্থ করাইয়া দেওয়া এবং পরীক্ষকের উদ্দেশ্য থাকে ঐগুলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ

সেগুলি ছাত্রেরা মুখস্থ করিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা। ঐ ধরণের পাঠ্যসূচী সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষকের পক্ষে ঠিক কি পরিমাপ করিতে হইবে সে বিষয়ে মন স্থির করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এক জিনিষের পরিবর্তে অপর জিনিষ পরিমাপিত হইলে ছাত্রসম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আমাদের সত্যের পরিবর্তে ভ্রান্তির পথে লইয়া যাইবে এবং পরীক্ষার ভ্যালিডিটি (validity) নষ্ট হইবে। ধরা যাউক, বিজ্ঞানের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা যদি এমন ধরণের প্রশ্ন করি যে, তাহার উত্তর হইতে বিশেষভাবে রচনার ক্ষমতাই পরীক্ষিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা এক জিনিষের বদলে অপর জিনিষ পরিমাপ করিতেছি। কাজেই যে বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচনা করিতেছি গ্রহণের বিষয় পড়ানোর তথা পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্য প্রথমেই নির্দিষ্টভাবে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক, আমি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর প্রশ্নপত্র রচনা করিতে বসিয়াছি। প্রথমেই আমি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কি পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিব সে বিষয় যেন মন স্থির করিয়া লই—

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য

১। ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলীর কার্যকারণ নির্ণয়ের ক্ষমতা।

২। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সময়ের দিক হইতে পারম্পর্যের জ্ঞান।

৩। উহাদের ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান।

৪। ভারত ইতিহাসের উপর বিশেষ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারকারী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫। ভারত ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তির অবদান সম্বন্ধে ধারণা।

৬। ভারতের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করার ক্ষমতা।

৭। ইতিহাসপাঠে আগ্রহের পরিমাণ।

শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। প্রশ্নপত্র রচনাকালে ঐ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে কতখানি গুরুত্ব দিতে হইবে তাহাও স্থির করিয়া লইতে হইবে। ধরা যাউক, ইতিহাস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যদি আমি ১০০ নম্বরের উপর রচনা করিতে চাই, তাহা হইলে ইতিহাস পরীক্ষার যে সাতটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টি পরীক্ষার জন্য কত নম্বরের উপর

প্রশ্ন করিব তাহা প্রথমেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। উপরি-উক্তভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলে পরীক্ষার ভ্যালিডিটি (validity) যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর আসে পরীক্ষা গ্রহণের পন্থা নির্ণয়ন-সমস্যা—কোন পদ্ধতিতে আমরা স্থিরীকৃত যোগ্যভাবে পরিমাপ করিতে পারি। নানা ধরণের পরীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে পরীক্ষা করা চলে। পরীক্ষার্থীদিগকে স্বতন্ত্রভাবে বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া (group) নির্দিষ্ট কাজ করিতে দিয়া, তাহার ভিত্তিতেও পরিমাপ করা চলে। আবার লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও আমরা পরীক্ষা করিয়া থাকি। স্কুল ফাইন্যালে বিভিন্ন বিষয়ে (subjects) আমরা যে পরীক্ষা করিতে চাই তাহা লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন ভাবে করা সম্ভব নহে; যদিও এই মাধ্যম কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অসন্তোষজনক মনে হইতে পারে (দৃষ্টান্ত, ইতিহাসপাঠে আগ্রহের পরিমাণ নির্ণয় করা)। লক্ষাধিক ছাত্রকে এক বিষয়ে একই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করার আর কোন পন্থাই আমাদের এখনও জানা নাই।

লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা আবার নানা ধরণের হইতে পারে—১। প্রচলিত, রচনামূলক (Essay-type); ২। ছোট উত্তরমূলক (Short answer-type); ৩। নৈর্ব্যক্তিক (Objective-type). নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা আবার দুই রকমের হইতে পারে—(ক) যাহা প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (standardised), (খ) যাহা প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত নহে।

উপরি-উক্ত এক একটি পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি এক একটি পরিমাপ-যন্ত্র। পরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে স্থির করিয়া লইবার পর চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন্ ধরণের পরিমাপ-যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ উদ্দেশ্যের পরীক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় রচনাক্ষমতা পরীক্ষা করিতে হইলে হয়ত রচনামূলক পরীক্ষাপদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শব্দ-সম্ভারের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হয়ত অধিকতর উপযুক্ত। কোন এক বিশেষ ধরণের পদ্ধতির সাহায্যে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির সব কয়টিকে কিছুতেই যথাযথভাবে পরীক্ষা করা চলিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাহ্যিক পরীক্ষাগুলি নির্বিচারে রচনামূলক

পরীক্ষাকেই একমাত্র পরিমাপ-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। রচনামূলক পরীক্ষায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের রচনা লিখিতে বলা হয় এবং লিখিত রচনা হইতে যে কোন বিষয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ স্থির করিতে চেষ্টা করা হয়। একমাত্র অঙ্কের পরীক্ষায় ইহার ব্যতিক্রম হয়। অঙ্কের মাধ্যম ভাষা না হইয়া সংখ্যা হওয়ার দরুণই হয়ত ইহা রচনামূলক পরীক্ষার আওতা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। পরিমাপ-যন্ত্র হিসাবে রচনামূলক পরীক্ষার দোষ-ত্রুটি নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে। ইহাকে বাহ্যিক-পরীক্ষা বা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনাও বলা যাইতে পারে।

১। তিন ঘণ্টা পরীক্ষা গ্রহণকালের মধ্যে (পরীক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তির জন্যই একসঙ্গে ইহার অধিক সময় পরীক্ষা গ্রহণ করা চলে না) পরীক্ষার্থীকে স্বভাবতঃ ৫।৬টির বেশী রচনা লিখিতে বলা চলে না। কিন্তু যে-কোন বিষয়ে শিক্ষা-পরিমাপের উদ্দেশ্য স্থির করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে, তাহাদেরই সংখ্যা ৬।৭ টির কম নহে। ফলে প্রত্যেকটি 'উদ্দেশ্যের' জন্য একটি করিয়া প্রশ্ন করাও রচনামূলক পরীক্ষায় সম্ভবপর নহে। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রশ্নের সংখ্যার উপর পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (reliability) অনেকখানি নির্ভর করে। নানা কারণেই এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, দীর্ঘ দিন ধরিয়া (এক, দুই বা তিন বৎসর) যে শিক্ষা দেওয়া হইল ৫টি বা ৬টি রচনার মাধ্যমে তাহার সুষ্ঠু পরিমাপ কিছুতেই সম্ভব নহে। বেশী জিনিষ অল্প সময়ের মধ্যে পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের নমুনার (sample) উপর নির্ভর করিতে হয়। ধরা যাউক আমাকে যদি অল্প সময়ের মধ্যে একশত বস্তা চালের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, তবে প্রথমেই আমাকে চালের বস্তাগুলিকে তাহাদের প্রকারভেদে (বাঘতুলসী, চামরমণি ইত্যাদি) ভাগ করিয়া লইতে হইবে এবং প্রত্যেক ভাগ হইতে ২।৩টি বস্তার কিছু কিছু চাল লইয়া পরীক্ষা করিয়া ঐ একশত বস্তা চালের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সমস্যাও অনেকটা একই ধরণের। অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর ২ বা ৩ বৎসরের শিক্ষার পরিমাপ করিতে হইবে। প্রশ্নপত্র রচনার প্রারম্ভেই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার ক্ষেত্রকে যে ভাগ করিয়া লইতে হয় এ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। তারপর প্রত্যেক বিভাগে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া প্রশ্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি

যে, রচনামূলক পরীক্ষায় শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়াও প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। ফলে ঐ ধরণের পরীক্ষায়, পরীক্ষক শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্র হইতে ৫।৬টি প্রশ্ন প্রায় নিজের খেয়াল খুশীমত বাছিয়া লন। শিক্ষাক্ষেত্রের পরিধির তুলনায় প্রশ্নের সংখ্যা কম থাকায় তিনি বিধিবদ্ধভাবে প্রশ্ন বাছাই করতে পারেন না। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রতি বিষয়েই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন স্থির হইয়া গিয়াছে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার ঐ প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞাসিত হয়। ফলে 'প্রশ্নোত্তরিকা', বোধিনী' প্রভৃতি ধরণের পুস্তকের প্রচলন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐসব পুস্তকের সাহায্যে "বাছাই করা প্রশ্ন" মুখস্থ করিয়া ছাত্রেরা পরীক্ষা দিতে আসিতেছে। "বাছাই করা প্রশ্নের" বাহিরে প্রশ্ন করিলে দলবদ্ধভাবে ছাত্রগণ পরীক্ষা না দিয়া নানারূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতেছে। আবার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার ধৈর্য পর্যন্ত অনেক পরীক্ষার্থীর থাকে না। তাহারা 'অনুমানের' উপর নির্ভর করিয়া উহাদের মধ্যে আবার বাছাই করিয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে। অনুমান অনুযায়ী প্রশ্ন আসিলে তাহারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় আর তাহা না হইলে একেবারে 'ফেইল' হইয়া যায়। পরীক্ষা দেওয়া যেন অনেকটা জুয়াখেলার মত হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষার ফলাফল লটারিতে টাকা পাওয়ার মত যে 'ভাগ্যের কথা' ইহা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হইল। কোন স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিয়া নম্বর পাইল শূন্য। কারণ সে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটিরও উত্তর না করিয়া তাহার মুখস্থ করা অপর প্রশ্নের উত্তর করিয়াছে। তাহার মুখস্থের মধ্যে প্রশ্ন না আসায় সে দমিয়া না গিয়া যে কয়টি প্রশ্ন মুখস্থ করিয়াছিল তাহার মধ্য হইতে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করিয়া গিয়াছে। তাহার 'ভাগ্যে' নিজ বাছাই করা প্রশ্নগুলি যদি পরীক্ষায় আসিয়া যাইত তবে সে প্রায় ৬০ নম্বর পাইত; দুর্ভাগ্যের ফলে উহাদের মধ্যে একটিও না আসায় সে শূন্য পাইল। এই অবস্থায় পরীক্ষার ফলের অনিশ্চয়তা থাকার দরুণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-কালীন উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বশেষে এই ধরণের পরিমাপ-যন্ত্রের (প্রশ্নপত্রের) সাহায্যে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা হইতে কি যে পরিমাপ হইতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। পরীক্ষা

করিতে হইবে বলিয়াই যেন পরীক্ষা করা হইতেছে। স্বভাবতই ঐ ধরণের পরীক্ষার 'রিলায়েবিলিটি' ও 'ভ্যালিডিটি' দুইই খুব কম।

২। রচনামূলক পরীক্ষায় ভাষার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া বিষয়বস্তু নির্বিশেষে, লিখিত ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব পড়িয়া যায়। স্কুল-ফাইন্যালের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের উপরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হয় যে, বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাইবে (বানান ভুল করা বাঞ্ছনীয় নয় নিশ্চয়, কিন্তু ইহা ভূগোল বা ইতিহাসের পরীক্ষার পরীক্ষণীয় অন্যতম নহে ইহাও সত্য)। পরীক্ষকদের নিকট নির্দেশ যায় যে, উত্তর পরীক্ষা-কালে তাহারা যেন চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু নির্দেশ-দানকারীরা হয়ত ভুলিয়া যান যে, পরীক্ষার্থীকে ঐসব গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ কেবলমাত্র লিখিত ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া যাইতেছে—অনেক ছাত্রের ঐসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র লিখিত ভাষায় আত্মপ্রকাশে দক্ষতা নাই বলিয়া পরীক্ষক তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তবিচার করিতেছেন। সংক্ষেপে, অঙ্ক ব্যতীত অপর প্রায় সকল বিষয়েই প্রচলিত পরীক্ষা প্রধানতঃ রচনাশক্তির পরীক্ষাই করিয়া আসিতেছে।

৩। সাহিত্য-পরীক্ষায় রচনা শক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ধরণের প্রশ্ন করা হয়, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও প্রশ্ন করিতে মোটামুটি তাহারই অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ধরা যাক্, ইতিহাস পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকিল, 'আকবরের জীবনী পর্যালোচনা কর'। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে (সাহিত্যে 'দেশ পর্যটন' সম্বন্ধে রচনা লেখার মত) চিন্তাশক্তি, কল্পনাপ্রবণতা, ভাষার সাবলীলতা প্রভৃতি প্রকাশের প্রচুর সুযোগ থাকে। কিন্তু ইতিহাস পরীক্ষায় ইহাদের একটিকেও তো আমরা প্রত্যক্ষভাগে পরিমাপ করিতে চাহি না। কোন বিশেষ বিষয় নিদিষ্ট করিয়া না জিজ্ঞাসা করার জন্য ইতিহাস পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোনটির পরিমাপই এই প্রশ্নের সাহায্যে হইতে পারে না। তারপর, ঐ ধরণের প্রশ্নের বিভিন্ন প্রকারের উত্তর সম্ভব বলিয়া এবং কি পরিমাণ করা হইতেছে সে বিষয়ে পরীক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকে না বলিয়া পরীক্ষকে পরীক্ষকে নম্বরদানে গুরুতর পার্থক্য হয়। হার্টস্ সাহেব তাহার 'পরীক্ষার পরীক্ষা' (Examination of Examinations, 1935) নামক পুস্তকে এই পার্থক্য যে কত গুরুতর হইতে পারে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। একই পরীক্ষার খাতায় বিভিন্ন

পরীক্ষক স্বাধীনভাবে নম্বর দিলে পরস্পরের মধ্যে ২৫।৩০ নম্বরের পার্থক্য থাকাও কিছুই অসম্ভব নহে। পরীক্ষার্থীদের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময়েই কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষক ঠিক কি চান তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মনোমত উত্তর করিতে পারে না। প্রশ্নের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুণ পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং পরীক্ষার্থী উত্তর করিয়াছে 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য'। কিন্তু পরীক্ষক চান যে, এই প্রশ্নের উত্তরে সে চন্দ্রগুপ্তের বংশধারা এবং সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত তাঁহার জীবনীর পর্যালোচনা করিবে। কিন্তু প্রশ্নের ভাষায় পরীক্ষকের মনোভাব প্রকাশ না হওয়ার দরুণ জানা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থী তাহার মনোমত উত্তর করিতে পারিল না। এই পরিস্থিতির ফলে পরীক্ষার্থীরা নিজ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া উত্তর করিতে সাহস পায় না। 'নোট' বই-এর উত্তর না বুঝিয়া পরীক্ষার্থী মুখস্থ করে; আর নোট বই-এর লেখক যদি পরীক্ষক হন তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই কারণে নোট লেখকদের অধুনা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে না। কিন্তু ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে এই ধরণের আইন-কানুনের সাহায্যে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব নহে।

৪। রচনামূলক প্রশ্নপত্রের সবকয়টি প্রশ্নই মোটামুটিভাবে এক ধরণের সহজ বা কঠিন থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য ধরিতে হইলে প্রশ্নপত্রে সহজ ও কঠিন দুই ধরণের প্রশ্নই থাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন খুব কঠিন হইয়া পড়িলে, খুব ভাল ছেলে ব্যতীত অপর কেহ তাহার উত্তর করিতে পারে না। ফলে মাঝারি ও খারাপ ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য ধরা পরে না। প্রশ্ন সহজ হইলে সকল ছাত্রই তাহার উত্তর করিতে পারে এবং ফলে মাঝারি এবং ভাল ছাত্রদের মধ্যে প্রভেদ ধরা পড়ে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা করিলে কিছু প্রশ্ন সহজ, কিছু প্রশ্ন কঠিন এবং বেশীর ভাগ প্রশ্নই মাঝারি-ধরণের-কঠিন করিয়া রচনা করিতে হয়। যেখানে মাত্র ৫।৬টি প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে সেখানে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে প্রশ্ন রচনা করা সম্ভব নহে। রচনামূলক প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহাও ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র বিষয় না পড়িয়া অনুমানের ভিত্তিতে বাছাই করা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

মুখস্থ করিতে পরীক্ষার্থীদিগকে ইহা আরও উৎসাহিত করে। তারপর বিকল্প প্রশ্নগুলি অনেক সময়েই সমান সহজ বা কঠিন হয় না। সুতরাং 'উপযুক্ত' প্রশ্ন বাছাই করার উপরও পরীক্ষার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে।

৫। উত্তরপত্রে নম্বরদান-পদ্ধতির গলদ রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটি আরও বাড়াইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রতি প্রশ্নপত্রে ১০০ শত নম্বর থাকে। প্রশ্নপত্রকে পরিমাপ-যন্ত্র মনে করিলে বলিতে হয় যে, প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ আছে। পরীক্ষার্থীরা শূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া একশত পর্যন্ত যে-কোন নম্বর পাইতে পারে। জড়বস্তু পরিমাপ করার কোন যন্ত্রে পর্যন্ত বড় অধিক পরিমাণ বিভাগ থাকে না (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাপড় পরিমাপের জন্য প্রস্তুত গজে এক ইঞ্চি করিয়া ৩৬টি বিভাগ থাকে মাত্র)। মানসিক বস্তু পরিমাপের জন্য প্রস্তুত পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ থাকিলে এই যন্ত্র যে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের মান নির্ণয়নের জন্য অবশ্য সাধারণতঃ ১০ হইতে ২০ পর্যন্ত নম্বর বা বিভাগ থাকে। কিন্তু প্রশ্নের বিভাগ ১০ই হউক বা ২০ই হউক, কোন বিভাগই নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত নহে। অর্থাৎ ঠিক কি ধরণের উত্তর লিখিলে পরীক্ষার্থীকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে বা ঠিক কত নম্বর দিতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সঙ্কেত পরীক্ষকের নিকট থাকে না। (তুলনীয় 'গজের' ৩৬টি বিভাগের মধ্যে প্রত্যেকটি বিভাগ নির্দিষ্ট করা থাকে; কাপড়খানি কতখানি লম্বা হইলে ১০ ইঞ্চি বা ১২ ইঞ্চি হইবে গজের মধ্যে ফেলিয়া তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে। সমগ্র উত্তরটি পড়িয়া উহা মোটামুটি কত নম্বর পাইবে বা পরিমাপ-যন্ত্রের কোন্ বিভাগে পড়িবে সে সম্বন্ধে পরীক্ষককে স্বকীয় মত গঠন করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে ইংরাজিতে 'রেটিং' (Rating) বলে। এই পদ্ধতির সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ করা সম্ভব নহে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সূক্ষ্মতম তারতম্য ধরিতে চেষ্টা করিলে স্বভাবতই ভ্রান্ত হইতে হইবে। কয়লা পরিমাপের দাঁড়ি দিয়া যেমন কোন জিনিষের ওজন আধ ছটাক কম বা বেশী ধরা সম্ভব নয়, 'রেটিং' পদ্ধতির সাহায্যে তেমনি কোন প্রশ্নের উত্তরে এক নম্বর বা দুই নম্বর কম বা বেশী দিতে হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা সম্ভব নহে। 'রেটিং' পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্র সাতটির অতিরিক্ত বিভাগ থাকিলে পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভবনা অবশ্যই থাকিবে। প্রশ্নপত্ররূপ পরিমাপ-যন্ত্রে ১০১টি বিভাগ থাকার দরুণ 'রেটিং' পদ্ধতির

স্বাভাবিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে সব ব্যবস্থা আছে তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তাই বাস্তবক্ষেত্রে, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কোন ছাত্র কোন প্রশ্নের উত্তর করিয়া কত নম্বর পাইবে তাহা অনেকখানি পরীক্ষকের নিজের ধারণা এবং মেজাজ-মাজির উপর নির্ভর করে।

পরিচালনা-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির গলদ আরও বৃদ্ধি পায়। বাহিরের লোককে প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া আমাদের রীতিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের মান ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ ধারণা থাকে না। পাঠ্যসূচী যে প্রশ্নপত্রের রচনাকারীকে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার পরিধি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় "বাহিরের" পরীক্ষক তাঁহার পূর্ববর্তী প্রশ্নপত্র রচনাকারীর পদাঙ্কানুসরণ করেন (কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে প্রশ্নপত্র রচনার সময় পূর্ব বৎসরের একখানা প্রশ্নপত্র সর্বদাই পাঠাইয়া থাকেন)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপূর্ব বৎসরের প্রশ্নপত্র হইতে প্রশ্ন বাছাই করিয়া তিনি নিজের প্রশ্নপত্র রচনা করেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া একই ব্যক্তি একই বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করিলে এই কাজে আরও সুবিধা হয়। বস্তুত পক্ষে পাঠ্যসূচী হইতে যে সব প্রশ্ন বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া (Stock questions) পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়, সেইগুলিই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এবং ঐ প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে কোন পরীক্ষায় প্রশ্ন না পড়িলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখা দেয়। ঐ ধরণের প্রশ্নপত্রের জন্য কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে "নোট" বইএর প্রচলন এবং ছাত্রদের মধ্যে না বুঝিয়া মুখস্থ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

৭। কি ধরণের যোগ্যতা থাকিলে পরীক্ষকের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়, পরীক্ষক নিয়োগ করার সময় কর্তৃপক্ষ তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখেন না। প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও উপর এই কার্যের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়—পরীক্ষকগণের প্রশ্নপত্র রচনায় এবং উত্তর পত্র পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র রচনাকারীরা শুধু 'বাহিরের লোকই' নহেন, প্রশ্নপত্র রচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই নাই। ফলে, রচনামূলক প্রশ্নপত্রের রচনা এবং তাহার উত্তর পত্র

পরীক্ষাকে যতদূর উন্নত করা চলে ততদূরও করার কোন চেষ্টা হয় না। অধিকন্তু পরীক্ষকের অজ্ঞতার জন্য পরীক্ষার পদ্ধতির ত্রুটি আরও বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রশ্নপত্রের ভাষায় ত্রুটির জন্য অনেক সময় পরীক্ষার্থী এবং উত্তর-পত্র পরীক্ষাকারী উভয়েই বিভ্রান্ত হন। কখনও কখনও প্রশ্নের ভাষা হইতে ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে তাহা সঠিকভাবে বুঝা যায় না। ধরা যাক, প্রশ্ন থাকিল "লর্ড ক্লাইভ সম্বন্ধে টীকা লিখ"। এই টীকায় লর্ড ক্লাইভের জীবনী আলোচনা করিতে হইবে, না ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদানের আলোচনা করিতে হইবে, না তাঁহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলির উপর জোর দিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। ঐ ধরণের সাধারণ ভাবের (general) প্রশ্ন পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী। আবার কখনও কখনও প্রশ্নের ভাষা হইতে উহার উত্তর সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মায় তাহা প্রশ্নপত্র রচনাকারীর ধারণার সহিত মিলে না। এ বিষয়ে পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা উন্নত করার উপায়—স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কারের জন্য যে সব পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে, আলোচনার সুবিধার জন্য তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্বপ্রথমেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯১৭ খৃঃ) পরামর্শ দেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পত্র বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ সংস্থা (Central Advisory Board of Education)ও এই পরামর্শের সমর্থন করেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পত্র করিলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করণই হইবে মাধ্যমিক শিক্ষাদানের এক মাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গলদ থাকিলে পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদ দূর করা যাইবে না। স্কুল ফাইন্যালে রচনা-মূলক পরীক্ষার প্রবর্তন অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনেই করা হইয়াছে। বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নাম পরিবর্তিত করিয়া স্কুল-ফাইন্যাল রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র হিসাবেই তাহার যত মর্যাদা। ফলে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা পদ্ধতির সংস্কার করা সম্ভব হইতেছে না। বর্তমানে অনেকে দুই ধরণের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। যাহারা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র চাহিবে তাহাদের জন্য এক ধরণের পরীক্ষা এবং যাহারা মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তাহাদের জন্য অন্য অন্য ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরামর্শ কার্যকরী করিতে পারিলে পরীক্ষা গ্রহণ, পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি যে অধিকতর সুষ্ঠু এবং উদ্দেশ্যমূলক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে স্কুল ফাইন্যাল-পরীক্ষার গ্রহণের দায়িত্ব সরাইয়া লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের হাতে ঐ পরীক্ষার ভার ন্যস্ত করা কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশনের আর একটি প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব ভারতের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই (পশ্চিমবঙ্গেও) কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐরূপ পরিবর্তনের ফলে পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, শুধুমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ-সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। ঐ সংস্থার সঙ্গে একটি গবেষণা বিভাগও সংযুক্ত থাকিবে। বর্তমানে প্রতি রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ সংস্থা (State Evaluation Unit) স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা পরীক্ষাগ্রহণের জন্য স্থাপিত বিশেষজ্ঞ সংস্থার গবেষণা বিভাগরূপে কাজ করিতে পারে। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব ঐরূপ বিশেষজ্ঞ সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে এবং তাহাতে ফলও ভাল হইতেছে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন এক একটি রাষ্ট্রের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে একাধিক পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা স্থাপনের জন্যও প্রস্তাব করেন। কমিশনের মতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হইলে পরীক্ষাগ্রহণ কার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাইবে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি তেমন কিছু বৃদ্ধি করিতেছে না। অধিকন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইলে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের পরীক্ষার মান ভিন্ন ভিন্ন হইলে উহা আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিতে পারিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য খুব গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করিবে না।

প্রশ্নপত্র রচনার কার্যে বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে। এই নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ না করিলে বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র রচনা করা সম্ভব হইবে না। উত্তরপত্র-পরীক্ষকদেরও ঐ কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ট্রেনিং থাকা উচিত। আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্র পরীক্ষার বিশেষ স্থান থাকিলে উপরোক্ত ধরণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানযুক্ত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাব হইবে না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতৃ সংস্থা (Central Advisory Board of Education) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন উভয়েই দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বাহ্যিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিমাপ হইতে পারে না। আজকাল সকলেই একমত যে, বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের (Cumulative Record Card) ভিত্তিতে রক্ষিত ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিমাপ বাহ্যিক-পরীক্ষার পরিমাপের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারিলে ছাত্রের শিক্ষার সঠিক পরিমাপ কিছুতেই হইতে পারে না। আশা করা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সহিত কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখিতে পারিলে স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেটের জন্য একদিন হয়ত কোন বাহ্যিক পরীক্ষার প্রয়োজনই হইবে না। একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে রক্ষিত পরিমাপগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত সংস্কার (refinement) করিয়া তাহার ভিত্তিতে স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদকে পরামর্শ দিতে পারেন। ঐ সার্টিফিকেট কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের ধরণেরই হইবে। ইহাতে একদিকে ছাত্র সম্বন্ধে যেমন অনেক অধিক সংবাদ পাওয়া যাইবে অপর দিকে প্রতিটি সংবাদ বা পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতাও হইবে অনেক বেশী। বাহ্যিক পরীক্ষাগ্রহণের কুফল হইতেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মুক্ত হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে এখনও কিছুটা বিলম্ব হইবে, কারণ প্রথমে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড সুষ্ঠুভাবে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, সমগ্র স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা এক সঙ্গে গ্রহণ না করিয়া পৃথক পৃথক সময়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনই হিন্দী, সামাজিক-জ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা বিদ্যালয় কর্তৃক

নবম বা দশম শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইতেছে। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ভিত্তিতে প্রতি বিষয়ে কিছুটা নম্বর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সহিত যোগ হওয়ার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও এক সঙ্গে সমগ্র পরীক্ষা গ্রহণের দোষ-ত্রুটির কিছুটা প্রতিকার হইবে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে সকল বিষয়ে এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; প্রতি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানার্জন হইয়াছে কিনা ইহা পরিমাপের জন্যই পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রতিবিষয়ে সাপ্লিমেণ্টারী (Supplementary) পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পরীক্ষার্থীর নিকট পরীক্ষার বিভীষিকা হয়ত কিছুটা কমিয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। মাধ্যমিক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাপনা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপর্যদ শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তাহা প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে পাঠাইবেন। প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে যে পরীক্ষা-গ্রহণকার্যে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন বিষয়ে পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার পর প্রত্যেকটি "উদ্দেশ্যের" উপরই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন থাকে সে বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনাকারীকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রশ্নপত্রে তিন ধরণের প্রশ্ন যথা, রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক (কোন কোন বিষয়ে হয়ত রচনামূলক প্রশ্ন করার প্রয়োজন একেবারে না হইতে পারে) থাকিবে প্রত্যেক ভাগের প্রশ্নের উত্তরের জন্য আলাদা আলাদা সময় দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র প্রশ্নপত্রের উত্তরের জন্য সম্ভবতঃ তিন ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরণের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানতঃ সেই ধরণের প্রশ্নই করিতে হইবে। ধরা যাউক, লিখিত ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য রচনামূলক প্রশ্নই যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরীক্ষার পদ্ধতি হিসাবে রচনামূলক প্রশ্ন নানাদিক হইতে এত ত্রুটিপূর্ণ যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন করিলেও একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক ধরণের প্রশ্ন করাও হয়ত প্রয়োজন। রচনামূলক প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে; তাই সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার কৌশল সম্বন্ধে নীচে কিছুটা আলোচনা করা হইল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন—প্রশ্ন-রচনার কৌশলের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধরণের প্রশ্নের দোষ-ত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা করে। রচনামূলক প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন উহারা যেন একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত; সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের স্থান ঐ দুই ধরণের প্রশ্নের মাঝখানে বলা যাইতে পারে। রচনামূলক প্রশ্নে ঠিক কি উত্তর দিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট থাকে না। উত্তরদানকালে পরীক্ষার্থিগণ নিজ নিজ কল্পনা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি অনুসারে একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে করিতে পারে; আবার বিভিন্ন ধরণের উত্তর করিয়াও দুই পরীক্ষার্থী সমান নম্বর পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন পরীক্ষার্থী "দেশভ্রমণ" সম্বন্ধে রচনা লিখিতে গিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার উপর জোর দিল, আবার অপর কয়েকজন দেশভ্রমণের উপকারিতার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিল। ফলে রচনামূলক প্রশ্নের সাহায্যে কতকগুলি পরীক্ষণীয় বিষয়ের একসঙ্গে সাধারণভাবে পরীক্ষার চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র। কোন বিশেষ পরীক্ষণীয় বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করা ঐ ধরণের প্রশ্নের সাহায্যে সম্ভব নহে। পরিমাপের বিষয় সুনির্দিষ্ট না থাকার দরুণ রচনামূলক প্রশ্নে নম্বর দেওয়াও সহজ নহে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় কিন্তু পরিমাপের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট থাকে। এমন কি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উত্তরও দিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের ঐ উত্তরগুলি হইতে একটি বাছাই করিয়া লইতে হয় মাত্র। ফলে নৈর্ব্যক্তির পরীক্ষা কিছুটা যান্ত্রিক হইয়া পড়ে। যে সব পরিমাপের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে সুনির্দিষ্ট করা চলে না (ধরা যাউক, কবিতার রসাস্বাদন ক্ষমতা) সে সব ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ততটা কার্যকরী হয় না। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নে পরিমাপের বিষয়বস্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মত অতটা সুনির্দিষ্ট অথচ রচনামূলক প্রশ্নের মত একেবারে অনির্দিষ্টও থাকে না। ঐ ধরণের প্রশ্ন উত্তর করার সময়ে নিজের মনের ভাব সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইতে হয় (প্রদত্ত উত্তর হইতে একটি বাছিয়া লইলে চলে না)। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইল যে "দশ লাইনের মধ্যে দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা বিষয়ক যুক্তিগুলি লিখ।" পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই প্রশ্নে রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্নের মত অনিশ্চয়তা নাই; প্রশ্ন-রচনাকারী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে **পরীক্ষার্থীর** চিন্তাশক্তির পরীক্ষা করিতে চান; পরীক্ষার্থী সংক্ষেপে শুদ্ধভাষায় তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে কিনা

ইহাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশ্নের উত্তরটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের মত এত যান্ত্রিক নহে; অধিকন্তু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুইটি বিষয়ের পরীক্ষা একই প্রশ্নের সাহায্যে হইতেছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু এক সঙ্গে মাত্র একটি বিষয়ের পরীক্ষা চলিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অপেক্ষা ভালভাবে কাজ করিলেও আমাদের শিক্ষক এবং প্রশ্নপত্র রচনাকারীরা ঐ ধরণের প্রশ্ন করায় এখনও অভ্যস্ত হন নাই। প্রশ্নপত্রে সাধারণতঃ "টিকা লেখার" যে প্রশ্ন থাকে তাহাকে ঠিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর-প্রশ্নের পর্যায়ে ফেলা চলে না। পরীক্ষা বিষয়ে যিনিই কিছুটা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারিবেন যে, ঐ ধরণের টীকা লেখার মাধ্যমে ঠিক কি পরিমাপের চেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধে ধারণা রচনামূলক প্রশ্ন অপেক্ষাও অধিকতর অনিশ্চিত থাকে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন রচনাকালে তিনটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়—(১) প্রশ্নটি একাধিক বস্তু পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিলেও উহা ঠিক কি কি পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া নিতে হইবে। (২) প্রশ্নটি এমন হইবে যে, তাহার উত্তরের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট বস্তুগুলি পরিমাপ করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে। (৩) প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষিপ্ত হইবে এবং উত্তর দান সম্বন্ধে নির্দেশ এত স্পষ্ট হইবে যে কতকটা নৈর্ব্যক্তিতে নম্বর দান সম্ভব হইবে। পূর্বে দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নর দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি-ভাবে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ভূপাল সেমিনারীতে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন অনেক সময় প্রায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধরণেরও হইতে পারে—এই দুই ধরণের প্রশ্নের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করা কঠিন হয়।

দৃষ্টান্ত (১) ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পাঁচটি কর্তব্য কি? নিম্নে শূন্য স্থানে কর্তব্যগুলির নাম লিখ (কোথাও ৪টির বেশী অধিক শব্দ ব্যবহার করিও না)

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(২) আবশ্যক মত সংখ্যা বা সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ বসাইয়া নিম্নের শূন্যস্থান পূর্ণ কর (বাক্যাংশে তিনটির অধিক কথা থাকিবে না।)

"মেগাস্থিনিস বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থা"—

পাটলিপুত্রের পৌরসভা মোট সভ্য......

উপসমিতি ১	উপসমিতি ২	উপসমিতি ৩	উপসমিতি ৪	উপসমিতি ৫	উপসমিতি ৬
সভ্যসংখ্যা... কার্য-বিদেশী আগন্তুকগণের তত্ত্বাবধান	সভ্য সংখ্যা... কার্য...	সভ্য সংখ্যা... কার্য...	সভ্য সংখ্যা... কার্য...	সভ্য সংখ্যা... কার্য...	সভ্য সংখ্যা... কার্য

আমরা আশা করিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরীক্ষাগুলিতে দিন দিনই অধিকতর চালু হইবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন—এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Intelligence, Aptitudes) প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য ঐ ধরণের প্রশ্নই ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা রচিত প্রশ্নপত্রের (পরিমাপ-যন্ত্র) রিলাইয়েবিলিটি (Reliability) এবং ভ্যালিডিটির পরিমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্থির করা যায়। সাধারণতঃ, প্রশ্নগুলি রচনা করার পর যে শ্রেণীর জন্য উহাদিগকে রচনা করা হইয়াছে, ঐ শ্রেণীর ২০০।৩০০ ছাত্রকে নমুনা (sample) হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঐ প্রশ্নগুলি উহাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। তারপর ঐ ছাত্রদের উত্তর বিশ্লেষণ করা হয়। সমগ্র প্রশ্নপত্রে যে সব ছাত্র ভাল নম্বর পাইয়াছে তাহারা যদি বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর না করিতে পারে; আবার সমগ্র প্রশ্ন-পত্রে যাহারা খারাপ নম্বর পাইয়াছে তাহারা যদি ঐ প্রশ্নগুলির

উত্তর করিতে পারে, তবে প্রশ্নগুলিরই ত্রুটি আছে মনে করিয়া প্রশ্নপত্র হইতে উহাদের বাদ দেওয়া হয়। আবার কোন প্রশ্ন শতকরা কয়টি ছাত্র উত্তর করিতে পারিয়াছে তাহার ভিত্তিতে প্রশ্নের 'কাঠিন্যিক-মূল্য' (Difficulty value) স্থির করা হয়। ধরা যাউক, কোন প্রশ্ন যদি শতকরা ৮০টি পরীক্ষার্থীই উত্তর করিয়া থাকে তবে উহার 'কাঠিন্যিক মূল্য' হইবে ২০। তারপর, প্রশ্নগুলির কাঠিন্যিক মূল্য হিসাবে প্রশ্নপত্রকে পুনর্বার সাজাইতে হয়। প্রশ্ন পত্রটিতে যাহাতে সব রকম কাঠিন্যিক-মূল্যের প্রশ্নই থাকে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে সোজা হইতে ক্রমান্বয়ে কঠিনের দিকে সাজান হয়। খুব সহজ ও খুব কঠিন প্রশ্নের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়—মাঝামাঝি কাঠিন্যিক-মূল্যের প্রশ্নের সংখ্যাই প্রশ্ন পত্রে বেশী থাকে। এইভাবে প্রশ্নপত্রটি পুনর্বার রচনা করিয়া যে শ্রেণীর জন্য উহা রচিত হইয়াছে তাহার হাজার দুই ছাত্রের উপর পুনরায় উহাকে প্রয়োগ করা হয়। তারপর ঐ প্রয়োগের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া আরও একটু জটিলতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রটি নির্ভরযোগ্য (Reliable) কিনা এবং উহা যাহা পরিমাপ করিতে চাহিতেছে তাহা পরিমাপ করিতে পারিতেছে কিনা (valid) তাহা স্থির করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নপত্রে কত নম্বর পাইলে ছাত্রকে "মাঝারি" (average), কত নম্বর পাইলে "ভাল" (Above average), কত নম্বর পাইলে "খারাপ" (Below average), কত নম্বর পাইলে "খুব ভাল" (Very much above average), কত নম্বর পাইলে "খুব খারাপ" (Very much below average) ইত্যাদি স্থির করা হয়। উপরোক্ত সবগুলি কাজই বৈজ্ঞানিকভাবে করিবার জন্য নানা ধরণের গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইভাবে যেসব নৈর্বক্তিক প্রশ্ন-পত্র রচিত হয় তাহাদিগকে "প্রয়োগ সিদ্ধ" (Standardised) প্রশ্নপত্র বলা হয়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হইলেই যে তাহা "প্রয়োগসিদ্ধ" হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন প্রশ্নপত্রকে "প্রয়োগসিদ্ধ" করিতে হইলে প্রচুর সময় এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাই আশু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রয়োগসিদ্ধকরণ পদ্ধতির ভিতর দিয়া না গিয়াও আমরা এডহক্ (Adhoc) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করিতে পারি। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার মূলনীতি এই যে, উহা পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়েরই ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ হইবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দানকালে পরীক্ষক-এ

পরীক্ষক-এ পার্থক্য হইবে না। তাই সাধারণতঃ কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাত্র একটি শুদ্ধ উত্তর থাকে; শুধু ঐ উত্তরটি লিখিলেই পরীক্ষার্থী পূর্ণ নম্বর পাইবে, অপর কোন উত্তর দিলে শূন্য পাইবে। স্বভাবতই প্রশ্নের ভাষা অর্থবোধহীন (unambiguous) না হইলে চলে না। ফলে, প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্নরচনাকারীর মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নদ্বারা একাধিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। একটি প্রশ্নের দ্বারা একটি মাত্র নির্দিষ্ট বস্তুই পরিমাপের চেষ্টা করা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থীরা যাহাতে প্রশ্নের অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল ধারণা করিতে না পারে এবং যাহাতে তাহাদের উত্তরদানের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য না থাকে (তাহা হইলে নম্বর দান কালে পরীক্ষকের নৈর্ব্যক্তিকতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে) তাহার জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঙ্গে সাধারণতঃ কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া হয়; পরীক্ষার্থীদিগের তাহাদের মধ্য হইতে শুদ্ধ উত্তরটি বাছিয়া লইতে বলা হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রকে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ করার জন্যও বিধিমত চেষ্টা করা হয়। অঙ্ক ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে ভাষাই পরীক্ষার্থীদের উত্তরদানের মাধ্যম। ফলে সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়েও ভাষা-জ্ঞানের তারতম্যের জন্য প্রশ্নের উত্তরদান ক্ষমতার তারতম্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দূর করিবার নিমিত্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরদানকালে সাধারণতঃ প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্য হইতে একটির নীচে দাগ দিয়া নিজের উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে হয়; তাহা হইলে ভাষা-জ্ঞানের তারতম্যের জন্য প্রশ্নের উত্তরের মানের তারতম্য হইতে পারে না। তারপর, শুদ্ধ উত্তরটি "সম্ভাব্য উত্তরগুলির" মধ্যে দিয়া দেওয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিভিন্নতার জন্য কাহারও মনে যদি পরীক্ষাদানকালে উৎকণ্ঠা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতির সৃষ্টি হয় তবুও উত্তরদানে কোন তারতম্য হয় না। সর্বশেষে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভাষা এমন থাকে যে ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে সে সম্বন্ধে পরীক্ষার্থী মনে কোন দ্বিধা থাকে না। অভিজ্ঞতার ফলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরণের রীতি প্রচলিত হইয়াছে—সত্য-মিথ্যা ঠিক করা (True-false), শুদ্ধ উত্তর বাছাই করা (Multiple choice), শূন্যস্থান পূর্ণ করা (Fill in the blanks), জোড় মিলাইয়া দেওয়া (Matching) প্রভৃতি ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, উপরোক্ত কোন একটি ধরণের সাহায্য প্রশ্ন-রচনা না করিলে তাহা নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে না। উপরে উল্লিখিত নীতির

ভিত্তিতে রচিত হইলেও অনেক প্রশ্ন আছে যাহাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলা যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রশ্ন করা হইল "চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত মৌর্য সাম্রাজ্যের যে সম্বন্ধ মোগল সাম্রাজ্যের সহিত কাহার সেইরূপ সম্বন্ধ ?" এই প্রশ্নটি উপরোক্ত কোন ধরণের মধ্যেই পড়ে না। তথাপি পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ হওয়ার দরুণ উহা নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা পাইতে পারে। আশা করা যাইতেছে যে, শিক্ষকগণ তাঁহাদের সৃজনীশক্তির সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার নূতন নূতন পদ্ধতি বাহির করিবেন; ইতিমধ্যেই অনেক নূতন পদ্ধতি বাহির হইয়াছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করার বিভিন্ন ধাপ—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করিতে গেলে নিম্নলিখিতরূপে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হয়।

১। যে বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে সে বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার তথা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সর্বপ্রথমেই সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। ধরা যাউক, বাংলা সাহিত্যে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে। প্রথমেই নিম্নলিখিতরূপে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া হইবে—(ক) শব্দসম্ভারের জ্ঞান, (খ) ভাষা পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা, (গ) নিজের চিন্তাধারা, কল্পনা ও উপলব্ধি লিখিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা, (ঘ) পঠিত বিষয়ের চিন্তাধারা, ভাব প্রভৃতি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Capacity to appreciate materials read).

২। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রশ্নরচনা কালে কোন্‌টির উপর কতখানি গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া লইতে হয়। ধরা যাউক, আপনি ১০০ নম্বরের উপর প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন। প্রশ্নপত্র রচনা আরম্ভ করিবার পূর্বেই আপনি হয়ত স্থির করিয়া লইলেন যে, উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথমটি সার্থক করিবার জন্য ২০ নম্বর, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির প্রত্যেকের জন্য ২৫ নম্বর এবং চতুর্থটির জন্য ২০ নম্বরের উপর প্রশ্ন রচনা করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীভেদে ঐ ধরণের গুরুত্ব আরোপ করায় তারতম্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় মানে (Class II) শব্দসম্ভারের জ্ঞান পরীক্ষা করার গুরুত্ব যতখানি হইবে পড়িয়া-বোঝার (Reading-Comprehension) পরীক্ষা করার গুরুত্ব তাহার চাইতে অনেক কম হইবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করণে এবং তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়নে ৪।৫ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বাধীন মতামত গ্রহণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

৩। তারপর পরীক্ষার ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে পাঠ্যসূচীই পরীক্ষার ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পঠন-পাঠনের পদ্ধতির সহিত পাঠ্যসূচীকে সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে ছাত্রদের (কোন বিষয়ে) শিক্ষার পরিধি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মাইতে পারে না। ধরা যাউক, সমাজবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল যে, ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশসাধন করা অথবা বাংলা সাহিত্য পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, ছাত্রদের মধ্যে ঐ ভাষায় সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি করা; কিন্তু বর্তমানে ঐ দুই বিষয়ের পঠন-পাঠন যেভাবে হইতেছে তাহাতে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সার্থক হইতেছে কি না তাহা পরিমাপ করার জন্য প্রশ্ন করিলে কোন লাভ হইবে না। তাই পাঠ্যসূচীর সহিত পঠন-পাঠন পদ্ধতির কথা চিন্তা করিয়া প্রশ্নপত্রের রচনার পরিধি স্থির করিতে হয়।

৪। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার সবকিছুর উপর প্রশ্ন করা যে সম্ভব নয় তাহা বলাই বাহুল্য। তাই চতুর্থ ধাপে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্র হইতে নমুনাস্বরূপ কিছু কিছু করিয়া প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তু বাছিয়া লইতে হয়। এই বাছাইকার্যে নিম্নলিখিত নীতিগুলি মনে রাখা ভাল।

(ক) সমগ্র ক্ষেত্রটি পরিমাপ করার জন্য কতখানি সময় পাওয়া যাইতেছে তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পত্রে পরীক্ষার্থীকে একঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের জন্য উত্তর করিতে বলা হইলে মানসিক ক্লান্তির জন্য পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল হয়ত নির্ভরযোগ্য নাও হইতে পারে।

(খ) পরিমাপের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের (পাঠ্যসূচীর) যথাসম্ভব সকল বিভাগ হইতেই বিষয়বস্তু বাছাই করিতে হইবে। অবশ্য পরিমাপের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বের তারতম্যের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সংখ্যার কম-বেশী হইবে।

(গ) সামগ্রিক-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আকবরের আহ্‌মদনগর অভিযান একটা সমগ্র বিষয়বস্তু নহে; দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারকেই শুধু একটা সমগ্র বিষয়বস্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সংক্ষেপে, রচনামূলক প্রশ্নের বিষয়বস্তু যে ধরণের হয়, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বিষয়বস্তু তাহার চাইতে পৃথক হওয়ার কোন কারণ নাই।

প্রশ্নপত্রের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

দৃষ্টান্ত ঃ ইতিহাস পরীক্ষা; অষ্টম শ্রেণী; পরীক্ষার ক্ষেত্র—মোগল সাম্রাজ্য।

আমাদিগকে পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য "রাজনৈতিক ঘটনার জ্ঞান" পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে। সমগ্র পরীক্ষাটির জন্য ৪৫ মিঃ সময় আছে; কাজেই উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্য আমরা মাত্র ১২ মিনিট সময়ের মধ্যে উত্তর করা যায় এরূপ প্রশ্ন করিতে পারিব। প্রশ্নপত্রের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন করা যাইতে পারে—

১। পানিপথের তিনটি যুদ্ধ, ২। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য শের শাহের চেষ্টা, ৩। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার, ৪। মারাঠা সাম্রাজা প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। ৫। এতখানি প্রস্তুতির পর প্রশ্ন-পত্র রচনার কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক হউক, রচনামূলক হউক বা সংক্ষিপ্ত-উত্তর হউক সব ধরণের প্রশ্নপত্র রচনায়ই উপরোক্ত চারিটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঠিক কিভাবে রচনা করিতে হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য রচনার যে সমস্ত রীতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়, দৃষ্টান্তসহ তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে। কোন প্রশ্নপত্রে যে সব রীতির প্রশ্ন থাকিবে এমন কথা নহে। প্রশ্ন রচনার 'রীতি' অনেকটা নির্ভর করে প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উপর।

'সত্য-মিথ্যা' রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে কতকগুলি সত্য এবং মিথ্যা বিবৃতি একত্র করিয়া দিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত—নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কয়েকটি সত্য এবং কয়েকটি মিথ্যা। যেগুলি সত্য তাহাদের প্রত্যেকটির ডান পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'টিক' চিহ্ন (✓) দাও; আর যেগুলি মিথ্যা তাহাদের প্রত্যেকটির ডান পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'ক্রশ' চিহ্ন (×) দাও।

১। সিন্ধুনদ রাজস্থানের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ( )

২। ইরাবতী ব্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা বড় নদী ( )

৩। ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতীয় অংশের নাম "সানপে" ( )

৪। গৌহাটি আসামের রাজধানী ( )

এই রীতির প্রশ্ন রচনা করা সহজ বটে, কিন্তু এই রীতিতে প্রশ্ন রচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। এই রীতিতে প্রশ্ন-রচনা করিলে সময় এবং কাগজ উভয়েরই অপব্যয় হয়। একটি বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুইটি (একটি সত্য এবং একটি মিথ্যা) সম্পূর্ণ বাক্য লিখিতে হইবে এবং পরীক্ষার্থীকে বাক্য দুইটি পড়িয়া উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে উহার অর্থ এই যে, এক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্ন করিয়া এবং পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১৫ মিনিট ব্যয় করিয়া গোটাদশেক সামান্য সামান্য পঠিত বিষয় পরীক্ষার্থীর মনে আছে কিনা তাহা জানা যাইতে পারে। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দানকালে ফাঁকি দেওয়ারও সুযোগ থাকে। কোন পরীক্ষার্থী যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কোনটিতেই জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সবগুলি বিবৃতির ডান পাশেই টিক্ চিহ্ন দিয়া চলে তবে কিছু না জানা সত্ত্বেও প্রশ্নটির জন্য নিদিষ্ট নম্বরের হয়ত অর্দ্ধেক পাইয়া যাইবে। তাই ঐ রীতির প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দানকালে যতগুলি বিবৃতির পাশে ঠিক দাগ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যা হইতে যতগুলি বিবৃতির পাশে ভুল দাগ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যাকে বিয়োগ করিতে হয়। এই রীতিতে করা প্রশ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সহজ হয় এবং মুখস্থ বিদ্যার পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়। তাই এই রীতিতে প্রশ্ন রচনা না করাই বাঞ্ছনীয়।

"শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে প্রদত্ত কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর হইতে পরীক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর বাছিয়া লইতে হয়।

দৃষ্টান্ত—বন্ধনীর ভিতর হইতে যথাযথ উত্তরটি রেখাঙ্কিত করিয়া পাশের উক্তিটি সম্পূর্ণ কর।

(ক) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগকে বলা হয় ইউরোপের ইতিহাসের "অন্ধকার যুগ" কারণ তখন (বৈদ্যুতিক আলো ছিল না; রাজায় রাজায় সব সময় যুদ্ধ চলিত; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা লোপ পাইয়াছিল; ঐ যুগ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।)

"শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির প্রশ্ন অনেকটা সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্নের অনুরূপ। কিন্তু উহাতে সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্নের যে সব দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ততটা নাই। একটা সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে "সত্য-মিথ্যা" রীতিতে প্রশ্ন করিলে তাহা "শুদ্ধ উত্তর বাছাই" রীতির অনুরূপ হইয়া পড়ে। সত্য-মিথ্যা রীতির প্রশ্ন করিতে হইলে ঐ ধরণে করাই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্ত—

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলির মধ্যে যে কয়টি রেনেসাঁস যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য উহাদের পূর্বে বন্ধনীর ভিতর √ চিহ্ন দাও, যেগুলি প্রয়োজ্য নহে, তাহাদের পূর্বে বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

(১) গথিক শিক্ষা-রীতির অনুকরণ
(২) গ্রীক-রোমান শিক্ষা-রীতির অনুকরণ
(৩) ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন
(৪) ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাহুল্যের নিদর্শন
(৫) প্রকৃতির সৌন্দর্যের রূপায়ণ
(৬) ভাবের গভীরতা সম্পাদন
(৭) মানবের দৈহিক সৌন্দর্যের সম্যক প্রকাশ
(৮) রঙ-এর যথেচ্ছ ব্যবহার
(৯) রঙ-এর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার

শূন্যস্থান পূর্ণকরণ রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়া পরীক্ষার্থীকে তাহা পূর্ণ করিতে বলা হয়। প্রয়োজনমত বাক্যের একাধিক স্থান অসম্পূর্ণ রাখা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত—শূন্যস্থান পূর্ণ কর : বাবর মোগল সাম্রাজ্যের—করিয়াছিলেন, আকবর উহা—করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজীব উহার—পথ প্রশস্ত করেন।

যাহাতে ভাষাজ্ঞানের উপর অতিরিক্ত জোর না পড়ে এবং যাহাতে একটি শূন্যস্থান ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা "শুদ্ধ" ভাবে পূর্ণ করা না যায় তাহার জন্য এই রীতির প্রশ্নে সাধারণতঃ শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য সম্ভাব্য শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়া দেওয়া হয়। ফলে ঐ রীতির প্রশ্ন অনেকটা শুদ্ধ উত্তর বাছাই করা রীতির অনুরূপ হইয়া পড়ে।

দৃষ্টান্ত—নিম্নে বামপার্শ্বে কয়েকটি অসম্পূর্ণ উক্তি ও ডানপার্শ্বে প্রতিটি বন্ধনীর মধ্যে চারিটি করিয়া সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। ঠিক যে উত্তরটি বামপার্শ্বের উক্তিটিকে সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারে, মাত্র সেইটির নীচে দাগ দাও।

(ক) রেনেসাঁস আন্দোলনে ভাব-গঙ্গার ভগীরথ ছিলেন—(পেট্রার্ক, বোকাচিও, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি)

(খ) ফ্লোরেন্সের চাণক্য হইলেন—(গ্যালিলিও, নেপোলিয়ন, মেকিয়াভেলি, বোকাচিও)

(গ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিল্পী ছিলেন—(র‍্যাফায়েল, বেকন, সেক্সপীয়র, নিউটন)

বাক্য ব্যতীত নক্সার (diagram) মাধ্যমেও শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার রীতির প্রশ্ন করা যায়।

দৃষ্টান্ত—মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের একটি ধারাবাহিক নক্সা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ স্তরগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া উহাদের মধ্যস্থিত 'নাম' এবং 'কর্তব্য ও দায়িত্ব' অথবা 'কর্তব্য ও অধিকার' ঐ দুইটি অসম্পূর্ণ স্থান অতি সংক্ষিপ্ত অথচ উপযুক্ত বাক্যাংশ দ্বারা পূর্ণ কর। কোথাও ৪টির বেশী শব্দ ব্যবহার করিও না। উদাহরণস্বরূপ ১নং নক্সার অসম্পূর্ণ স্থানগুলি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

জোড় মিলাইয়া দেওয়া রীতির প্রশ্ন—এই রীতির প্রশ্নে সাধারণতঃ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুইটি শব্দ বা বাক্যাংশের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এক তালিকার শব্দ বা বাক্যাংশের সহিত অপর তালিকার শব্দ বা বাক্যাংশকে জোড় মিলাইয়া দিতে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত—নীচে বামপার্শ্বে মুঘল শাসনবিভাগের কতিপয় কর্মচারীর নাম লিখিত আছে; ডানপার্শ্বে লিখিত আছে তাহাদের কর্তব্য; কাহার কর্তব্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য বামপার্শ্বের নামের নম্বরটি ডানপার্শ্বের সঠিক 'কর্তব্যের' পূর্বে বন্ধনীর ভিতর বসাও। যে কর্তব্যের সহিত কোন নামেরই সম্বন্ধ নাই তাহার বামপার্শ্বের বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

কর্মচারীর নাম		**কর্তব্য**
১। শিপাহসালার	( )	বড় বড় সহরের বিচারকার্য সম্পাদন
২। ফৌজদার	( )	দুর্নীতি নিবারণ
৩। বকিয়ানবিস্	( )	সৈন্যদের বেতন দেওয়া ও হিসাব রাখা
৪। কোতোয়াল	( )	সরকারী কারখানার তত্ত্বাবধান
৫। কাজী	( )	রাজস্ব আদায় ও তৎসংক্রান্ত বিচারকার্য সম্পাদন
৬। মীরবক্সী	( )	দাতব্যবিভাগ পরিচালন
৭। দেওয়ান	( )	সহরের শান্তিরক্ষা
৮। কারকুন	( )	সংবাদ সংগ্রহ
	( )	রাজস্ব সংগ্রহ
	( )	শান্তিশৃঙ্খলা বিধান ও বিদ্রোহ দমন

দুইটি পৃথক তালিকা না করিয়াও উপরোক্ত রীতিতে প্রশ্ন করা চলে।

নাম—রাজা

প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব—ভূমিবণ্টন ও রাজ্যশাসন।

|

নাম..............................

প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..................

....

|

নাম..............................

প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..................

....

|

নাম..............................

প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..................

....

|

নাম..............................

প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব..................

....

দৃষ্টান্ত—নীচের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিগুলির মধ্যে যে কয়টি বিশেষভাবে জাতিসংঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদিগের বামদিকের বন্ধনীতে (১), যে কয়টি রাষ্ট্রসংঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের বামদিকে (২) এবং যেগুলি দুই সংঘের কোনটির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে তাহাদের বামদিকের বন্ধনীতে × চিহ্ন দাও।

( ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় উৎপত্তি
( ) সংঘগঠনে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের অবদান
( ) সংঘের সাফল্যে জওহরলাল নেহরুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান
( ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় উৎপত্তি
( ) ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের উদ্ভব
( ) ভাসাই সন্ধি
( ) সংঘের উৎপত্তির মূলে রুজভেণ্ট ও চার্চিলের চেষ্টা
( ) ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণরোধে অক্ষমতা
( ) কোরিয়া বিভাগ
( ) ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা
( ) টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা লাভ

উপরোক্ত রীতিগুলি ছাড়া আরও নানাভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রচনা করা চলে। প্রশ্নপত্র রচনাকারীর সৃজনীশক্তি অনুসারে নানাধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতেছে।

নিম্নে প্রত্যেক পংক্তিতে কতকগুলি নাম লেখা আছে, উহাদের মধ্যে এমন একটি নাম আছে যেটি অপরাপর নামগুলির সহিত এক জাতীয় নহে। উহাকে বাছিয়া লইয়া তাহার নীচে দাগ দাও।

(ক) বুদ্ধ, মহাবীর, খ্রীষ্ট, ভবভূতি
(খ) বাণভট্ট, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, জয়পাল
(গ) চেঙ্গিস্ খাঁ, হাফেজ, এ্যাটিলা, তাইমুর লঙ্গ

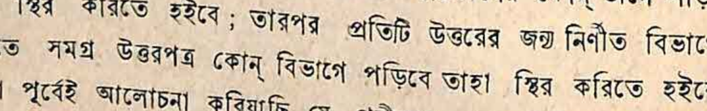
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের গুণাগুণ—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন যে শুধু পরিমাপের মাধ্যম এমন নহে, ইহা শিক্ষাদানেরও একটি বিশিষ্ট কৌশল। ছাত্রেরা শিক্ষকের বক্তৃতা অপেক্ষা নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিলে তাহার মূল্য অধিক একথা সকল আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন। পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের

উত্তর বাহির করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ছাত্রেরা নিজ চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে পারে। পরিমাপ-যন্ত্রহিসাবে উহা অন্য যে কোন ধরণের প্রশ্ন অপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের 'রিলায়েবিলিটি' এবং 'ভ্যালিডিটি' পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। আদর্শ প্রশ্নপত্র রচনায় যে সব নীতি অনুসরণ করার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা কালেই তাহা হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব। আধুনিক কালে, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য সে সব প্রশ্নপত্র রচনা করা হইতেছে তাহাতে নৈর্ব্যক্তিক ধরণের প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয়। আমাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রচলন হইলে ঐ পরীক্ষা যে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দোষ-ত্রুটি : নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন একেবারে দোষ-ত্রুটি শূন্য নহে। পরীক্ষণীয় সকল বিষয় সমান দক্ষতার সহিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় না। রচনা-ক্ষমতা, মানসিক-উপলব্ধি প্রভৃতি বিষয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা উপযুক্তভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাই, রচনামূলকএবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার না করিলে "আদর্শ প্রশ্নপত্র" (পরিমাপ-যন্ত্র) রচনা করা সম্ভব হয় না। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রচনাক্ষমতা এবং মানসিক উপলব্ধি প্রভৃতি বস্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা একেবারে পরিমাপ করা যায় না, ইহা সত্য নহে। আমরা নৈর্বাক্তিক প্রশ্নের রচনায় যতই অভ্যস্ত হইব ততই যে কোন বিষয়বস্তু উহার সাহায্যে অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিমাপ করিতে পারিব। আমাদের দেশের অনেকের অভিজ্ঞতা এই যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু রচনার ত্রুটির জন্যই এইরূপ হয়। প্রয়োজন মত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে সহজ বা কঠিন করা চলে। আবার, অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন একটু যান্ত্রিক ধরণের হইয়া পড়ে ; ইহাতে শুধু মুখস্থ বিদ্যারই পরিচয় দেওয়া চলে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের এই ত্রুটিও প্রশ্নরচনাকারীর অনভিজ্ঞতার ফলেই হইয়া থাকে।

প্রশ্নপত্রে নম্বরদান পদ্ধতি—পরীক্ষাকে উন্নততর করিতে হইলে, একদিকে যেমন প্রশ্নপত্র রচনা পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি নম্বরদান পদ্ধতিকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এযাবৎ

শুধু প্রশ্নপত্র সংস্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। রচনামূলক প্রশ্নপত্রে যে আমাদের ১০০ পর্যন্ত নম্বর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে তাহা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। রচনামূলক প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর নাই। তাই পরীক্ষক উত্তর সম্বন্ধে নিজ ধারণা অনুসারে উত্তরপত্রে নম্বর দিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত-ধারণার ভিত্তিতে যেখানে পরিমাপ করিতে হইতেছে সেখানে দুই উত্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরিতে চেষ্টা করিলে আমাদের ভুল করিবার সম্ভাবনাই যে বেশী এ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ধরা যাউক, ইতিহাসের পরীক্ষায় একটি পরীক্ষার্থী ৪৫ নম্বর পাইয়াছে এবং অপর একটি পরীক্ষার্থী ৪৭ নম্বর পাইয়াছে; দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী অপেক্ষা প্রথম পরীক্ষার্থীর ইতিহাসে জ্ঞান কম, একথা কোন পরীক্ষকই স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারিবেন না। তাই রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদিগকে ১০১ ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা না করিয়া ৫ বা ৭ ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা করিলে উহা অধিকতর বৈজ্ঞানিক হইবে। রচনামূলক প্রশ্নরূপ পরিমাপ-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য আমাদের সর্বাগ্রে কমাইতে হইবে। সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন উত্তরপত্রগুলিতে নির্দিষ্ট নম্বর না দিয়া উহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।



আমরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

প্রথমতঃ, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত পাঁচভাগের কোন্ ভাগে পড়িবে তাহা স্থির করিতে হইবে; তারপর প্রতিটি উত্তরের জন্য নির্ণীত বিভাগের ভিত্তিতে সমগ্র উত্তরপত্র কোন্ বিভাগে পড়িবে তাহা স্থির করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীকে কোন নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া নহে, তাহার "সমশ্রেণীর" ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয়ের শিক্ষায় তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করাই বাহ্যিক-পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে কোন উত্তরপত্রের স্থান ঠিক্ কোথায় ইহা নির্দেশ করিতে পারিলে পরীক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। নম্বর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলে প্রতিটি বিভাগের জন্য নম্বর নির্দিষ্ট করিয়া দিতেও কোন ক্ষতি নাই। উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে পরিমাপ-যন্ত্রের (প্রশ্নপত্রের) পাঁচটি কি সাতটি বিভাগ থাকিলে, ঠিক কি

ধরণের উত্তর করিলে, উত্তরপত্রকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে তাহাও অনেকখানি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় বর্তমানেও ঐ ধরণের চেষ্টা কিছুটা করা হয়। পরীক্ষার শেষে প্রধান পরীক্ষকগণ (Head Examiners) একত্র হইয়া প্রতিটি প্রশ্নের 'আদর্শ উত্তর' ঠিক করিয়া দেন এবং পরীক্ষকদিগকে ঐ উত্তরের ভিত্তিতে নম্বর দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রধান পরীক্ষকগণ প্রশ্নপত্র রচনা এবং তাহাতে নম্বর দান কার্যে বিশেষজ্ঞ না হওয়ার দরুণ, ঐ কাজটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা হয় না। 'আদর্শ' উত্তরগুলি কয়েকটি পয়েণ্টের (points) তালিকা মাত্র। ঐ পয়েন্টগুলির অধিকাংশ উল্লেখ করিলে পরীক্ষার্থীকে 'পূর্ণ-নম্বর' দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই পূর্ণ নম্বরটি যে কত তাহা নির্দিষ্টভাবে বলিয়া না দেওয়ার জন্য একই ধরণের উত্তরে কেহ দেন ৬০, কেহ ৭০, কেহ বা ৮০ ইত্যাদি। তারপর, প্রধান-পরীক্ষকদের নির্দেশে এক দিকে যেমন পয়েণ্টের তালিকা করিয়া প্রশ্নের উত্তরকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করা হয়, অপর দিকে আবার প্রকাশভঙ্গী, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে বলিয়া নম্বরদানকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কার্যতঃ প্রধান-পরীক্ষকদের নির্দেশ নম্বর-দান কার্য উন্নততর করিতে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। ইহার পরিবর্তে যদি নির্দেশ দেওয়া হইত যে, প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরকে মাত্র পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইবে (পাঁচ ধরণের নম্বর দেওয়া যাইবে) এবং ঐ পাঁচ ধরণের উত্তরের নমুনা যদি পরীক্ষকদের দেওয়া যাইত, তাহা হইলে নম্বরদানের অনিশ্চয়তা অনেকখানি দূর হইতে পারিত। নীচে নম্বরের ভিত্তিতে বিভাগগুলি কিরূপ হইতে পারে দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝান হইতেছে—

প্রতিটি প্রশ্ন বা পরিমাপ-যন্ত্র (Scale for Measurement)

অনেক নীচে	নীচে	মাঝারি	উপরে	অনেক উপরে
নম্বর ; ২৯ বা তাহার চাইতে কম	**নম্বর** ৩০ হইতে ৪৫	**নম্বর** ৪৬ হইতে ৫৯	**নম্বর** ৬০ হইতে ৭৯	**নম্বর** ৮০ হইতে ১০০

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রশ্ন রচনার সঙ্গে সঙ্গে উহার উত্তর কিভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে (নম্বর দিতে হইবে) তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নেও একই নীতি অনুসরণ করিয়া নম্বর দেওয়া উচিত। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তরে নম্বরদানের জন্য উপরোক্ত পাঁচ ধরণের উত্তরের নমুনা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নে নম্বর দান (মান নির্ণয়ন) অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক করা সম্ভব।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একটি মাত্র শুদ্ধ উত্তর থাকে বলিয়া উহার উত্তরে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নম্বর দেওয়া চলে; উত্তর শুদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়া হইবে, না হইলে কোন নম্বরই দেওয়া হইবে না; শুদ্ধ উত্তরটি কি তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের "সমশ্রেণীর" ছাত্রদের মধ্যে স্থান নির্ণয়ন কালে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের নম্বরও উপরোক্ত পাঁচভাগে ভাগ করিয়া প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কার

এই অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া নীচে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হইল। প্রথমেই ব্যবস্থাপনার দিক হইতে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার কিছুটা সংস্কারের প্রয়োজন। ১। পরীক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার হাতে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হইবে। ২। দুই ধরণের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা প্রবর্তন করিলে (ক) (যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না এবং (খ) যাহারা প্রবেশ করিবে) পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টতর হওয়ার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। ৩। পরীক্ষাগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহিত পরীক্ষা-সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্য পরিচালনা করার নিমিত্ত একটি গবেষণা বিভাগ সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরীক্ষাকে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া পরের পরীক্ষা উন্নততর করিবার জন্য পরামর্শ দিবেন। ৪। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কাহারও উপর প্রশ্নপত্র রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত নহে। ৫। উত্তরপত্র পরীক্ষকগণেরও ঐ কার্যে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষণশিক্ষা বিদ্যালয়-গুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা করা এবং তাহাতে নম্বর দান, হাতে কলমে শিখাইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ৬। সমগ্র স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা যে একই সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ হইয়া গেলে তাহার পরীক্ষাকার্য (তাহা নবম, দশম, বা একাদশ শ্রেণীর মধ্যে

যে কোন শ্রেণীতেই হউক না কেন) শেষ করিয়া ফেলিতে কোন আপত্তি নাই ; বরং তাহাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি বিষয়ে সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রথম পরিমাপের সময় কোন বিষয়ে ছাত্রের শিক্ষা আশানুরূপ না হইলে পুনরায় চেষ্টা দ্বারা তাহাকে ঐ বিষয়ে তাহার শিক্ষার মান উন্নততর করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং আবার পরিমাপ করিয়া তাহা আশানুরূপ স্তরে পৌছিয়াছে কিনা স্থির করা হইবে ইহাই বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের প্রণালী। সবগুলি বিষয়ের পরীক্ষা এক সঙ্গে গ্রহণ না করিলে চলে না—এই ধারণা যে আমাদের কোথা হইতে আসিল তাহা চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না। ৭। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় করার কালে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলকে যথাযথ স্থান দিতে হইবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন ছাত্রের কোন বিষয়ে শিক্ষার পরিমাপ উপযুক্তভাবে করা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রশ্নপত্র রচনাপদ্ধতিরও সংস্কার করিতে হইবে। ১। প্রথমেই পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া উহার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে। ২। প্রশ্নপত্রের ভাষা এমন হওয়া প্রয়োজন যে, ঠিক কি উত্তর চাওয়া হইতেছে সে সম্বন্ধে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মনে যেন কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ৩। প্রশ্নপত্রে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত-উত্তর, নৈর্ব্যক্তিক এই তিন ধরণের প্রশ্নই থাকিবে (উত্তর করার জন্য পরীক্ষার্থীকে তিন ধরণের প্রশ্ন তিন বিভিন্ন সময়ে আলাদাভাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়)। ৪। যে ধরণের প্রশ্নপত্রই হউক না কেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র-রচনা করার যে ধারাবাহিকতা আছে (পূর্বে আলোচিত) তাহা অনুসরণ করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইবে ; অর্থাৎ প্রথমে উদ্দেশ্য নিরূপণ, তারপর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপ, তারপর উত্তরদানের জন্য প্রদত্ত সময়ের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নমুনাস্বরূপ বিষয়বস্তু বাছাই এবং সর্বশেষে কোন বিষয়বস্তুর শিক্ষা পরিমাপের জন্য কোন্ ধরণের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা স্থির করণ। ৫। কিছু কিছু আদর্শীকৃত এবং প্রয়োগসিদ্ধ প্রশ্নপত্রের ব্যবহারে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করিবে।

নম্বরদান পদ্ধতির সংস্কার না করিলেও স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ১। প্রতি উত্তরপত্রে একশত একটি নম্বরের মধ্যে

যে কোন নম্বর দানের সুযোগ পরীক্ষককে না দিয়া তাঁহাকে নির্দিষ্ট পাঁচটি বিভাগের যে কোন একটিতে উত্তরপত্রটির স্থান নির্দেশ করিতে বলিলে উহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হইবে সন্দেহ নাই। ২। কোন প্রশ্নের কি ধরণের উত্তর লিখিলে পরিমাপ-যন্ত্রের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে কোন বিভাগে তাহার স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা প্রশ্ন-রচনার কালেই যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিলে ভাল—যত নৈর্ব্যক্তিকভাবে ঐ কাজ করা যাইবে পরিমাপও তত নির্ভরযোগ্য হইবে। রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মান নির্দেশ নৈর্ব্যক্তিকভাবে হয় বলিয়া ঐ ধরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে এই নীতির কথা উঠে না)।

অনুশীলনী

Q. 1. What are the defects of the existing system of examinations? How would you bring about reforms in the System? (B.A. 1959.)

Ans. (পৃঃ ২৩৭-২৫০)

Q. 2. Discuss the merits and demerits of public examination. Can examination be improved? (B.A. 1957 & 1953)

Ans. (পৃঃ ২৩১-২৩৫ ; ২৩৯-২৪১)

Q. 3. Why are examinations called necessary evils? What are your suggestions for the improvement of the present system of examination? (B.T. 1956).

Ans. (পৃঃ ২২৭-২৩১ ; ২৩৯-২৫৬)

Q. 4. What do you understand by objective type of questions? Discuss how would you set about constructing an objective type question paper for any class in any subject. Illustrate your answer.

Ans. (পৃঃ ২৫৮-২৬৯)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড

আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংস্কার—পূর্ব পরিচ্ছেদে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার (বাহ্যিক-পরীক্ষা) সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক-পরীক্ষা-গ্রহণের যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে সেগুলি হইতেছে (ক) ছাত্রেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে তাহার পরিমাপ (Evaluation) করা, (খ) কোন ছাত্র আশানুরূপভাবে শিক্ষাগ্রহণ না করিয়া থাকিলে তাহার কারণ নির্ণয় (Diagnosis) করা, (গ) শিক্ষাদান পদ্ধতির ভাল-মন্দের পরিমাপ (Evaluation of the Methods of Teaching) করা। বর্তমানে আমরা শুধু প্রথম উদ্দেশ্য-সাধনের কথাই আলোচনা করিব। বাহ্যিক-পরীক্ষায় প্রশ্নরচনা ও নম্বরদান পদ্ধতি-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, আভ্যন্তরিক-পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাহা সমানভাবে প্রযোজ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ছাত্রদের শিক্ষার আভ্যন্তরিক পরিমাপের জন্য শিক্ষক রচনামূলক প্রশ্ন যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করিবেন; সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উপরই তাঁহার বিশেষ-ভাবে নির্ভর করা উচিত। নম্বরদানের ক্ষেত্রেও তাঁহাকে ছাত্রদের উত্তরপত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে মোটামুটি পাঁচভাগে (পূর্বে আলোচিত) বিভক্ত করার চেষ্টা করা সঙ্গত। আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মূল্য বাহ্যিক পরীক্ষা অপেক্ষা বেশী কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন শুধু পরিমাপেরই মাধ্যম নহে, উহা শিক্ষার একটি পদ্ধতিও বটে—পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা শিক্ষা লাভে সাহায্য করিবে।

কিন্তু আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় পরিমাপযন্ত্রের নির্ভরযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেমন প্রয়োজন পরিমাপগুলিকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজনও তাহার চাইতে কম নহে। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আভ্যন্তরিক পরিমাপগুলিকে সাধারণতঃ প্রগতিপত্রে

(Progress Report) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বিভিন্ন ধরণের প্রগতিপত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংস্কারের বিষয় বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ আমরা পাইব।

প্রগতিপত্র (Progress Report)—প্রত্যেক ছাত্রের জন্যই বিদ্যালয়ে প্রগতিপত্র রাখা হয়। ছাত্রদের পড়াশোনায় উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবক-দের দেওয়াই প্রগতিপত্র রাখার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই নিজ কাজে প্রগতিপত্রের কোন ব্যবহার করে না; সাধারণতঃ বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্রদের একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করানো হয়। যদি কোন ছাত্র বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারে তবেই শুধু তাহার পূর্ব পূর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গতঃ বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। খুব অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ই বৎসরের সবকয়টি পরীক্ষার ফলাফল একত্র করিয়া তাহার ভিত্তিতে ছাত্রদের উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু ছাত্রদের পড়াশুনায় উন্নতি-অবনতির সংবাদ অভিভাবকদের দেওয়া যে প্রয়োজন তাহা সকল বিদ্যালয়ই স্বীকার করে। অভিভাবকগণও ইহা বিদ্যালয় হইতে তাঁহাদের প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। প্রগতিপত্র অভিভাবক-দের কাছে পাঠাইয়া বিদ্যালয় যেন ছাত্রের পড়াশুনার ভালমন্দ সম্বন্ধে দায়মুক্ত হইয়া পড়ে। "আপনার ছেলে পড়শুনায় ভাল করিতেছে না, এখন আপনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন" এই ধরণের একটা মনোভাব লইয়া প্রগতিপত্র অভিভাবকদের নিকটে পাঠানো হয়; যেন পড়াশুনায় ছাত্রদের উন্নততর করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নহে। বিদ্যালয় বৎসরশেষে প্রয়োজনবোধে ছাত্রকে "ফেইল" করাইয়া (পর পর ২।৩ বৎসর ফেইল করিলে) বা তাহাকে শিক্ষাদানযোগ্য নহে বলিয়া বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া তাহার সম্বন্ধে নিজ দায়িত্ব পালন করে। বস্তুতপক্ষে ছাত্রের শিক্ষা লাভ কার্য অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করিতে পারিলে এবং বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগি-তার সোপান রচনা করিতে পারিলে প্রগতিপত্র রক্ষা করা সার্থক হয়। ইহাই প্রগতিপত্র রক্ষা করার মূল উদ্দেশ্য। বৎসরে কয়বার প্রগতিপত্র রক্ষা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কোন ঐক্য নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রতিমাসেই (লম্বা বন্ধগুলি বাদ দিয়া) ছাত্রদের প্রগতিপত্র প্রস্তুত করে, আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে বৎসরে একবার বা দুইবার মাত্র প্রগতিপত্র প্রস্তুত হয়। মনে রাখিতে

হইবে যে, প্রগতিপত্রকে বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মধ্যে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি-কল্পে সহযোগিতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা অন্ততঃ দুইমাস অন্তর প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এক বৎসরের মধ্যে যতকগুলি প্রগতিপত্র প্রস্তুত হইবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ প্রথম প্রগতিপত্রে ছাত্র কোন বিষয়ে যে নম্বর পাইয়াছে তাহার উল্লেখ দ্বিতীয় প্রগতিপত্রের ঐ বিষয়ের নম্বরের পাশে থাকা উচিত। তাহা হইলে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে অভিভাবকগণ আরও স্পষ্ট ধারণা পাইতে পারেন। মোটকথা একটি ছাত্রের একবৎসরের সবগুলি পরিমাপ আলাদা আলাদা কাগজে আলাদা আলাদা প্রগতিপত্র হিসাবে না রাখিয়া একখানা কাগজে একটি সামগ্রিক-প্রগতিপত্ররূপে (বৎসরে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি-অবনতির পরিমাপের হিসাবে) রাখিলে ভাল হয়। এক বৎসরে কোন বিষয়ে ছাত্রের শিক্ষার যতগুলি পরিমাপ গ্রহণ করা হইবে তাহা পাশাপাশি লেখা থাকিবে। দুঃখের বিষয় প্রগতিপত্র প্রস্তুত করার সময় খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ই উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রগতিপত্রের মাধ্যমে ছাত্রসম্বন্ধে অভিভাবকদের কি ধরণের সংবাদ জানানো হইবে তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে প্রগতিপত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু সকল বিদ্যালয়ই পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছাত্র কি পরিমাণ আয়ত্ত করিতে পারিল তাহার পরিমাপকে প্রগতিপত্রের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করে। তাই ছাত্রের পরীক্ষার নম্বর প্রগতিপত্রে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়গুলি বুঝিতে পারে না যে, শুধু নম্বর হইতে ছাত্রের পড়াশুনার উন্নতি-অবনতির সম্যক চিত্র পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া পূর্বে আলোচিত প্রস্তাব অনুযায়ী যদি এক বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার নম্বর পাশাপাশি রাখা হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র নম্বর হইতে কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষায় সে ভাল করিল কি মন্দ করিল তাহা বুঝা কঠিন।

ধরা যাউক, বৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় কোন ছাত্র ইংরেজিতে যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ নম্বর পাইল। দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রশ্ন প্রথম পরীক্ষার প্রশ্ন হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ার জন্য ঐ পরীক্ষায় হয়ত নম্বর উঠিয়াছে বেশী; তাই ৫০ নম্বর পাইয়াও প্রথম পরীক্ষায় ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে সে হয়ত দ্বাদশস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ প্রথম পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পাইয়া সে হয়ত ঐ বিষয়ে দশমস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় সে পিছাইয়া পড়িতেছে

কিন্তু শুধু নম্বর দ্বারা বিচার করিলে আমাদের মনে বিপরীত ধারণারই সৃষ্টি হইবে। তাই প্রগতিপত্রে কোন বিষয়ের নম্বর লিপিবদ্ধ করিলে তাহার পাশে ঐ বিষয়ে ছাত্র শ্রেণীতে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

ছাত্রের পড়াশুনায় উন্নতি হইতেছে না অবনতি হইতেছে শুধু এইটুকু সংবাদই বিদ্যালয়ের সহিত অভিভাবকদের সহযোগিতা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। যেসব ছাত্র পড়াশুনায় উন্নতি করিতে পারিতেছে না তাহারা কোন্ বিষয়ে কেন উন্নতি করিতে পারিতেছে না ইহা অভিভাবকদের জানাইতে না পারিলে তাঁহারা ছাত্রদের পড়াশুনার উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন না (একমাত্র গৃহশিক্ষক রাখা ব্যতীত)। তাই প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য পরিমাপকারী (Evaluative) পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কারণ নির্ণয়কারী (Diagonostic) পরীক্ষা গ্রহণ করা ভাল। কারণ নির্ণয়কারী পরীক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের মান নির্ণয় করিতে পারিবে অপরদিকে উহা কি কি কারণে সে ঐ বিষয়ে আশানুরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না তাহারও ইঙ্গিত দিবে। ধরা যাউক, কোন অভিভাবক যদি জানিতে পারেন যে, ছাত্রের অঙ্ক-শিক্ষা আশানুরূপভাবে চলিতেছে না, তাহার কারণ সে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগের গাণিতিক তাৎপর্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তিনি ঐক্ষেত্রগুলিতে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে পারেন। কাজেই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক পরীক্ষায় পরিমাপকারী (Evaluative) পরীক্ষার পরিবর্তে কারণ নির্ণয়ণকারী (Diagonostic) পরীক্ষার অধিকতর প্রচলন হইবে ইহাই আশা করা যাইতেছে।

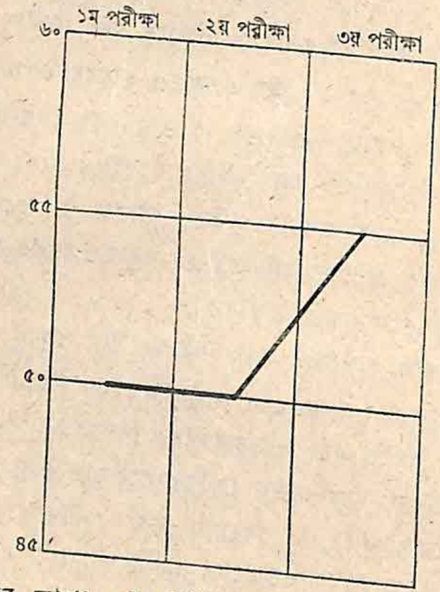
বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত প্রগতিপত্রে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হিসাবও থাকে। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ইহার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় সামান্য কারণে, এমনকি বিনা কারণেও ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। অথচ একদিনের অনুপস্থিতিও ছাত্রের শিক্ষাকার্যে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিকার অনেকখানিই অভিভাবকদের হাতে। তাই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য যে ছাত্রের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে এ বিষয়ে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিনাকারণে অনুপস্থিতি সমস্যার মধ্যে গণ্য নহে সে বিদ্যালয়ে ইহার হিসাব প্রগতিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

ছাত্রের চরিত্র (Conduct) সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণাও প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'চরিত্র' বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকার দরুণ প্রগতিপত্রে চরিত্রের ঘরে প্রায় সকল ছাত্রই "ভাল" (Good) মন্তব্য পায়। বিদ্যালয়ের দৃষ্টিতে খুব গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে "মন্দ" মন্তব্য কোন ছাত্রই পায় না। কোন ছাত্র সম্বন্ধে ঐ ধরণের মন্তব্য করিলে স্বাভাবিক কারণেই অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইয়া বিবাদের ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়। কাজেই "চরিত্র" নামে কোন অনির্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা প্রগতিপত্রে লিপিবদ্ধ না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে সব চারিত্রিক গুণাবলী বা অভ্যাস গঠিত না হইলে ছাত্রের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে (আত্মবিশ্বাস, সততা, পরিশ্রমশীলতা প্রভৃতি) সেগুলির পরিমাপের (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) ফলাফল প্রগতিপত্রে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে এবং অভ্যাস গঠনে গৃহের (Home) অবদানও খুব বেশী। কিন্তু এক্ষেত্রেও ছাত্রের কোন চারিত্রিক গুণ বেশী আছে কি কম আছে—এ সংবাদ অভিভাবককে দেওয়াই যথেষ্ট নহে। কি কারণে কোন চারিত্রিক-গুণ অল্প বিকশিত হইয়াছে—সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত না দিতে পারিলে অভিভাবক বিদ্যালয়ের সহিত আশানুরূপ সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। কাজেই ভবিষ্যতে চারিত্রিক-গুণাবলীর ক্ষেত্রেও আমাদের কারণ নির্ণয়ণকারী পরীক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।

উপরোক্ত তথ্যগুলি ব্যতীতও ছাত্র সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ প্রগতিপত্রে দেওয়া হইবে কি না (স্বাস্থ্য, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি) তাহা নির্ভর করিবে বিদ্যালয়ের সঙ্গতি এবং অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষার উপর। ধরা যাউক, যে বিদ্যালয়ে ডাক্তারের সাহায্যে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ আছে, সে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট প্রগতিপত্রের অংশ হিসাবে অবশ্যই অভিভাবকের নিকট পাঠাইবে। কিন্তু প্রতিবার প্রগতিপত্র প্রস্তুত হওয়ার পর শিক্ষক এবং অভিভাবকের মিলিত আলোচনার দ্বারা কিভাবে ছাত্রের শিক্ষার উন্নতি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে প্রগতিপত্র প্রস্তুত করা সার্থক হইতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক শাখার (Section) জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন করিতে না পারিলে প্রগতিপত্র রক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

কিউমিউলেটিভ্‌ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card)

বর্তমানে ছাত্র সম্বন্ধে এক নূতন ধরণের প্রগতিপত্র বিদ্যালয়ে প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। ইংরেজিতে ঐ ধরণের প্রগতিপত্রকে কিউমিউলেটিভ্‌ রেকর্ড কার্ড বলে। 'কিউমিউলেটিভ্‌' শব্দের মোটামুটি অর্থ "একের উপরে আর"। এই ধরণের প্রগতিপত্রে ছাত্র সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পরিমাপের ফলাফল পাশাপাশি লিপিবদ্ধ থাকে। একটি পরিমাপের ফলের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে ছাত্রের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে না। ধরা যাউক, কোন ছাত্র ইংরেজিতে তিনমাস অন্তর গৃহীত তিনটির পরীক্ষায় যথাক্রমে ৫০, ৫০ ও ৫৫ নম্বর পাইল। কিউমিউলেটিভ্‌ রেকর্ড রাখার নীতি অনুসারে ঐ নম্বর নিম্নপ্রদত্ত নক্সার আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।



"একের উপরে আর" এই নীতি অনুসরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করার ফলে আমরা ছাত্রের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক সংবাদ পাইলাম ; আমরা জানিতে পারিলাম যে, ছাত্রের ইংরেজি শিক্ষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দুই পরীক্ষায় সে ইংরেজিতে সমান নম্বর পাইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় পরীক্ষার ফল তাহার ইংরেজি জ্ঞানের উন্নতি সূচিত করিতেছে।

এই সংবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ বিষয়ে, বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্র কত সমান নম্বর পাইতেছে, তাহা জানা অপেক্ষা এক পরীক্ষা অপেক্ষা অপর পরীক্ষায় সে বেশী বা কম নম্বর পাইতেছে তাহা জানা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় সকলে সমান নম্বর পাইবে ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু প্রতিছাত্রই শিক্ষার ফলে উন্নত হইতে উন্নততর হইবে—সে প্রগতির পথে অগ্রসর হইবে ইহা সকলেই আশা করে। ছাত্র প্রথম পরীক্ষায় যে নম্বর পাইয়াছে, দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাহার চাইতে কিছু বেশী পাইবে এবং এই ভাবে সে ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া চলিবে। কিন্তু যখনই তাহার উন্নতির গতি রুদ্ধ দেখা যাইবে—যখনই সে পর পর পরীক্ষায় সমান নম্বর পাইতে থাকিবে তখনই তাহার সম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে বুঝিতে হইবে; যখন বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তাহার অবনতি সূচিত করিবে তখন তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আর চলিতেছে না এসম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে হইবে।

আবার, কিউমিউলেটিভ্ সংজ্ঞা সার্থক করিতে হইলে একটি মাত্র পরিমাপের ভিত্তিতে কোন ফলাফল কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা চলে না। ঐ রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি পরিমাপ একাধিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফল। আমরা যতই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করি না কেন নানা কারণেই মানুষকে পরিমাপ করার চেষ্টায় ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে; তাই কয়েকটি পরিমাপের সমষ্টিগত ফল একটি পরিমাপের ফল হইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাজেই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড এমন এক ধরণের প্রগতিপত্র যাহাতে ছাত্রের শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয়ের সমগ্র বিদ্যালয় জীবন ব্যাপিয়া ধারাবাহিক পরিমাপের ফল (প্রতিটি লিপিবদ্ধ ফল একাধিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফল) পাশাপাশি ("একের উপরে আর") লিপিবদ্ধ করা হয়। ছাত্র বিদ্যালয় পরিবর্তন করিলে তাহার রেকর্ড কার্ডও সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সমগ্র বিদ্যালয় জীবনকে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রাখার উদ্দেশ্যে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়-জীবনের জন্য একখানা, মাধ্যমিকের জন্য একখানা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আর এক খানা রেকর্ড কার্ড রাখা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ

পরীক্ষা সংস্কারের জন্য যে উপদেষ্টা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন উহার পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপর্ষদ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য একখানা রেকর্ড কার্ড এবং নবম দশম এবং একাদশ শ্রেণীর জন্য আর একখানা রেকর্ড কার্ড রাখা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card) **ও অভিভাবকদের নিকট প্রেরিত প্রগতিপত্র** (Progress Report)—কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ও অভিভাবকদের নিকট প্রেরিত প্রগতিপত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপকতর (পরে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে)। প্রগতি-পত্রের মত উহা অভিভাবকদের নিকট পাঠান হয় না। ইহা সাধারণতঃ গোপনীয় রাখা হয়। যিনি এই রেকর্ড কার্ড ব্যবহার করিবেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও ইহা সচরাচর দেখিতে দেওয়া হয় না। অভিভাকদের মধ্যে কেহ যদি ইহা দেখিতে চান তবে তিনি বিদ্যালয়ে আসিয়া তাহা দেখিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে যতগুলি পরিমাপ লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের প্রত্যেকটি একাধিক পরিমাপের সমষ্টি ; কিন্তু প্রগতিপত্রের ক্ষেত্রে এরূপ নাও হইতে পারে। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু প্রগতিপত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেক ব্যাপকতর ; প্রকৃতপক্ষে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের অংশ-বিশেষ লইয়া প্রগতিপত্র রচিত হয় (পরে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার উদ্দেশ্য—কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড নিষ্ঠা সহকারে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রক্ষিত হইলে ইহার ব্যবহার বহুবিধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ভালভাবে রক্ষিত হইলে উহা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা সংস্কারের কাজে লাগিবে। এক সঙ্গে সমগ্র স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া ছাত্রের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে ঐ পরীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ অধুনা কিছুটা কার্যকরী করা হইয়াছে—উচ্চ মাধ্য-মিক বিদ্যালয়গুলি নবম শ্রেণীর শেষে, হিন্দি ও শিল্পের (craft) এবং দশম শ্রেণীর শেষে সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) ও অঙ্কের (Mathematics) পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ হয়ত বিদ্যালয়কে ঐসব বিষয়ের নম্বর

পৃথকভাবে পরীক্ষা করিয়া না পাঠাইয়া ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ভিত্তিতে পাঠাইতে নির্দেশ দিবেন। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের লিপিবদ্ধ নম্বর (একাধিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রদত্ত) যে ঐ এককালীন গৃহীত পরীক্ষার নম্বর (যাহা হইতে অধিক নির্ভরযোগ্য) হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন পরে হয়ত উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি সকল বাধ্যতামূলক বিষয়ের (Compulsory Subjects) পরিমাপই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের মাধ্যমে হইবে; শুধু বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষয়গুলির জন্য বাহ্যিক (External) পরীক্ষা গৃহীত হইবে। শেষ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে বাহ্যিক পরীক্ষা থাকিবে তাহাদেরও আংশিক নম্বর (হয়ত শতকরা ২৫) কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের নম্বরের ভিত্তিতে প্রদত্ত হইবে। যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে-না তাহাদের স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য হয়ত বাহ্যিক পরীক্ষা লইবার প্রয়োজনই অনুভূত হইবে না। কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডকেই মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। নিষ্ঠাসহকারে সকল বিদ্যালয় এক পদ্ধতিতে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পরিমাপের মানে খুব বেশী পার্থক্য হইবে না (কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড প্রস্তুত করার পদ্ধতি পরে আলোচনা করা হইবে)। তাহার পরও যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে তাহা গাণিতিক (Statistical) পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা অসম্ভব নয়। এককথায় কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের সাহায্যে আমাদের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার দোষত্রুটির অনেকখানি প্রতিকার হইতে পারে, এমন কি একদিন হয়ত ঐ ধরণের পরীক্ষার হাত হইতে আমরা একেবারেই রেহাই পাইতে পারি।

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড আরও নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজন-সিদ্ধ করিতে পারে। বেকারসমস্যা আমাদের সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উপযুক্ত বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের দ্বারা এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। আবার বৃত্তিবিষয়ক-পরামর্শ দিতে হইলে—কে কোন্ বৃত্তির উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে হইলে, বৃত্তিপ্রার্থীর ক্ষমতা (ability), অর্জিত জ্ঞান (attainment), আগ্রহ (interest), চারিত্রিক গুণাবলী (personality-traits) প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পরামর্শদাতার হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। একমাত্র কিউমিউ-লেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডই ঐসব তথ্য বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদাতাকে যোগাইতে পারে। ভবিষ্যতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange)গুলির মাধ্যমেই

চাকুরীতে লোক নিযুক্ত হইবে। কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড বিদ্যালয়ে রাখা আরম্ভ হইলে ঐ কার্ড ব্যতীত কাহারও নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় লেখা হইবে না। কারণ, প্রধানতঃ ইহার ভিত্তিতেই কে কোন্ কাজের উপযুক্ত এক্সচেঞ্জ তাহা স্থির করিবেন। নিয়োগকারীরাও নিজ প্রয়োজনেই কর্মচারী নির্বাচনকালে প্রার্থীর কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে সংগৃহীত তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবেন। এককথায় বৃত্তিসংস্থানের প্রয়োজনে নানাভাবে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ব্যবহৃত হইবে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। শিক্ষা দিতে হইলে অন্ততঃ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের যথোচিত মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা খুব সামান্য বলিয়া ছাত্রের কাছে তাহার মর্যাদা রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তারপর নিজ কার্যের যথোচিত মর্যাদা না পাইলে ইহা নানাভাবে ব্যক্তিত্বের অধোগতি ঘটাইয়া থাকে। তাই বর্তমানে নানাভাবে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হইতেছে। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে এবং বৃত্তি সংস্থান করিয়া দেওয়ার কার্যে যদি কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তবে যে শিক্ষক এই রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করিতেছেন তাহার সামাজিক মর্যাদা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষাদান-কার্যে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তথ্য সর্বদা শিক্ষকের সম্মুখে থাকা প্রয়োজন। তারপর নবম শ্রেণীতে উঠিলে কোন্ ছাত্র কি বিশেষ বিষয় লইয়া পড়াশুনা করিবে তাহা স্থির করিতেও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের একান্ত আবশ্যক। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠশেষে কে কোন্দিকে পড়াশুনার চেষ্টা করিবে সে বিষয়ে মনস্থির করিতেও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড সাহায্য করিবে। অবশেষে, শিক্ষক যখন ছাত্রকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেছেন তখন কিছু দিন পরপরই তাঁহার চেষ্টার ফলাফল বিধিবদ্ধভাবে নিরূপণ করিয়া প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান-প্রচেষ্টার পরিবর্তন না করিলে শিক্ষাদান-কার্য কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। ফলাফল নিরূপণের চেষ্টা না করিয়া আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আমাদের প্রচেষ্টা এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইতেছে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু—উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি সার্থক করিতে হইলে বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে উহা ত্যাগ করা পর্যন্ত ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশের হিসাব কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেশের সকল শিক্ষাবিদ্ই প্রায় একমত।

১। সর্বপ্রথমই ছাত্রের নাম, ঠিকানা, বয়স প্রভৃতি কতকগুলি 'সাধারণ তথ্য' কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডে রাখিতে হয়। মোটামুটিভাবেও ইহা, ছাত্রের সাধারণ পরিচিতি।

২। ছাত্রের শারীরিক বিকাশ এবং তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শারীরিক বিকাশ আশানুরূপভাবে না চলিলে এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে ছাত্রকে শিক্ষাদান সম্ভব নহে। তারপর, বিদ্যালয়কে শুধু মানসিক বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই চলে না; তাহাকে ছাত্রের শারীরিক বিকাশের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু, ছাত্রের ভবিষ্যৎ শিক্ষা, বৃত্তি প্রভৃতিও তাহার শরীর এবং স্বাস্থ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই শারীরিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড-কার্ডে রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩। ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (abilities)-গুলির বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যও রেকর্ড কার্ডে রাখা প্রয়োজন। অধুনা ঐগুলি পরিমাপের জন্য প্রয়োগসিদ্ধ (standardised) নানা ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological-Tests) বাহির হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একথা মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষমতা অন্তর্নিহিত হইলেও তাহাদের উপরও যে শিক্ষার প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আশানুরূপ ভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে; আবার শিক্ষার সাহায্যে বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই যখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রভাব খুব বেশী তখন উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না।

৪। বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পারিমাণ যে রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

৫। ছাত্রের শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাহার আগ্রহের (interest) মূল্য খুব বেশী। স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রহ না থাকিলে কোন বিষয়ের শিক্ষায় বা কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়। আবার আগ্রহ এমন জিনিষ যে, শিক্ষার সাহায্যে তাহার বিকাশ সম্ভব। আজকাল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আগ্রহ (interest) জাগাইয়া তুলিবার জন্য পাঠদানের মতই বিধিবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাই ছাত্রের আগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য রেকর্ড কার্ড থাকা প্রয়োজন।

৬। ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলী (Personality-traits) সম্বন্ধে তথ্যও রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক-গুণাবলী বিকাশকরণের দায়িত্ব আজকাল বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইতেছে। পরিবার ও সমাজ আজকাল আশানুরূপভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতেছে না। অপর দিকে শিক্ষাব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি শিক্ষকের যতখানি জানা থাকা সম্ভব অপরের ততখানি সম্ভব নহে। চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করিতে হইলে তাহাদিগকে বিধিবদ্ধভাবে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। জীবনের প্রতিটি কার্যের সফলতা চারিত্রিক গুণাবলীর উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। শিক্ষাবিষয়ক বা বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দিতে হইলেও ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৭। ছাত্রের পারিবারিক জীবনের প্রভাব তাহার শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তিনির্ধারণে এত বেশী যে ঐ জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাতাপিতার সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ বা মাতাপিতার আর্থিক ক্ষমতা প্রভৃতি ছাত্রের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

৮। খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা প্রভৃতির সুযোগও ছাত্রদের দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে-কোন কার্যের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তাহারই পরিমাপের প্রয়োজন। আবার ঐসব বিষয়ে দক্ষতার কিছুটা সামাজিক গুরুত্বও আছে। তাই ঐসব ক্ষেত্রে কে কতখানি দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডে আরও অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে। কোন বিষয় রেকর্ড-কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বে শুধু পূর্বে আলোচিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে উহা কোন্‌টি সার্থক করিতে সাহায্য করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ কর্তৃক কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের প্রবর্তন—১৯৫৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড রাখার জন্য নির্দেশ দেন। ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের সহিত সংযুক্ত, বুরো অব এডুকেশনেল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ একখানা কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের 'ছক' (form) প্রস্তুত করেন; মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে উপদেষ্টা সমিতি ঐ ছক পরীক্ষা করিয়া উহার সামান্য কিছু অদল বদল করেন এবং সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই যাহাতে ঐ ছকে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করেন সেরূপ নির্দেশ দিতে পর্ষদ্‌কে পরামর্শ দেন। পর্ষদ্ শ্রীকালী প্রেসের (৬৫ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫) সাহায্যে ঐ ছক ছাপাইয়া লন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ঐ প্রেস হইতে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড কিনিতে পরামর্শ দেন (মূল্য প্রতি ১০০ খানা ১০ টাকা ৬৯ নয়া পয়সা; বিক্রয়কর অতিরিক্ত)। যেসব উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গুলিতে কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড কার্ড রাখা হইতেছে তাহা সার্থক করিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিদ্যালয়কে একই ছকে রেকর্ড কার্ড রাখিতে হইবে। কোন বিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে রেকর্ড কার্ডে অতিরিক্ত তথ্য রাখিতে পারে, কিন্তু পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের ছকে যেভাবে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সকল বিদ্যালয়কেই তাহা পালন করিতে হইবে। বিদ্যালয়গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত বর্তমান ছকের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হইবে; কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের ছক রাখা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন ছকে রেকর্ড কার্ড রাখিলে উহাদ্বারা জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের ছক্
(ইংরেজীতে যে ভাষায় পর্ষদ্ ছাপাইয়াছেন সেই ভাষায় প্রদত্ত হইল)।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, ইহাতে ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার (abilities)

পরিমাপ এবং তাহার গৃহ (home) সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেসব তথ্য নিতান্ত লিপিবদ্ধ না করিলে চলে না এবং যেসব তথ্য মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে শিক্ষকগণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করা যায় শুধু সেইগুলিই আপাততঃ কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য এখনও আমাদের প্রয়োগসিদ্ধ (standardised) বুদ্ধিপরীক্ষার প্রশ্নপত্র (Intelligence Test) প্রস্তুত হইতে কিছুদিন সময় লাগিবে তাই ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিমাপ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডে করা হয় নাই। আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রের গৃহের যোগাযোগ এত অল্প যে, বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের গৃহ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই ছাত্রের গৃহ সম্বন্ধে তথ্য রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করার দাবীও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও আমরা নম্বরদান বিষয়ে আলোচনাকালে বলিয়াছি যে, পরিমাপ যন্ত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদের পাঁচ ধরণের নম্বর দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তথাপি অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডে অর্জিত জ্ঞানের (Scholastic attainment) পরিমাপ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে পরিমাপ-যন্ত্রকে মাত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পরিমাপ যন্ত্র

Below average — Average — Above average

এই ব্যবস্থাও আমাদের বিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়াই করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করার সুযোগ শিক্ষকদের না থাকায় তাহাদের চারিত্রিক-গুণাবলী, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; ঐরূপ চেষ্টা করিলে পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নততর হইলে এবং শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে রেকর্ড কার্ডের বিষয়বস্তু এবং তাহাদের পরিমাপের পদ্ধতি উন্নততর করা যাইবে।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার প্রণালী—মাধ্যমিক পর্ষদের অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের ছক্ অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রের তিন

CONFIDENTIAL

Introduced on..

Junior / Senior — High School Stage

Class..

CUMULATIVE SCHOOL RECORD

NAME AND ADDRESS OF SCHOOL..

....

GENERAL DATA

Name of pupil.. Boy/Girl
(surname first)

Date of birth..
(year) (month) (day)

Father's/Guardian's name..

Address..
(any change to be noted)
....

....

....

Admission Register No. ....

Date of entry..

Transferred to ....

Date..

Transferred from..

Date..

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL,
105/7A, Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-14.

(All entries in this school record are to be made *once*, at the *end of each academic year*).

1. HEALTH RECORD

Year.	General health rating.			Any physical defect.	Serious illnesses.	Any special remark.
	Good.	Average.	Poor.			
195 ...						
195 ...						
196 ...						

2. POSITION OF RESPONSIBILITY HELD IN SCHOOL AND AWARDS, ETC., OBTAINED*

195 ...	
195 ...	
196 ..	

* A position of responsibility means a position like that of a monitor, a captain, etc., and awards include prizes, stipends scholarships, etc.

3. INTEREST*

Categories.	195 .			195 .			196 .		
	Marked.	Average.	Poor.	Marked.	Average	Poor.	Marked.	Average.	Poor.
(*i*) Linguistic ...									
(*ii*) Scientific ...									
(*iii*) Technical ...									
(*iv*) Artistic ...									
(*v*) Musical ...									
(*vi*) Agricultural ...									
(*vii*) Commercial ...									
(*viii*) Interest in household work and management ...									
(*ix*) Any other noted interest ...									

*Rate the pupil's interests on a three-point scale and check (√) in the appropriate column.
Do *not* rate an interest for which there is no opportunity of manifestation in school.

4. SCHOOL

Groups.	Subjects (name the specific subjects in each group).	195 . Average marks in per cent. obtained in periodical and annual examinations.*	Class. Rank in each subject No. in class :	Remarks.
Language and Literature				
Mathematics ...				
Social studies ...				
Science				
Art				
Craft				
Music				
Physical education ...				
Practical ...				
Other subjects ...				

*Give the average of marks of only those examinations

HIEVEMENT

195 .		Class-	196 .		Class.
rage marks per cent. btained in iodical and nnual minations.*	Rank in each subject No.in class :	Remarks.	Average marks in per cent. obtained in periodical and annual examinations.*	Rank in each subject No. in class :	Remarks.

5. CO-CURRICULAR ACTIVITIES*

Groups.	195 .			195 .			196 .		
	Above average.	Average.	Below average	Above average.	Average.	Below average.	Above average.	Average.	Below average.
(*i*) Games and sports ...									
(*ii*) Intellectual and literary									
(*iii*) Recreational									
(*iv*) Social service									
(*v*) Others (N. C. C., Scouting, etc.)									

*Rate the pupil for each group of activities on a three-point scale and check (√) in the appropriate column.

6. PERSONALITY*

Traits.	195 .			195 .			196 .		
	Above average.	Average.	Below average.	Above average.	Average.	Below average.	Above average.	Average	Below average.
(*i*) Initiative ...									
(*ii*) Industry ...									
(*iii*) Responsibility ...									
(*iv*) Co-operativeness...									
(*v*) Emotional balance									
(*vi*) Self-confidence ...									
†(*vii*) Work-habits ...									
(*viii*) Any other trait ...									

* Rate the pupil for each trait on a three-point scale and check (√) in the appropriate column.

† Consider whether the pupil is systematic, methodical, careful or neat in work.

7. OTHER INFORMATION

1. State the nature of the behaviour-problem, if any, shown by the pupil:
   (195)..
   (195)..
   (196)..
2. Name if the pupil possesses any outstanding skill or disability:

Year.	Skill.	Disability.
195 ...		
195 ...		
196 ...		

*3. What course of study you rccommend for the pupil: General/Scientific/Technical etc.

*4. Briefly state the grounds for your recommendation..

*5. What type of vocation you consider most suitable to the pupil..

*6. Briefly state the grounds for your consideration..

*7. Any other information about the pupil you think relevant for guidance..

*To be filled in only at the end of the final year of each school stage, i.e., Junior—VIII, Senior—XI or X

195	195	196

Signature of the Headmaster/Headmistress.

I. N. A. Press, Cal. 6

বৎসরের রেকর্ড এক সঙ্গে থাকিবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রেকর্ড কার্ড রাখা আরম্ভ করা হইবে তাহা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলিবে; দ্বিতীয় রেকর্ড কার্ড নবম শ্রেণীতে আরম্ভ হইয়া একাদশ শ্রেণীতে শেষ হইবে (দশম-শ্রেণী বিদ্যালয় হইলে দশম শ্রেণীতেই শেষ হইবে)। কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের বিষয়বস্তু বিভিন্ন। উহাদিগকে পরিমাপ করিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন হইবে। যে-কোন একজন শিক্ষকের দ্বারা সব কয়টি বিষয়ের পরিমাপ গ্রহণ করাও সম্ভব হইবে না। তথাপি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এবং শাখার (Section) ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ড রক্ষা করার জন্য একজন করিয়া শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। অপরাপর যেসব শিক্ষক শাখার (Section) ছাত্রদের (বিভিন্ন বিষয়ে) পরিমাপ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে তাঁহাদের পরিমাপের ফলাফল পাঠাইবেন এবং তিনি ঐসব ফলাফল যথানির্দেশিত-ভাবে রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করিবেন। যে শাখায় যে শিক্ষক সর্বাপেক্ষা অধিক ক্লাস নেন (সম্ভবতঃ শ্রেণীশিক্ষক) তিনিই সাধারণতঃ ঐ শাখার ছাত্রদের কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এখন আমরা পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত রেকর্ড কার্ডের প্রত্যেকটি বিভাগের কোন্‌টির পরিমাপ কিভাবে করা হইবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব।

General Data :

এই বিভাগে ছাত্রের নাম, ধাম প্রভৃতি সাধারণ পরিচিতি মাত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। সময় থাকিলে বিদ্যালয়ের অফিসও ঐ বিভাগ পূরণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি রেকর্ড কার্ড তিন বৎসর ধরিয়া চলিবে; ফলে প্রতি বৎসর শুধু ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রদের রেকর্ড কার্ডে এই বিভাগ পূরণ করিতে হইবে।

1. Health Record :

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্যতীত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তথ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। কিন্তু, খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েই ডাক্তার দ্বারা ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেসব বিদ্যালয়ে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাদের ভারপ্রাপ্ত-ডাক্তারই এই বিভাগ পূরণ করিবেন এবং ইহার সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টও সংযুক্ত

করিয়া দিবেন। যেসব বিদ্যালয়ে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই তাহাতে প্রতি শ্রেণীর রেকর্ড-কার্ডের জন্য ভারপ্রাপ্ত-শিক্ষক এই বিভাগ পূরণ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, যে, এখানে ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে (চেহারা, শারীরিক-শক্তি, গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে নহে) শিক্ষক তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তিনি যে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রেণী-শিক্ষক হিসাবে ছাত্রের অনুপস্থিতি এবং অসুখের সংবাদের ভিত্তিতেই ছাত্রদের স্বাস্থ্যের বিচার করিয়া তিনি তাহাদের তিন ভাগে বিভক্ত করিবেন (Good, Average, Poor)। প্রয়োজনবোধে তিনি কোন কোন ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানও করিতে পারেন। ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ত্রুটি থাকিলেও তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে এমন ধরণের ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে যাহা বিশেষজ্ঞ না হইলেও শিক্ষকের চোখে সন্দেহাতীতভাবে ধরা পড়ে। ধরা যাউক, কোন ছেলে চশমা ব্যবহার করে; চশমার প্রচলনের ফলে চোখে কম দেখাকে এখন আর গুরুতর শারীরিক ত্রুটি বলা চলে না; অধিকন্তু বিশেষজ্ঞ নহেন বলিয়া কোন্ ছাত্র কত 'পাওয়ার' (power)-এর চশমা ব্যবহার করিতেছে ইহা জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই চশমার ব্যবহারকে গুরুতর শারীরিক ত্রুটি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত নহে। কিন্তু কোন ছাত্র যদি বিশেষভাবে কানে কম শোনে বা কোন ছাত্রের হাত ভাঙ্গিয়া তাহা যদি অনেকটা অকেজো হইয়া থাকে তবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন বৎসর যদি কোন ছাত্র গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে সংবাদও সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন নহে। বৎসরে একবার মাত্র এই বিভাগ পূরণ করিতে হইবে।

2. Position of Responsibility held in School and awards etc. obtained:

বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বিদ্যালয় জীবনের অনেক দায়িত্বই ছাত্রেরা বহন করিয়া থাকে; ভবিষ্যতে তাহারা শ্রেণীকক্ষের ভিতরেও অনেক দায়িত্ব বহন করিবে ইহা আশা করা যাইতেছে। ছাত্রেরা বিদ্যালয় জীবনের দায়িত্ব যত বেশী গ্রহণ করিবে ততই তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে এবং তাহাদের

শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইবে। তাই প্রথমেই বিদ্যালয় জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রচুর সুযোগ ছাত্রদের দিতে হইবে—প্রত্যেক শাখার ছাত্রই যেন ক্ষমতা ও আগ্রহের পার্থক্য হিসাবে কোন-না-কোন ধরণের দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যেসব দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ আছে তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টিকে এই বিভাগ পূরণের সময় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নেতৃত্বে সকল শিক্ষক মিলিয়া স্থির করিয়া লইবেন। পুরস্কার বা বিশেষ স্বীকৃতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ভার-প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বৎসরে একবার এই বিভাগ পূরণ করিবেন।

3. **Interests :**

ছাত্রের আগ্রহ জাগাইয়া তোলাকে বর্তমানে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই কার্যের জন্য 'হবি ক্লাব' (Hobby Club) স্থাপনের প্রয়োজন। সরকার ঐ ধরণের ক্লাব স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়কে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ঐ ধরণের একাধিক ক্লাব স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই বিভাগে বিভিন্ন আগ্রহের ক্ষেত্রের যে নাম দেওয়া হইয়াছে সেই অনুসারে হবি ক্লাবগুলি স্থাপিত হইলে বাস্তবক্ষেত্রে সুবিধা হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে যেসব 'বিশেষ বিষয়' (Special subjects) পড়িবার সুযোগ আছে এবং সমাজে যেসব বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি আছে, প্রধানতঃ সেই অনুসারেই এখানে আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ 'হবি' (Hobby) বলিতে আমরা আরও সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রেরণায় কাজ করা বুঝিয়া থাকি। ফটো তোলা, ডাকটিকিট সংগ্রহ করা প্রভৃতিকে আমরা হবি আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু কাহারও ফটো তোলার আগ্রহকে শিক্ষার এবং জীবনের প্রয়োজনে আরও সুনির্দিষ্টভাবে লাগাইতে হইলে, তাহাকে বিজ্ঞান বা চারুকলা ক্লাবের সভ্য করিয়া দিলে ভাল হয়। ফটো তোলায় যাহার আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহার বিজ্ঞান বা চারুকলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যেও আগ্রহ জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছাত্রের আগ্রহকে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া শিক্ষকের

অন্যতম প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেকর্ড-কার্ডে উল্লিখিত সব রকমের 'হবি ক্লাব' থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ২।৩ রকমের হবি ক্লাব থাকিবে আশা করা যাইতে পারে। যে বিদ্যালয়ে যে বিশেষ-বিষয় পড়িবার সুযোগ আছে সে বিদ্যালয়ে সেই সেই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট 'হবি ক্লাব' অবশ্যই থাকিবে। কোন বিষয়ে 'হবি ক্লাব' না থাকিলে বিদ্যালয় সেই বিষয়ের আগ্রহের পরিমাপের চেষ্টা করিবে না।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজে 'হবি ক্লাবের' সভ্যদের আগ্রহের পরিমাপ করিবেন। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত 'হবি ক্লাবের' সদস্যসংখ্যা সাধারণতঃ ৩০ জনের উপর হওয়া উচিত নহে। প্রয়োজনবোধে এক বিষয়ে একাধিক 'হবি ক্লাব' পরিচালিত হইতে পারে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য হয়ত একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সব কয়টি 'হবি ক্লাবের' সদস্য মিলিত হইবে ; ফলে এক ছাত্রের একাধিক 'হবি ক্লাবে' যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আগ্রহের একটি মাত্র ক্ষেত্রে ছাত্রকে পরিমাপ করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন 'হবি ক্লাবের' ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাঁহার ক্লাবের কোন সদস্যের যদি অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান তবে তাহাও তিনি পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

আগ্রহ পরিমাপ করিবার কালে আগ্রহ এবং দক্ষতার (efficiency) মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। যাহার যে ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে তাহার সে ক্ষেত্রে দক্ষতা জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সব সময়ে ঐরূপ নাও হইতে পারে। কোন ছাত্রের সঙ্গীতে প্রচুর আগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাহার দক্ষতা মোটেই জন্মাইতে না পারে। তাই বাংলা পরীক্ষায় ভাল নম্বর না পাইয়াও কোন ছাত্রের প্রচুর সাহিত্যিক (Linguistic) আগ্রহ থাকিতে পারে।

কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড রাখার নীতি অনুসরণ করিয়া 'হবি ক্লাবের' ভার-প্রাপ্ত শিক্ষক ছয় মাস অন্তর তাঁহার ক্লাবের সদস্যদের আগ্রহের পরিমাপ করিবেন। বৎসরের শেষে দুইটি পরিমাপের ফলাফল বিবেচনা করিয়া তিনি ছাত্রের আগ্রহের পরিমাণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। তার পর তিনি ঐ সিদ্ধান্ত এবং তাহার পূর্বের পরিমাপ দুইটির ফল ছাত্রের রেকর্ড-

কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তিনি পরিমাপকারী শিক্ষকের শেষ সিদ্ধান্ত রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন ক্ষেত্রে আগ্রহের ক্ষেত্র বলিতে কি বুঝায় ইহা স্পষ্টতর করিবার জন্য ছাত্রের মধ্যে ঠিক কি ধরণের ব্যবহার প্রকাশ পাইলে, তাহার কোন্ ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে বুঝিতে হইবে এ সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ্ নিম্নলিখিত রূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

Linguistic : Participates in debate meetings, in literary gatherings. Has interest in the school journal. Reads literary books. Enjoys writing prose and/or poetry.

Scientific : Handles scientific apparatus. Reads literature on Science. Enjoys little scientific experiments. Desires to know about things around.

Technical : Works with machines and tools. Has interest in repairing things, in visiting industrial centres and large machine installations. Enjoys craft work.

Artistic : Draws and/or paints. Enjoys artistic handicraft-work, Has interest in photography, in visiting picture-exhibitions. Reads writings on fine arts.

Musical : Has interest in instrumental and/or vocal music, in dancing. Handles musical instruments. Attends musical concerts, etc. Reads literature on music and dancing.

Agricultural : Has interest in plants and vegetables, in animals, in gardening. Reads literature on agriculture. Visits agricultural shows, etc.

Commercial : Has interest in keeping accounts at home or at school. Reads literature on trade and commerce. Interested in knowing market prices. Enjoys marketing.

Household work and management : Interest in cooking, laundry, nursing, needle-work, house arrangement and decoration and in children.

4. School Achievements :

এ ক্ষেত্রে ছাত্রকে পরিমাপ করিতে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন হইতে অভ্যস্ত। কিন্তু গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির যে দোষ-ত্রুটি আছে শিক্ষকদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্রে নম্বরদান সম্বন্ধে যেসব সংস্কারের কথা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে তাহা সকল বিদ্যালয়কেই প্রবর্তন করিতে হইবে, তারপর, বৎসরে ঠিক কয়টি পরিমাপের ফল একত্র করিয়া (গড় নির্ণয় করার পর) রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হইবে, এ সম্বন্ধেও সকল বিদ্যালয়কে একমত হইতে হইবে। কারণ, এইসব কার্য সকল বিদ্যালয় একভাবে না করিলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পরিমাপের মানের পার্থক্য হইবে এবং বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কিউমিউলেটিভ্-রেকর্ড-কার্ডের পরিমাপকে তাহার স্থলে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না। বর্তমানে সকল বিদ্যালয় বৎসরে সমান সংখ্যক পরীক্ষা গ্রহণ করে না ;—মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যাণ্মাষিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে চালু আছে। বিদ্যালয়ে আভ্যন্তরিক পরীক্ষার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ এখনও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ দেন নাই। বর্তমানে শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, বিষয়-শিক্ষক একাধিক পরীক্ষার ফলাফল একত্র করিয়া গড় নির্ণয় করিবার পর তাহা রেকর্ড-কার্ডে লিপিবদ্ধ করার জন্ম ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে পাঠাইবেন। কোন্ বিদ্যালয়ে কয়টি পরীক্ষার ফল একত্র করা হইবে তাহা বিদ্যালয়ই স্থির করিবে। ছাত্র যদি কোন পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে তবে ঐ পরীক্ষা বাদ দিয়াই তাহার নম্বরের গড় নির্ণয় করিতে হইবে। অবশ্য বিনা কারণে যাহাতে কোন ছাত্র পরীক্ষায় অনুপস্থিত না থাকিতে পারে তাহার জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটি কথা, পূর্ব অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, শুধু 'নম্বর' দ্বারা পরিমাপের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তাই প্রতি বিষয়ে নম্বরের পাশে শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে ছাত্র কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে (২য়, ৫ম, ১০ম ইত্যাদি) তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণতঃ আমরা ছাত্রের সকল বিষয়ের নম্বর একত্র যোগ করিয়া শ্রেণীতে তাহার স্থান নির্ণয় করি। কিন্তু শুধু পুরস্কার বিতরণ ব্যতীত (প্রথম ২।৩টি ছাত্র ব্যতীত অন্ত ছাত্রেরা পুরস্কার পায় না) ঐরূপ স্থান নির্ণয় করার অপর কোন সার্থকতা নাই। প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেণীতে

ছাত্রের স্থান পৃথকভাবে নির্ণয় করিলে তবে সে ঐ বিষয়ে পড়াশুনায় উন্নতি কি অবনতি করিতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

5. Co-Curricular Activities :

বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, আবৃত্তি, বিতর্ক, গানবাজনা, অভিনয়, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যের সুযোগও ছাত্রদের দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করাই ঐসব সুযোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে ঐসব বিষয়ের পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারিলে তাহার প্রত্যক্ষ সামাজিক মূল্যও খুব কম নহে। অধিকন্তু যে সুযোগ ছাত্রকে দেওয়া হইতেছে সে উহাদ্বারা উপকৃত হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য পরিমাপের প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, এইসব ক্ষেত্রে আগ্রহের পরিমাপ না করিয়া পারদর্শিতার পরিমাপ করিতে হইবে। খেলাধূলায় কাহারও খুব আগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু পারদর্শিতা নাও থাকিতে পারে। পরিমাপের সময় আগ্রহকে বিবেচনার মধ্যে না আনিয়া পারদর্শিতারই পরিমাপ করিতে হইবে ; তাহা না হইলে একের বদলে অপরকে পরিমাপ করিয়া আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইব। যে শিক্ষক যে কো-ক্যারিকোলার একটিভিটির ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন তিনি ছাত্রদের সেই একটিভিটি পরিমাপ করিবেন। আগ্রহের পরিমাপের মত ঐসব ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিমাপও ছয় মাস অন্তর, বৎসরে দুই বার করিতে হইবে এবং দুইটি পরিমাপের ফলের ভিত্তিতে শেষ পরিমাপ করিয়া ছাত্রের রেকর্ড-কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে সকল ছাত্র কার্যগুলিতে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় তাহার জন্য ছাত্রদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া (৩০।৪০ জনের দল) ঐসব কার্যের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। যে বিষয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সুযোগ নাই সে বিষয়ে ছাত্রদের পারদর্শিতার পরিমাপ করার চেষ্টা না করাই ভাল।

6. Personality :

আজকাল, বিদ্যালয়কে ছাত্রদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর বিকাশের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হয়। যে-কোন কিছু বিকাশের বিধিমত চেষ্টা করা হইলে, উহাকে বিধিমত পরিমাপের চেষ্টাও করিতে হয়। কিউমিউলেটিভ্-

রেকর্ড-কার্ডে যেসব চারিত্রিক গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকটির গুরুত্বই খুব বেশী ; বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়াই ঐসব গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু চারিত্রিক গুণাবলী পরিমাপ করিতে গেলে কতকগুলি বিশেষ সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমেই কোন চারিত্রিক গুণ বলিতে আমরা ঠিক কি ধরণের ব্যবহার বুঝি তাহা স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে ; তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক একই গুণের পরিমাপ করিতেছেন মনে করিলেও হয়ত প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গুণেরই পরিমাপ করিয়া বসিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এক আলোচনা সভার মাধ্যমে ছাত্রদের নেতৃত্ব ক্ষমতা (Leadership) পরিমাপ করিতে গিয়া দুইজন শিক্ষকের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ঘটে। কোন ছাত্রকে এক শিক্ষক 'মাঝারি হইতে উপরে' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন অথচ অপর শিক্ষকের মতে সে 'মাঝারি হইতে নীচে'। আলোচনাকালে প্রকাশ পায় যে, আলোচনা সভায় ছাত্রটি সর্বাপেক্ষা অধিক কথা বলিয়াছে বলিয়া প্রথম শিক্ষক তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিক্ষক বুঝাইয়া দিলেন যে, ছাত্রটি আলোচনা সভায় যথেষ্ট কথা বলিলেও অপর কেহ কোন বিষয়েই তাহার মতামত সমর্থন করে নাই, বরং সকলে তাহার মতের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে। এই বিবেচনায় নেতৃত্ব ক্ষমতায় ছাত্রটি 'মাঝারি হইতে নীচে' বলিয়া তিনি অভিমত পোষণ করিয়াছেন। এই স্থলে নেতৃত্ব ক্ষমতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় সে বিষয়েই প্রধানতঃ শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল। যাহাতে এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ রেকর্ড কার্ডে প্রদত্ত প্রত্যেকটি চারিত্রিক গুণের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

DESCRIPTION OF THE PERSONALITY TRAITS (TO BE RATED) SCALE-WISE IN TERMS OF BEHAVIOURS

	Above average	*Average*	*Below average*
Initiative ...	Usually does things of his own accord ; does not wait for others' instruction.	Only occasionally does things of his own accord ; almost always waits for others' instructions.	Never does things of his own accord ; always waits for others' instructions.

Industry ...	Very hard-working, works in spite of difficulties.	Moderately hard-working. Does not usually work in the face of difficulties.	Lazy. Would at once give up in the face of difficulties.
Respon-sibility ...	Absolutely dependable in trying circumstances. Shoulders responsibility in his own accord.	Dependable in ordinary circumstances. Does not shirk responsibility.	Not dependable. Shirks responsibility.
Co-opera-tiveness ...	Always eager to lend a helping hand without being obtrusive ; enjoys working with others.	Sometimes lends a helping hand to others without being obtrusive. Does not dislike working with others.	Does not lend a helping hand to others ; does not like to work with others.
Emotional ... balance	Never gives way to extreme emotions; always cool and composed ; always has a buoyancy of spirit.	Sometimes gives way to extreme emotions ; not always cool and composed ; does not always have a buoyancy of spirit.	Easily gives way to extreme emotions ; always restless and disturbed ; does not have buoyancy of spirit.
Self-con-fidence ...	Relies on own judgement and power ; always faces new problems boldly.	Cannot always rely on own judgement and power ; cannot always face new problems boldly.	Cannot rely on own judgement and power ; cannot face new problems boldly.
Work habits ...	Always systematic and correct in work ; has developed a 'style' of his own.	Not always neat, systematic and correct. Has not quite succeeded in developing a 'style' of his own.	Not neat, systematic and correct. Has no 'style' of his own.

দ্বিতীয়তঃ, পারিপার্শ্বিকের বিভিন্নতার ফলে একই মানুষের ব্যবহার বিভিন্ন হইতে পারে। ধরা যাউক, যে ছাত্রের ইংরেজির ক্লাসে প্রচুর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, খেলার মাঠে হয়ত তাহারই আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে ছাত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া তবে তাহার চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়। একজন শিক্ষক দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। ছাত্রদিগকে ৭০।৮০ জনের দলে বিভক্ত করিয়া দুই বা তিনজন শিক্ষকের উপর তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলী পরিমাপের দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষক এমন হইবেন যাহার শ্রেণী কক্ষের ভিতর ছাত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার প্রচুর সুযোগ আছে। অপর শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ছাত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার সুযোগ থাকিবে। প্রত্যেক শিক্ষকই ছয়মাস অন্তর ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী স্বাধীনভাবে পরিমাপ করিয়া ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন। তারপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ (২ বা ৩জন) একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের স্বাধীন পরিমাপের ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া কোন্ ছাত্রকে কোন্ চারিত্রিক গুণে পরিমাপ যন্ত্রের কোন্ বিভাগে ফেলিবেন (Above average, Average, Below average) সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বৎসরের শেষে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ আবার ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী স্বাধীনভাবে পরিমাপ করিয়া দ্বিতীয়বার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একত্র মিলিত হইবেন। তারপর দুইটি "চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের" ফলাফল একত্র করিয়া বিবেচনা করিয়া তবে ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলীর পরিমাপের ফল নিশ্চিতরূপে স্থির করিবেন এবং তাহা ছাত্রের রেকর্ড-কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইবেন।

শ্রেণীকক্ষের ভিতর ছাত্রেরা আমাদের পড়ানোর ত্রুটির জন্য অধিকাংশ সময়ই চুপচাপ বসিয়া থাকে; ফলে তাহাদের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ শ্রেণীকক্ষের ভিতরে খুব বেশী হয় না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকগণ যদি অন্ততঃ কিছুটা 'একটিভিটি' (Activity) পদ্ধতিতে পড়ান এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে একটি করিয়া শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সমাধান (কোন প্রশ্নের উত্তর করিতেও বলা যাইতে পারে) করিতে বলেন (Group method) তবে একদিকে শিক্ষাদান কার্য যেমন উন্নততর প্রণালীতে চলিবে, অপরদিকে ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশেরও

সুযোগ তেমনি পাওয়া যাইবে। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য চলিলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধও অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে এবং ছাত্রদের চারিত্রিক গুণাবলী আপনা হইতেই শিক্ষকদের নিকট প্রকাশিত হইবে।

সর্বশেষে মনে করিতে হইবে যে, একটি ছাত্রের সবগুলি চারিত্রিক গুণের পরিমাপ একসঙ্গে করিলে চলিবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ করিলে কোন ছাত্রকে কোন চারিত্রিক গুণের পরিমাপে একবার উপরের বা নীচের বিভাগে ফেলিলে অপর গুণগুলির পরিমাপের সময়ে তাহাকে একই বিভাগে ফেলিবার একটা দুর্বলতা পরিমাপকের মনে সৃষ্টি হয়। তাই ছাত্রদের একটি দল (group) লইয়া তাহাদের সকলকে একবারে একটিমাত্র চারিত্রিক গুণের সম্বন্ধে পরিমাপ করিতে হয়।

7. Other Informations :

এখানে প্রথমেই ছাত্রের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যবহার-সমস্যার (behaviour-problem) সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ করিতে বলা হইয়াছে। কোন ব্যবহার-সমস্যা খুব গুরুতর না হইলে—ইহার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য অত্যাবশ্যক মনে না করিলে উহার উল্লেখ রেকর্ড কার্ডে না করাই উচিত। ছাত্রদের অযোগ্যতার (Disability) উল্লেখ করা সম্বন্ধেও ঐ একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, (নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, খোঁড়া, খুব তোৎলা এইসব উল্লেখ করা যাইতে পারে)। ছাত্রের বিশেষ পটুতার (skill) উল্লেখ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ পটুতা এমন ধরণের হওয়া চাই যে, ঐ বয়সের ছাত্রদের মধ্যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে যে সাতটি বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ আছে তাহাদের মধ্যে ছাত্র কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িবে সে সম্বন্ধে রেকর্ড কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে মতামত দিতে হইবে। রেকর্ড কার্ডে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতেই শিক্ষক ঐ মতামত দিবেন। তবে এইমত ছাত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত নহে। কারণ এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে আরও নানারকমের তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গাইডেন্স কমিটি (Guidance Committee) গ্রহণ করিয়া থাকেন (শেষ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এই বিভাগে যতগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করার কথা আছে

তাহার সবগুলিই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিজের বিবেচনা হইতে লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে প্রয়োজনবোধে তিনি ঐ সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক ও টিচার কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করায় অসুবিধা—মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদের নির্দেশ অনুসারে অনেক বিদ্যালয় কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আবার অনেক বিদ্যালয় এখনও একার্যে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। প্রথমেই সকলের মনে হইতেছে যে, শিক্ষকগণ কর্মভারে যেভাবে ভারাক্রান্ত তাহাতে রেকর্ড কার্ড সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা পাইবেন না। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখাকে তাঁহারা 'অতিরিক্ত কাজ' বলিয়া মনে করিতেছেন। অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা এবং শিক্ষাদান কার্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ইহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কিছুদিন পরপরই শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ফলাফল ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ হইল তাহা জানিতে না পারিলে অন্ধের মত আর অগ্রসর হইয়া লাভ কি? বর্তমান জগতে সময় এবং কার্যের-পরিমাণের মধ্যে কেহই সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেছেন না; তাই কোন্ কার্যটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন্‌টি বা একটু গৌণ এই বিচার করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হয়। এই বিবেচনায় কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করা যে আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক কার্য হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজন হইলে অন্য কার্যের বিনিময়েও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রস্তুত করার জন্য সময় দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে মনে করেন যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রাখা সম্ভব নহে এবং রাখিয়াও বাস্তবক্ষেত্রে কোন লাভ হইবে না। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, ছাত্রদের আগ্রহ চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতির পরিমাপ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নহে। কিন্তু এই পাপচক্রের (vicious circle) অবসান যদি ঘটাইতে হয় তবে কোথাও না কোথাও ত আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিবে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও ঐরূপ পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং কোন

দিকেই (এমন কি স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলের কথা বিচার করিলেও) উহা ক্ষতিকর হইবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই যদি নিম্নলিখিত কার্যগুলি কিউমিউলেটিভ-রেকর্ড-কার্ড রক্ষার আনুসঙ্গিক হিসাবে আরম্ভ হয় তবে সুষ্ঠুভাবে রেকর্ড-কার্ড রক্ষা করাও হয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যও অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়—১। হবিক্লাব স্থাপন, ২। পাঠ্যসূচীর-আনুসঙ্গিক-কার্যাবলী (Co-curricular activities) ছাত্রদের ছোট ছোট দলের অনুষ্ঠানে প্রবর্তন করণ, ৩। শ্রেণীকক্ষের ভিতর কিছু কিছু কর্মপ্রধান (activity) এবং দলগত কর্মপদ্ধতির শিক্ষা প্রচলন করণ। বস্তুতপক্ষে আমাদের অনেকে প্রগতিশীল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ঐ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহাদের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফলও ভাল হইতেছে। উপরোক্ত ধরণের কার্য বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হইলে ছাত্রদের আগ্রহ, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতির পরিমাপ শিক্ষাদান কার্যের সঙ্গে সঙ্গেই চলিবে; উহার জন্য তেমন কিছু পৃথক সময় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। শিক্ষকদের পরস্পরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিবার জন্য এবং পরিমাপগুলি কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় লাগিবে মাত্র। একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড প্রবর্তনের জন্য একজন শিক্ষকের সমগ্র বৎসরে ২৫।৩০ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে ঐ সময় শিক্ষকের গতানুগতিক কর্মসূচীর কিছুটা অদল বদল করিয়া বাহির করা অসম্ভব নহে। আর একটি কথা নানা সময়ে নানা ধরণের পরিমাপের জন্য ছাত্রদের নাম শিক্ষকের বার বার প্রয়োজন হইবে। তাই বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের নাম ছাপাইয়া লইলে কাজের অনেকটা সুবিধা হয়। ঐরূপ ছাপার ব্যয়কে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ "অনুমোদিত ব্যয়" বলিয়া গণ্য করিবেন আশা করা যায়। রেকর্ড কার্ড রক্ষার কার্যে নিষ্ঠাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা। নিষ্ঠা থাকিলে কোনরূপ পরিমাপ করাই অসম্ভব হইবে না। আবার কখনও যদি কোন পরিমাপ সম্বন্ধে শিক্ষকের মনে সন্দেহ থাকে তবে পরিমাপের ফল লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে তিনি নিজ মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন; কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ডের সকল পরিমাপের পাশেই ঐরূপ মন্তব্য লেখা চলে।

অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অপরাপর শিক্ষকগণ কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার গুরুত্ব এবং উহা রক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন

বলিয়াও বিদ্যালয়ে ঐ ধরণের রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার অসুবিধা হইতেছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত এক্সটেনশন সার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট (Extension Service Department) ও বুরো অব এডুকেশনেল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ (Bureau of Educational & Psychological Research) শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্নস্থানে, আলোচনা সভায় মিলিত হইয়া কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। রেকর্ড কার্ড রক্ষা করার ব্যাপারে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে উপরোক্ত বুরোর সহিত আলোচনা করিতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ে কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত বাস্তবধর্মী আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড রক্ষা করা শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে কলমে কাজের (practical work) অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

Q. 1. What kind of record would you like to maintain of pupils of a class of which you are the class teacher? Give the main heads and some sub-heads under at least one main head to give a clear picture of your approach (B. T. 1958).

Ans. (পৃঃ ২৮০—২৮৭)

Q. 2. Write short notes on—(a) Cumulative Records (B. T. 1957).

Ans. (পৃঃ ২৮০—২৮৭)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন—স্বাধীনতা লাভের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ভারত অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন ব্যতীত দেশ যে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই স্থিরনিশ্চয়। তাই শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। এই পরিবর্তনগুলি এত যুগান্তকারী এবং তাহাদিগকে এত দ্রুত রূপায়িত করার চেষ্টা চলিতেছে যে অনেক সময় আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, আমরা ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছি কিনা! দীর্ঘদিনের সংস্কার আপনা হইতেই আমাদের মনে নূতন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইতেছে। পরিবর্তনগুলির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চলিতেছে। জাতি হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সম্পূর্ণরূপে এখনও মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ পরিবর্তনগুলির মাত্র সূচনা হইয়াছে। উহারা পূর্ণতালাভ করিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নব কলেবর দিতে হইলে প্রতিক্ষেত্রেই আরও অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং ঐ পরিবর্তন সুচিন্তিত আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে যে সব পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা অপরিহার্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক জগতে জাতির উন্নতি বা অবনতি প্রধানতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠু ও উন্নত হইলে জাতির অগ্রগতি অনিবার্য। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ভালমন্দ, ভ্রম-প্রমাদ অবিলম্বে ধরা পড়ে না। কোন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া বিচার করিতে হইলে অন্ততঃ পনের বিশ বৎসর অপেক্ষা করিতেই হইবে। অধিকন্তু দীর্ঘদিন পরে ভ্রম-প্রমাদ প্রত্যক্ষ হইলেও সংশোধন কঠিন হইয়া

দাঁড়ায়। খুব গভীরভাবে চিন্তা বা আলোচনা না করিয়া এবং ফলাফল সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্থিরনিশ্চয় না হইয়া শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাই, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে শিক্ষা সংস্কারের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা—ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতে তিন রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। টোলের মাধ্যমে সংস্কৃত, মক্তব ও মাদ্রাসার সাহায্যে আরবী ও ফারসী এবং পাঠশালায় মাতৃভাষায় মোটামুটি লিখন-পঠন ও ব্যবহারিক গণিতের জ্ঞান দেওয়া হইত। উপরোক্ত তিন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না—টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা এবং পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ ছিল। একের শিক্ষার বিষয়বস্তু অপর হইতে পৃথক ছিল। কোন শিক্ষাব্যবস্থাতেই ভারতের জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরাই টোলের শিক্ষার সুযোগ পাইতেন। অধিকাংশ মুসলমানই দুই এক বৎসর মক্তবে যাতায়াত করিতেন বটে কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই মক্তবের পাঠ শেষ করিয়া মাদ্রাসা পাঠ গ্রহণ করিত। পাঠশালার শিক্ষা অধিকতর সার্বজনীন ছিল বটে কিন্তু বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীরা এবং সমৃদ্ধ চাষীরাই জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে এই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিত। টোল এবং মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ খুবই অল্প ছিল। ব্রাহ্মণগণের যাজন কার্যে এবং মুসলমানদের মক্তবে মৌলবী হওয়া ব্যতীত সংস্কৃত, আরবী এবং ফারসী শিক্ষার দৈনন্দিন জীবনে আর কোন সার্থকতা ছিল না। অবশ্য যাঁহারা কবিরাজী বা হকিমিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের এই শিক্ষা কাজে লাগিত। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আধুনিক জগৎ যে উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল এবং তাহার ফলে যন্ত্র সভ্যতার যে প্রসার ঘটিতেছিল টোলের বা মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষায় তাহার কোন পরিচয়ই মিলিত না। ফলে, এই শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক জগতের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। তাই ইহার প্রসার দিনদিনই সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। পাঠশালার শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ইহা প্রাথমিক জ্ঞানদান ব্যতীত বেশী কিছু করিতে পারিত না। মোট কথা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে জনসাধারণের জীবনের চাহিদা মিটাইতে পারে, দেশকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিতে পারে এমন কোন শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে চালু ছিল না।

ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতে সাদরে বরণ—ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৩২ খ্রীঃ) মেকলে সাহেব (Macaulay) কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী উহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ইতিহাসকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। যে ইংরেজ শাসনকর্তাগণ ইহার প্রবর্তন করেন অল্পদিন মধ্যে তাঁহারাই এই শিক্ষার অপ্রার্থিত ফল দেখিয়া উহার প্রসার চেষ্টায় উদ্যমহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমাদেরই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে (কখনও কখনও ইংরেজ শাসন-কর্তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) আশাতিরিক্ত দ্রুতগতিতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটে। অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন সম্বন্ধই ছিল না। বিদেশী শাসনকর্তাগণ ইংরেজি জানা দেশীয় কর্মচারী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজ-রাজত্বের একদল ভারতীয় সমর্থক সৃষ্টি করাও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইত। আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাস, ভূগোল (পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয়) প্রভৃতি বিষয় সামান্য সামান্য শিক্ষা দেওয়া হইত। এক কথায় ইওরোপে যাহাকে 'লিবারেল এডুকেশন' (Liberal Education) বলে তাহাই আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের 'গ্রামার স্কুল'-এর ছাঁচে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিতেছিল।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য যাহাই থাক না কেন ভারতীয়গণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কৃষির অধোগতি এবং কুটির-শিল্পের ধ্বংসের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃত্তিহীন এবং দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইংরেজি শিখিয়া সরকারী চাকুরি এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কাজ তাহাদিগকে আর্থিক সংকট হইতে রক্ষা করে। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ এবং চেষ্টার ফলেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা ছিল এই যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই শিক্ষার সমান সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিত। ইংরেজি শিক্ষা যুক্তিবাদী এবং জীবন সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার অনুপযুক্ততা—অল্পদিন মধ্যেই কিন্তু প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার দোষ-ত্রুটি সকলের চোখেই ধরা পড়িতে লাগিল। প্রধানতঃ যে চাকুরি

পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাকে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। ইংরেজি শিক্ষিত বেকার যুবক অন্য কোন কাজ সংস্থান করিতে না পারিয়া ইংরেজি স্কুল খুলিল এবং ইংরেজি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত কোনকালেই এই শিক্ষার কোন যোগসূত্র ছিল না। অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রজগতের অগ্রগতির সহিত এই শিক্ষা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিল না। চাকুরি সংগ্রহ করিতে না পারিলে বাস্তব-জীবনে এই শিক্ষার আর কোন সার্থকতাই ছিল না। আবার জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকিলেও এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবণতার বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগ না থাকায় অনেকেই এই শিক্ষালাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইতে লাগিল—ফলে প্রতি পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন—এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার সংস্কারের কথা ভাবিতেছিলেন। এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সময়ে সময়ে আমাদের ইংরেজ শাসনকর্তাগণ নানা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। এই কাজে 'হাণ্টার কমিশন' (১৮৮২ খ্রীঃ), ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯০২ খ্রীঃ), কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন (১৯১৭ খ্রীঃ), হার্টগ কমিটি (১৯২৯ খ্রীঃ)এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি কমিশন নিজ নিজ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া সংস্কারের জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন কমিশনের সুপারিশই আংশিকভাবে ব্যতীত সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হয় নাই। শিক্ষা-সংস্কারের কাজ এত জটিল, এত অর্থ ও পরিশ্রমসাধ্য এবং ইহা সমাজ সংস্কার ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত এমনভাবে জড়িত যে বিশেষ করিয়া বিদেশী সরকার এই কাজে অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সকলেই বুঝিল যে, শিক্ষা সংস্কার ব্যতীত আমাদের জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়—আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চেষ্টা, পাঁচশালা পরিকল্পনা, নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উদ্যম সবকিছুই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে ব্যর্থ হইবে। তাই স্বাধীনতালাভের পরই ভারত সরকার ইউনিভারসিটি এডুকেশন কমিশন (১৯৪৮ খ্রীঃ) ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন

(১৯৫৩ খ্রীঃ) নিয়োগ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা যথাক্রমে ঐ কমিশনগুলির সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনকে সংস্কারের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল।

শিক্ষাব্যবস্থায় ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড—আমরা যখন নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে বদ্ধপরিকর, তখন শিক্ষাব্যবস্থার ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা আমাদের শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টাকে ঠিক পথে চালিত করিতে সাহায্য করিবে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক স্তরে ইহা হইবে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। বর্তমান সভ্যতার কিছুটা জ্ঞানলাভ না করিলে কেহই সমাজে নিজের প্রকৃত স্থান করিয়া লইতে পারে না বা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হইতে পারে না। কাজেই ব্যক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই হউক আর দেশের উন্নতির জন্যই হউক অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক শিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহা ভবিষ্যৎ শিক্ষার বা সমাজ জীবনের বুনিয়াদ গঠন করিতে পারে। এই বুনিয়াদ আবার ধনী-দরিদ্র সকলের পক্ষে সমান হওয়া উচিত। তাহা না হইলে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার উপরই জীবনের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-অর্থ-প্রবণতা-নির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ না পাইলে কিছুতেই গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা উপরোক্ত নীতি কতখানি কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে ইহা তাহার ভাল-মন্দ বিচারের দ্বিতীয় মানদণ্ড।

তৃতীয়তঃ শিক্ষার একস্তরের সহিত অপর স্তরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার কোন স্তরই অন্ধগলি হইবে না—এক স্তর হইতে উন্নততর স্তরে উন্নীত হইবার স্বাভাবিক সুযোগ থাকিবে। প্রাথমিক স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবেশ করিবার স্বাভাবিক সুযোগ ছাত্রদের থাকিবে, তা তাহারা যে বিষয়েই পড়াশুনা করুক না কেন। ঐরূপ না হইলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে—উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা প্রত্যেককে পূর্ণ

বিকাশের সুযোগ দিতে না পারিলে সে শিক্ষা ব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আবার, প্রতিদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে কতকগুলি মূল উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের ভিতর দিয়াই উহাদিগকে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। তাই শিক্ষার এক স্তরের সঙ্গে অপর স্তরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

একদিকে শিক্ষার এক স্তরের সঙ্গে অপর স্তরের যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিবে অপর দিকে আবার তেমনি শিক্ষার প্রত্যেক স্তর স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবে। শিক্ষার একস্তর শেষ করিয়া ছাত্র যদি অপর স্তরে প্রবেশ নাও করে তবুও যেন তার শিক্ষা ব্যর্থ না হয়। সে সরাসরি সংসারে প্রবেশ করিলেও লব্ধ শিক্ষা যেন তাহার কাজে লাগে। তাই প্রতিস্তরের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সহিত জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। স্তর-নির্বিশেষে শিক্ষার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আত্মোন্নতিকারক হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রতি স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ভালমন্দের বিচার তাহার নিজের পরিধির মধ্যে করিতে হইবে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার ভালমন্দের বিচার করিতে হইলে উহারা ছাত্রদের সমাজ জীবনের জন্য কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে তাহা যে বিবেচনা করা প্রয়োজন এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। বিদ্যালয় সমাজ দ্বারাই পরিচালিত এবং সমাজকে উন্নততর করিয়া তাহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও যে শিক্ষা তাহাকে সমাজের মধ্যে সার্থক জীবন যাপনে সাহায্য করিবে না, তাহা তাহার নিকট অনেকখানিই অর্থহীন। ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই তাহা সার্থক হয়।

শিক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রকে সমাজে জীবন যাপনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে অপরদিকে উহা তেমনি তাহাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিবে। সমাজে সার্থক জীবন যাপনের প্রস্তুতি এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের অনুকূল অভিজ্ঞতা লাভ, শিক্ষাব্যবস্থায় একে অপরের পরিপূরক। সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় আবার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশপ্রাপ্ত মানুষই সমাজে সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি অভিজ্ঞতা ছাত্রের (বর্তমান) জীবনের প্রয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তবে

উহা ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাহায্য করে। ছাত্রের (বর্তমান) জীবনের চাহিদার (needs) ভিত্তিতেই বিদ্যালয়ের কর্মসূচী ঠিক করা উচিত।

'শিক্ষা' অর্থই যখন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্রদের ব্যবহার পরিবর্তনের বিধিমত চেষ্টা করা, (Education is the systematic attempt at modification of behaviour with an end in view) তখন শিক্ষা ব্যবস্থার বিচারে তাহার মূল উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিই বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে নিজের সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়। জাতীয় জীবন-দর্শনের সহিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। উহা একদিকে জাতীয় জীবন-দর্শনের পরিপোষণ করিবে, অপর দিকে আবার তাহাকে উন্নততর করিতেও চেষ্টা করিবে।

শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হইবে জাতির প্রত্যেক সভ্যের আপন আপন আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভে সাহায্য করা এবং দেশের সমৃদ্ধি, জাতির জীবন-দর্শন, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উন্নততর স্তরে লইয়া যাওয়া। শিক্ষার স্তরে স্তরে উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকিলেও প্রতিস্তরের শিক্ষাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপোষক হওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা পদ্ধতির উপর শিক্ষার ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা না পাইলে একক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জ্ঞানের সংক্রমণ (Transfer of Learning) হয় না। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ জ্ঞানের প্রয়োগ হয় না, ব্যক্তিত্বের বিকাশেও উহা সাহায্য করে না। এইরূপ জ্ঞান সংগ্রহকে অপচয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না উহা আধুনিক জগতে অচল।

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার—উপরে আলোচিত মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে আমাদের কোন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সন্তোষজনক মনে হয় না। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে পারি নাই। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরূপে কাজ করিতে হইলে যে নিম্নতম শিক্ষার প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থাও আমরা আজ পর্যন্ত সকলের জন্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। অধিকন্তু প্রাথমিক স্তরে আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছি তাহা

স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। একশত বৎসর পূর্বে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে হয়ত ঐ শিক্ষা জীবনে সরাসরি কাজে লাগিত; কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজের সহিত পাঠশালার শিক্ষার সম্বন্ধ খুবই সামান্য। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ চালাইতে না পারিলে ছাত্রের কাছে গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন সার্থকতাই থাকে না। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ভিন্ন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রাথমিক শিক্ষার কাল বর্ধিত করিতে না পারিলে এই ত্রুটীর সংশোধন হইবে না।

গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাকে সংস্কারের উদ্দেশ্যেই মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হইয়াছিল যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সরাসরিভাবে জীবনে কাজে লাগে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষভাবে গ্রাম্যজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত। শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে ইহার সার্থকতা ততটা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কুটির-শিল্প বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু শিল্প-প্রধান নাগরিক জীবনে তাহা বেমানান। আবার যে জীবন-দর্শন বা সমাজ কল্পনার ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পিত, নাগরিক জীবনদর্শন তার অনেকখানি বিপরীত। যেমন প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে বাস করার উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে যেখানে একই বাড়ীর বাসিন্দা একে অন্যকে হয়তো চেনেনও না, সেখানে ঐরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাসের কথা একেবারেই অবান্তর। নাগরিক জীবনে এই ধরণের সহযোগিতার কথা উঠিতে পারে ক্লাবে বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে। মোট কথা বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুটা পরিবর্তন না হইলে ইহাকে নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তারপর, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে, অপরদিকে উহা তেমন ছাত্রদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে। বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এরূপ ধারণা যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজের উপর জোর দেওয়ার জন্য জ্ঞানের দিক অবহেলিত হয়। ফলে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাশেষে, ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত হয় না। হইতে পারে ইহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রুটি—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিতভাবে পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর

দেওয়ার জন্য ঐরূপ হয়। তবু যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কার না হইতেছে, বাস্তব ক্ষেত্রে ততদিন অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। সব চাইতে আপত্তিকর কথা হইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী এবং অবুনিয়াদী দুইরকম বিদ্যালয়ই বর্তমানে কাজ করিতেছে। সাধারণতঃ গ্রামে দরিদ্রের ছেলেমেয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইতেছে এবং সহরে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের ছেলেমেয়ে অবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। যাহারা মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবে না, বুনিয়াদী শিক্ষা তাহাদেরই জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত বলিয়া লোকের ধারণা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে অসুবিধা হইতেছে। কিছু সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং কয়েকটি গ্রামীণ (Rural) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মিটাইবার জন্য উহারা যথেষ্ট নহে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগ পাইতেছে না। গণতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরণের বিদ্যালয় থাকিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা সকলে একই ধরণের বিদ্যালয়ে একইভাবে গ্রহণ করিবে ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ধরণের বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া, সকল বিদ্যালয়কে মোটামুটি একই আদর্শ, একই শিক্ষনীয় বস্তু এবং একই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। অবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি পুস্তক-কেন্দ্রিক এবং সমাজের সহিত সম্বন্ধহীন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়, শিক্ষার আদর্শ, বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক হইতে অবুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে শ্রেষ্ঠ। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সকল বিদ্যালয়ই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, সরকারও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজন মিটাইতে হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নাই। মহাত্মাজী পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা হইতে দেশ অনেকদূর সরিয়া আসিয়াছে এবং পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হইলে ঐ দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে নূতন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদি শিক্ষা সংস্কারের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কারের কথা পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে বুনিয়াদী শিক্ষা আপনা হইতেই কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু

বা আগ্রহের বিভিন্নতার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী নির্বাচনের কোন সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় খুবই বেশী হইত।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। জ্ঞান আহরণের উপাদানগুলিকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া প্রধানতঃ মুখস্থ করাকেই বিদ্যা আয়ত্ত করার একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন চিন্তাশক্তি জাগরিত করণ, বিদ্যালাভের অনুকূল অভ্যাসগঠন, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহকে বিকশিত করণ এবং প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলী ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের চেষ্টা না করিয়া অর্থহীনভাবে একই জিনিষ বারবার পড়াইয়া ছাত্রদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানের সংক্রমণ একেবারেই হয় না। ছাত্রেরা যাহা শিক্ষা করে, "পরীক্ষা" পাশ করা ব্যতীত জীবনের আর কোন প্রয়োজনে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের কোন স্বাভাবিক আনন্দ নাই। শাস্তির ভয়, পুরস্কারের প্রলোভন বা প্রতিযোগিতার মাদকতা তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট করা হয়। তারপর, স্কুলের কাজ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই এমন যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা উভয়ের পক্ষেই অপ্রীতিকর। ছাত্রের নিকট শিক্ষক শাস্তির প্রতীক বা পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট পুরস্কারদাতা; শিক্ষকের নিকট ছাত্র পাঠবিমুখ ফাঁকিবাজ। এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে কোন শিক্ষাকার্য চলিতে পারে না। সর্বশেষে প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশ করানোই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকাও যেন তেন প্রকারেণ মুখস্থ করাইয়া ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ করানোর জন্য বিদ্যালয়ের যত চেষ্টা। এ অবস্থায় শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যে কোন স্বাধীনতা নাই। আর্থিক অভাবেও শিক্ষকগণ জর্জরিত। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব নহে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারে অগ্রসর হইতে হইলে ঐ স্তরের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথমেই আলোচনা করা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিশদভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রদিগকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলী শিক্ষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাথমিক স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ হইবে, তাহাদের পক্ষে সমাজের নেতৃত্ব করা সহজ নয়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত যাহারা পৌছিবে তাহাদের সংখ্যাও খুব বেশী হইবে না। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা কর্মজীবনে প্রবেশ করিবে তাহারাই হইবে সমাজের মেরুদণ্ড—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির দায়িত্ব তাহাদেরই বিশেষভাবে বহন করিতে হইবে। ফলে শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে দেশের নেতৃত্বের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা বর্তমানে আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা। আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির সফলতা উপযুক্ত লোকের অভাবে ব্যাহত হইতেছে। দেশের অর্থনীতির সহিত এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধই ছিল না। নূতন ভারতে প্রত্যেক ছাত্রই যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে আপন অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার ক্ষমতা ও আগ্রহের (Interest) অনুকূল বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা। চতুর্থতঃ, ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ না হইলে তাহাকে শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি জাগাইয়া তোলার বিষয়ই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে দেশের সংস্কৃতি (নৃত্য, গীত, কারুশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি) অন্তর দিয়া উপলব্ধি করার যোগ্যতা ছাত্রদের জন্মান প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়া মানুষকে যেন অমানুষ করিয়া তোলা না হয় সেদিকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। উপরোক্ত চারিটি উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের চেষ্টা আলোচনা করিতে পারি।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রথম পরামর্শই হইল এই স্তরের শিক্ষাকালকে একবৎসর বৃদ্ধি করা। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে প্রয়োজনবোধে কিছুটা শিক্ষানবিশি করিয়া বা কোন বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্র জীবনে প্রবেশ করিবে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্র সমাজের উচ্চ বৃত্তিগুলির প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। বর্তমান স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয় ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর হইতে। একটু উন্নত ধরনের শিক্ষানবিশিতে বা বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে হইলেই ইণ্টারমিডিয়েট পাশের প্রয়োজন হয়। তাই প্রকৃত পক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ছাত্রদের বয়সের বা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলেও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। ১৪, ১৫ বা ১৬ বৎসর বয়সে (যে বয়সে সাধারণতঃ ছেলেরা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয়) ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করার মত মানসিক বিকাশ হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং নিয়মকানুন (discipline) ও তাহাদের মানসিক বিকাশের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উপযুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। তাই সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট অবধি শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ মোটেই নূতন নহে; ১৯১৭ সালে কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৮ সালের রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন পর্যন্ত যে কোন কমিশন বা রিপোর্ট এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছে, উহাই ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুইস্তরে ভাগ করিয়াছেন—(ক) ১২ বৎসর বয়স (ষষ্ঠশ্রেণী) হইতে ১৪ বৎসর (অষ্টম শ্রেণী) বয়স পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং (খ) ১৫ বৎসর বয়স (নবম শ্রেণী) হইতে ১৭ বৎসর (একাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে একথা কমিশন বিস্মৃত হয় নাই। তাই তাহাদের মতে ১২ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী পদ্ধতিতেও শিক্ষা

চলিতে পারে এবং ঐ শিক্ষাস্তরকে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে দুই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে নামের পার্থক্য থাকিলেও শিক্ষার কোন পার্থক্য থাকিবার কথা নহে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও অবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ বা শিক্ষা-পদ্ধতির খুব গুরুতর পার্থক্য বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আশা করা যাইতেছে যে, একদিন উন্নততর দেশগুলির মত ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সকলের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক হইবে এবং ঐ বয়স পর্যন্ত সকলে এক ধরণের শিক্ষা পাইবে। তাহা হইলে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না।

নিম্নে প্রদত্ত নক্সার সাহায্যে পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেকেণ্ডারি এডুকেশন কমিশনের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

পুরাতন এবং নূতন শিক্ষাব্যবস্থা

পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা

২ বৎসর	তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষ প্রথম ডিগ্রি
২ বৎসর	প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষ ইণ্টারমিডিয়েট
২ বৎসর	নবম এবং দশম শ্রেণী মাধ্যমিক
৩ বৎসর	ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী
৫ বৎসর	প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষা

নব পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা

৩ বৎসর	প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ প্রথম ডিগ্রি
৩ বৎসর	নবম হইতে একাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
৩ বৎসর	ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী
৫ বৎসর	প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা সম্ভব নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থানাভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার আনুষঙ্গিক

সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি প্রভৃতি অসুবিধা অনেক স্কুলের পক্ষেই অল্পদিনের মধ্যে দূর করা সম্ভব নহে। তাই প্রথম প্রথম কিছুদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১০ বৎসর) ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১১ বৎসর) এক সঙ্গেই চলিবে। তারপর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে যেগুলি যোগ্যতর তাহারা ধীরে ধীরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিবর্তিত হইবে এবং যেগুলি উন্নতি করিতে পারিবে না সেগুলি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে কাজ করিবে। ঐসব বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা ও অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী ছাত্রেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৃত্তিবিষয়ক স্কুল বা কোন ধরণের শিক্ষানবিশির কাজে ঢুকিবে। যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল একসঙ্গে চলিবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য এক বৎসরের প্রি-ইউনিভারসিটি বা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশ খুলিবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা পাশ করিয়া সরাসরি তিন বৎসরের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাসে প্রবেশ করিবে আর মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রগণ একবৎসর প্রি-ইউনিভারসিটি ক্লাসের পড়া শেষ করিয়া তবে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হইতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে আমাদের যেসব বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে (ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি) সে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য এক বৎসরের প্রিপেরেটরি ক্লাস খোলা হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর বা প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্র প্রিপেরেটরি ক্লাসে ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে শিক্ষার পরিবর্তে (ইন্টার-মিডিয়েট) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিপেরেটরি ক্লাসে ঐ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতির মূল্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

বহুমুখী বিদ্যালয়—পূর্বে আলোচিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে শুধু একবৎসর বর্ধিত করিয়া দিলেই চলিবে না। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যতালিকাকেও আবার নূতন করিয়া সাজাইতে হইবে। এই কাজে সর্বপ্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্যও কিছুটা প্রস্তুত হইতে হইবে। তারপর ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের পার্থক্য থাকার জন্য সকলেই এক বিষয়ে—পড়াশুনা করিবে এরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্ষমতা ও আগ্রহের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এতদিন ছিল না। ইহার ফলে অনেকেরই সহজাত ক্ষমতা

চাপা পড়িয়া থাকিত এবং নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের প্রতিকূলে পড়াশুনার চেষ্টা করিয়া অনেককেই বিফল মনোরথ হইতে হইত। অপরদিকে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে ইতিপূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার দরুণ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির রূপায়নে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিতেছে; দেশের শিল্পোন্নতির জন্য আমাদের হয়ত বড় ইঞ্জিনিয়ারের বা সাধারণ শ্রমিকের অভাব নাই, কিন্তু মধ্যস্তরের কারিগরের একান্ত অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বহুমুখী করিতে না পারিলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাত রকমের বিশেষ বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বাছিয়া লইবার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হইয়াছে। এই সাত রকমের বিশেষ বিষয় হইল—১। সাহিত্য, ২। বিজ্ঞান, ৩। কারিগরি, ৪। ব্যবসায়-বাণিজ্য, ৫। কৃষি, ৬। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, ৭। চারুকলা। বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি উপরোক্ত সাতটির মধ্যে যে কোন দুই বা ততোধিক বিষয় তাহার পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত করিয়া লইবে। সাধারণতঃ এক একটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে ২।৩টি বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ থাকে। এমন বহুমুখী বিদ্যালয়ও আছে যাহাতে ৪টি পর্যন্ত বিশেষ বিষয় পাঠের ব্যবস্থা আছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা—পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে ভারত বিশেষ করিয়া শিল্পবিস্তারের উপর জোর দিতেছে। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেশকে শিল্পপ্রধান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই কাজে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইতেছে যন্ত্রবিষয়ক কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব। এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতে-কলমে কাজের উপর একেবারেই জোর না দেওয়ার জন্যই আমাদিগকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন তাই এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়াছেন।

১। যে সব ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না—যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণর অনুপযুক্ত বা যাহাদের তাড়াতাড়ি অর্থোপার্জন আরম্ভ করা প্রয়োজন তাহাদের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক

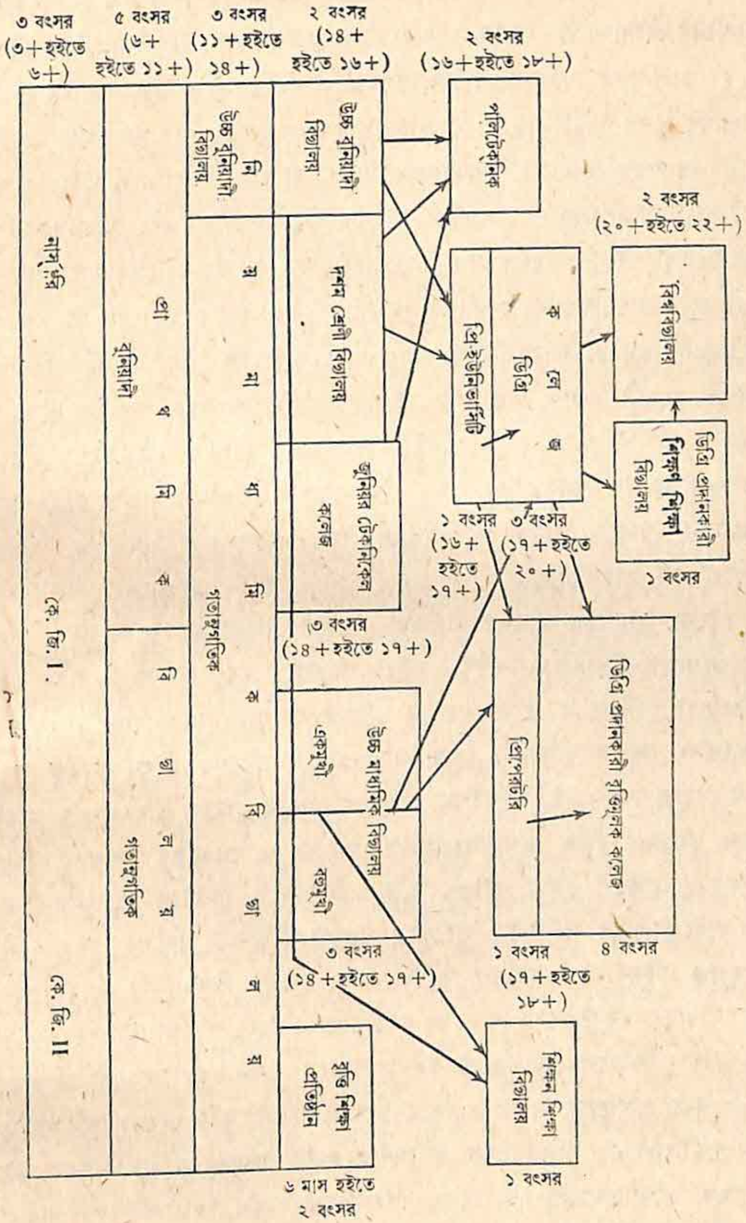
স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পরই জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে বা শিক্ষানবিশির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর (উচ্চ মাধ্যমিক নহে) যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না তাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা—গত দুইটি পাঁচশালা পরিকল্পনার ভিতর দিয়া আমরা সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছি। ফলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যে রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা নক্সার সাহায্যে বোঝাইবার চেষ্টা করা হইল।

নবপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা—আমাদের দেশের অনেকেই নবপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছেন। বাংলাদেশে ইহার সমালোচনা হয়ত অন্যান্য ষ্টেটের চেয়ে তীব্রতর হইয়াছে। প্রথমেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত এক বৎসরের শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত যোগ করিয়া দিলে শিক্ষার মান আরও নামিয়া যাইবে বলিয়া অনেকের আশঙ্কা। কিন্তু বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির দুর্দশা ব্যতীত এই আশঙ্কার আর কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। বরং বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন এবং শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রের এই বয়সে মানসিক বিকাশের অধিকতর অনুকূল বলিয়া এবং একসঙ্গে একই বিষয় একটানা ৩ বৎসর পড়িবার সুযোগ পাইবে বলিয়া শিক্ষার মান উন্নততর হইবে আশা করা যাইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বর্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিতে হইলেও উহাদিগকে একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরিণত করা প্রয়োজন। বর্তমান দশম শ্রেণী বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে সমাপ্ত করে না। মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি হয় কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণী দুইটির পাঠ শেষের পর; তাই সমাজের নিকট হইতে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতীত ঐরূপ বিদ্যালয়ের পাঠের আর কোন পার্থক্য নাই। নূতন পরিকল্পনার মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি কলেজে না হইয়া বিদ্যালয়ে হইবে ফলে উহাদের সামাজিক গুরুত্ব বাড়িবে এবং সমাজ উহাদের জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইবে।


৩ বৎসর (৩+ হইতে ৬+)
৫ বৎসর (৬+ হইতে ১১+)
৩ বৎসর (১১+ হইতে ১৪+)
২ বৎসর (১৪+ হইতে ১৬+)
২ বৎসর (১৬+ হইতে ১৮+)
নার্সারি
কে. জি. I.
কে. জি. II
প্রাথমিক বিদ্যালয়
বুনিয়াদী
গতানুগতিক
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গতানুগতিক
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দশম শ্রেণী বিদ্যালয়
জুনিয়র টেকনিক্যাল কলেজ
৩ বৎসর (১৪+ হইতে ১৭+)
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
একমুখী
বহুমুখী
৩ বৎসর (১৪+ হইতে ১৭+)
বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৬ মাস হইতে ২ বৎসর
পলিটেকনিক
কলেজ
প্রি-ইউনিভার্সিটি
ডিগ্রি
১ বৎসর (১৬+ হইতে ১৭+)
৩ বৎসর (১৭+ হইতে ২০+)
২ বৎসর (২০+ হইতে ২২+)
বিশ্ববিদ্যালয়
ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়
১ বৎসর
ডিগ্রি প্রদানকারী বৃত্তিমূলক কলেজ
১ বৎসর
৪ বৎসর
(১৭+ হইতে ১৮+)
শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়
১ বৎসর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, শিক্ষকের বেতনের হার, তাঁহাদের যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা বর্তমান কলেজ হইতে ন্যূন হইলে চলিবে না। ফলে নূতন পরিকল্পনায় শিক্ষার মান না কমিয়া বরং নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উভয় স্তরেই বৃদ্ধি পাইবার কথা। বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির যে অবস্থা তাহাতে উহাদিগকে উন্নতর করিতে না পারিলে উহাদের পক্ষে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও নিম্ন-মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব নহে। আবার সমাজের কাছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজের গুরুত্ব যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হইলে ইহাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা উদ্যম কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিকে বহুমুখী করার প্রচেষ্টাও বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমত, এত অল্প বয়সে (১৪ বৎসর) ছাত্রদিগকে বিশেষ পাঠাভিমুখী করা বা বিশেষ বৃত্তির জন্য শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশ দীর্ঘ দিন "সাধারণ শিক্ষায়" অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। ১৬।১৭ বয়সে ছেলেমেয়ে উপার্জনক্ষম না হইলে আমাদের দেশের শতকরা নব্বইটি পরিবারের চলে না। অথচ আজকালকার বৃত্তিগুলি এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা না করিলে কোন বৃত্তিরই উপযুক্ত হওয়া যায় না। সমগ্র শিক্ষাকাল আরও বাড়াইয়া দিতে না পারিলে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ করার সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর, বিদ্যালয় সচেষ্ট হইলে ১৪ বৎসর বয়সের ভিতর ছাত্রদের নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের অন্ততঃ কিছুটা বিকাশ না হওয়ায় কোন কারণ নাই (বিদ্যালয়ে কিভাবে উহাদের বিকাশ করা যাইতে পারে দ্রষ্টব্য)। সর্বশেষে বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয় পাঠকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। বিশেষ বিষয়গুলির পাঠ্যতালিকা এত "সাধারণ" যে উহাদের যে কোন একটি বিশেষভাবে পড়িলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ পাঠ এবং বৃত্তি একেবারে নির্দিষ্ট হইয়া পড়িবে এমন নয়। বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠ, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট (specific) বিষয় পাঠ বা বৃত্তি গ্রহণের ভূমিকামাত্র। বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা এক বিশেষ পাঠাভিমুখী হইলে ইহা তাহাদের বর্তমান শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি উভয়েরই সহায়ক হইবে। (পরে এবিষয়ে আলোচনা

দ্রষ্টব্য)। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী করিতে গেলে উপযুক্ত পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রভৃতি বিষয়ে যেসব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাদের সমালোচনাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যতম গুরুতর সমালোচনা এই যে, দেশের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। কালক্রমে অনেক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক হইতে নিম্ন-মাধ্যমিকে পরিণত হইতে হইবে ফলে দেশবাসীর শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হইবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্ন-মাধ্যমিকে পরিণত হইলে তাহাকে শিক্ষার সংকোচন বলা যাইতে পারে না ; যদি ইহার পরিবর্তে ঐ দুই বৎসরের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক জুনিয়ার পলিটেকনিক বা ঐ স্তরের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে (অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঐ ধরণের বিদ্যালয়েও পরিণত হইতে পারে)। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের যে সব ছাত্র ক্ষমতা এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত শুধু তাহারাই ঐ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। তাহারা যে ধরণের বিদ্যালয়েই পড়ুক না কেন উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে এবং অন্যান্য ছাত্রেরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও অর্জিত জ্ঞান ও আগ্রহের ভিত্তিতে কোন বৃত্তি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বৃত্তির শিক্ষানবিশিতে প্রবেশ করিবে। নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক ভিত্তিতে একই শিক্ষা স্তরের বিভিন্ন অংশ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে মাধ্যমিক স্তরের কোন ছাত্রেরই শিক্ষার সুযোগ কমিবে না এবং প্রত্যেক ছাত্র নিজের যোগ্যতা হিসাবে পাঠের ক্ষেত্র পাইয়া অধিকতর সফলতা লাভ করিবে। যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হইতে হইবে তাহাদের শিক্ষকদেরও কোনরূপ ক্ষতি হওয়া উচিত নহে। কোন স্তরের শিক্ষাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ; বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কম-বেশী হওয়া উচিত নয়। শিক্ষকের বেতন হইবে তাঁহার নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন্ স্তরে তিনি শিক্ষা দিতেছেন সেই ভিত্তিতে নহে। কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইলে তাহার শিক্ষকদের বেতন হ্রাস করিবার কোন কারণই নাই।

নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার সমালোচনাকালে একথা মনে রাখিতে হইবে যে,

আমাদের দেশে যতগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই নূতন পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে (কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন, হারটগ কমিটি, সাপ্রু কমিটি, উড-এব্‌বট রিপোর্ট, সার্জেণ্ট রিপোর্ট, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইউনিভারসিটি কমিশন)। এক কথায় বিশেষজ্ঞ মত নূতন পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে প্রথম প্রথম যে গুরুতর বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু আর আমাদের অপেক্ষা করিবার বা ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। কারণ যাহাই হউক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে দ্রুত অধোগতি হইতেছে এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। শিক্ষার ক্ষেত্রে উর্ধ্বগতি বা অধোগতি একদিনে ধরা পড়ে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গলদ সঞ্চিত হইতে হইতে আজ তাহার পরিণতি সকলের কাছেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে ঐ সব গলদ দূর করিয়া অন্ততঃ অবনতি রোধ করিতে না পারিলে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে দেশকে যে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতি চক্রবৃদ্ধি স্থদের মতই দ্রুত চলে—অবাঞ্ছিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান এবং শিক্ষকের ছাত্র যে আরও অনেকগুণ অবাঞ্ছিত শিক্ষা পরিস্থিতির ভিতর দিয়া বড় হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবে পুরুষানুক্রমে শিক্ষার অধোগতি দ্রুততর হইতেছে। তাই কাজ যতই কঠিন হউক দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমাদের শিক্ষাসংস্কারে অগ্রসর হইতেই হইবে।

তারপর, দেশের শিল্পোন্নতি এবং শিক্ষাসংস্কার যে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত এ সত্য আমরা গত দুই পাঁচসালা পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছি। আর কিছুর জন্য না হইলেও দেশের শিল্পোন্নতির জন্যও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের আর বিলম্ব করা চলে না। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে বাস্তবক্ষেত্রে বাধা যত বেশীই আস্থক না কেন দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইলে কোন বাধাই আমাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা।

শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ

(Educational & Vocational Guidance)

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ।—মাধ্যমিক শিক্ষার গঠন ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করিলেই যে শিক্ষার রূপ পরিবর্তিত হইবে এমন আশা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ না করিলে এবং শিক্ষাসংস্কারের ফলে যে সব নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের সমাধানের চেষ্টা না করিলে আমাদের শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মত এই যে, আমরা কি শিখিলাম ইহা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কি ভাবে শিখিলাম ইহাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যে জ্ঞান অর্জন করিলাম, জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে না পারিলে উহা ব্যর্থ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগকে শিক্ষা-বিজ্ঞানে 'শিক্ষায় সংক্রমণ' (Transfer in Learning) আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি, শিক্ষায় সংক্রমণের অভাব। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় অধিকতর কষ্ট বরণ করি এবং হয়ত অধিকতর পরিশ্রমও করি। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্র এবং আমাদের দেশের ছাত্রের মধ্যে যে খুব বেশী পার্থক্য থাকে এমন মনে হয় না। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান যথোচিত সংক্রমিত হয় না বলিয়া, কার্যকরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ছাত্রেরা পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইলেই জ্ঞানের সর্বোচ্চ সংক্রমণ সম্ভব হয়। "মুখস্থ করা" জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি হইলে ঐরূপ পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞানের প্রায় কোন সংক্রমণই হয় না। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের বিদ্যালয়ে জ্ঞানদানের চেষ্টা হয় বলিয়াই আমরা উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কাজেই শিক্ষাদান-পদ্ধতির সংস্কার আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়-বস্তুর যুগান্তকারী পরিবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতিরও যদি সংস্কার না হয় তবে শিক্ষার মান উন্নততর না হইয়া অবনততর হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইতেছে তাহাদের প্রধান কারণ আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কম। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা-

দান কার্য চলিলে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যে খুব জটিল হইয়া পড়িয়াছে ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার শুধু ক্লাসের ভিতরেই শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক করার কথা ভাবিলে চলিবে না। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিতে হইবে এবং প্রতিটি কার্যের বৈজ্ঞানিক সমর্থনের কথা ভাবিতে হইবে। আমরা চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করিয়া এমন অনেক কাজ করিতেছি যেগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপোষক বলিয়া মনে না হইয়া ক্ষতিকর বলিয়াই মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া পুরস্কার বিতরণ উৎসব করিয়া প্রতি শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুই-তিনটি ছেলে বা মেয়েকে পুরস্কার দিয়া আসিতেছি—উদ্দেশ্য ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহ দেওয়া। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি শ্রেণীতে প্রথম দিকের কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিন্ন ঐ ধরণের পুরস্কার বিতরণ অন্যান্য ছেলেমেয়ের মনে পড়াশুনায় প্রেরণা যোগাইবে এই আশা করা বাতুলতা মাত্র। অপরদিকে ঐরূপ পুরস্কার বিতরণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে যে, বাধ্যতামূলক বাড়ীর কাজকে (Home Task) আমরা শিক্ষাদান চেষ্টার একরূপ অঙ্গ করিয়া লইয়াছি। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ বাড়ীর কাজ করানোর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের কোন উন্নতিই হয় না। আধুনিকতম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ওয়াকিবহাল নই বলিয়া আমরা শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সমস্যার সম্মুখে নিজেদের অনেক সময় একেবারে অসহায় মনে করি। প্রাণান্ত করিয়া ছেলেদের 'ক্লাসে পড়াইতেছি', সাধ্যমত তাহাদিগকে পাঠে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছি—কত বক্তৃতা, কত উপদেশ দিতেছি, কতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায়ের চেষ্টা করিতেছি, নানা রকমের শাস্তি দিতেছি, নানারূপ পুরস্কারের লোভ দেখাইতেছি—তবু ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেছে না। যাহা বলিতেছি তাহা করিতেছে না, বরং নানারূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার তাহাদের মধ্যে দেখা দিতেছে। ইহার পর আর কি করিতে পারি! গত ২০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ জ্ঞান এখনও আমরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে প্রয়োগ

করিতে শিখি নাই। তাই শিক্ষাদান সমস্যার সম্মুখে আমরা এত অসহায়। অপরদিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় চরিত্রগঠন, আগ্রহ ও ক্ষমতার বিকাশ প্রভৃতি অনেক নূতন দায়িত্ব বিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইতেছে।

তাই শিক্ষাদানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনে, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবেশনে, শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান বাহির করণে এবং শিক্ষকের আধুনিকতম 'যন্ত্রপাতি' (যথা, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা) প্রস্তুত-করণের উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'ব্যুরো অব্ এডুকেশন এ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ' ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুসারে পাঠের বিষয়বস্তু বাছিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বড় বাস্তব সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুদালিয়ার কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ পাইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা সরকারকে করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ বলিতে কি বুঝায়—শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ এই দুইটি বাক্যাংশকে আমরা প্রথম পৃথক পৃথক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে ছাত্রের শিক্ষাজীবনে যখন যখন বিশেষ পাঠ্য নির্বাচনের সমস্যা আসে তখন তাহাকে মনস্থির করিতে সাহায্য করাকে শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ বলা যাইতে পারে অর্থাৎ বহুমুখী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উঠিলে ছাত্রকে বিশেষ বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করা, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িলে বা ট্রেণিং লইলে ভাল হয় সে সম্বন্ধে তাহাকে পরামর্শ দেওয়াকে শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া বলে। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শকে এইরূপ ভাবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ছাত্রের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

একাজ আরম্ভ করিতে হয়। ধরা যাক, নবম শ্রেণীতে উঠার পর দেখা গেল বেশীর ভাগ ছাত্রের সব বিষয়েই জ্ঞান এত কম জন্মিয়াছে যে, তাহাদের কোন বিশেষ বিষয় পড়িবার যোগ্যতা নাই। শুধু তাহাই নহে, উপযুক্ত সুযোগের অভাবে কোন দিকে তাহাদের আগ্রহ ও ক্ষমতার বিকাশও ঘটে নাই। এ অবস্থায় কোন বিশেষ বিষয় নির্বাচনের পরামর্শই তাহাদিগকে দেওয়া চলে না। তাই সমগ্র শিক্ষাদানের কাজকে উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে সংকীর্ণ অর্থেও শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া সফল হইতে পারে না।

উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজকেই শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া বলা যাইতে পারে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে আমরা শিক্ষকরা ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারি বলিয়া মনে করি না। ছাত্র একমাত্র তার নিজের চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে; আমরা এই কাজে তাহাকে পরামর্শ দিয়া, উপযুক্ত সুযোগের সৃষ্টি করিয়া নানাভাবে সাহায্য করিতে পারি। শিক্ষা-লাভের ব্যাপারে আমরা ছাত্রকে সাহায্য করিবার যত প্রকারের চেষ্টা করি তাহাদের প্রত্যেকটিকেই শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ বলা যাইতে পারে। কাজেই শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার কাজ, ছাত্র স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, সহজাত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ছাত্র যেন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে পিছাইয়া না পড়ে। যদি কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ হিসাবে শিক্ষার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাই নানা ধরণের কাজকর্মের মাধ্যমে ছাত্রদের সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার অন্তর্গত। এক কথায় বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। নবম শ্রেণীতে উঠিলে বিশেষ বিষয় (Special Subject) নির্বাচনের পরামর্শের সহিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাদান চেষ্টার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্কুল ফাইন্যালের পর শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শদানের সহিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাদান প্রচেষ্টা একইভাবে জড়িত। কাজেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ বলিতে আমরা বুঝি—প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা আপন ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ লাভ করিয়া সমাজে সার্থক ও তৃপ্তিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতিতে সাহায্য

করা। তাহা হইলে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাদান-বিষয়ক পরামর্শের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকে না।

বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শদানের অর্থ হইতেছে যে, কে কোন্ ধরণের বৃত্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং কোন্ ধরণের বৃত্তিতে সর্বাপেক্ষা তৃপ্তি পাইবে তাহা তাহাকে বুঝিতে সাহায্য করা এবং ঐ ধরণের বৃত্তি জোগাড় করিতে তাহাকে সাহায্য করা। ঐরূপ পরামর্শ ভালভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে লোকের বৃত্তিক্ষেত্রে কাজকর্মের মান উন্নততর হয়, তাহাদের উপার্জন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশংকা কম থাকে। বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই উপকার করে। আমাদের দেশে কাজ সংগ্রহের ব্যাপারে যোগ্যতা এবং কাজে তৃপ্তি পাওয়ার কথা সাধারণতঃ উঠিতেই পারে না, কারণ আমাদের মধ্যে বেকারসমস্যা এত প্রবল যে ঐসব কথা না ভাবিয়া যে যে কাজে ঢুকিবার সুযোগ পাইতেছে, সে সেই কাজেই ঢুকিয়া পড়িতেছে। তবুও অনেকেই কাজ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এইভাবে কোনরূপ বিচার না করিয়া কাজে ঢুকিবার চেষ্টা করায় বেকারসমস্যা না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। কাজ সংগ্রহের জন্য যেখানে প্রতিযোগিতা প্রবল সেখানে প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন, কোন্ ধরণের কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া তাহার সফল হইবার সম্ভাবনা বেশী, কারণ উপযুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারিলে সফলতার আশা বেশী থাকে। তারপর কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কাজকর্মের জন্য ছোটাছুটি করার ফলে আমাদের দেশে এক নূতন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন অনেক কাজ আছে (সাধারণতঃ যেসব কাজের কথা মোটামুটি সকলের জানা আছে—যেমন, কেরাণীর কাজ) যে সব কাজেব ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীর তুলনায় কাজের সংখ্যা অনেক কম। নিজের ক্ষমতা, অনুরাগ কোন কিছুর বিচার না করিয়া সকলেই সেখানে ভিড় জমাইতেছে। আবার আরও অনেক কাজ আছে (যে গুলির গুরুত্বের কথা হয়তো এখনও অনেকে জানে না—যেমন, ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের কাজ) যেগুলি উপযুক্ত লোকের অভাবে খালিই পড়িয়া থাকে। ফলে একদিকে যেমন অনেকে কাজ পাইতেছে না, অপরদিকে আবার অনেক কাজের জন্য উপযুক্ত লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই সমস্যা

আরও জটিল হইয়া পড়িতেছে। এমন কি উপযুক্ত লোকের অভাবে অনেক সময় পাঁচসালা পরিকল্পনার সফলতা ব্যাহত হইতেছে। বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দ্বারা এই সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব। আধুনিক শিল্পপ্রধান দেশে বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শের উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আমাদের দেশও যেভাবে শিল্পপ্রধান হইতে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে এই ধরণের কাজের উপর গুরুত্ব দিতেই হইবে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ ব্যতীত বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ সফল হইতে পারে না। বর্তমান কালে কাজকর্মগুলি এমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্ততঃ কিছুদিন ধরিয়া কোন নির্দিষ্ট কাজ শিক্ষা না করিলে সাধারণ শিক্ষা দ্বারা প্রায় কোন কাজ করার যোগ্যতা জন্মায় না। ফলে শিক্ষা শেষে বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ কার্যকরী হয় না। ধরা যাক. কাহাকেও যদি বি. এ. পাশ করার পর বলা হয় যে, সে যদি স্কুল ফাইন্যালের পর চার বৎসর কলেজে না পড়িয়া কারিগরী বিদ্যালয়ে তিন বৎসর ওভারসিয়ারী শিখিত তাহা হইলে বিনা চেষ্টায় সে ভাল কাজ পাইতে পারিত। কিন্তু সে পরামর্শ তাহার কোন কাজেই লাগে না। কারণ সে ত আবার তিন বৎসর নূতন করিয়া পড়িতে পারে না। এই পরামর্শ যদি সে স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর পাইত তাহা হইলে হয়ত তাহার জীবন ভিন্ন পথে চালিত হইতে পারিত। কাজেই নিজ নিজ অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি স্কুল-কলেজ হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ ব্যতীত বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ সফল হইতে পারে না।

অপরদিকে বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি ছাত্রের অনুরাগ বৃদ্ধি করে। শিক্ষা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রের যত আন্তরিক হইবে শিক্ষালাভ তত সহজ হইবে; ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কৈশোর ও যৌবনে ছাত্রদের মনে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা জাগে ইহাও আমরা জানি। অর্থোপার্জন করিয়া সমাজে দশ জনের একজন হইয়া বাস করার স্বপ্ন তাহারা দেখিতে আরম্ভ করে। এই বয়সে ছাত্রেরা তাহাদের পাঠের সহিত তাহাদের বৃত্তির সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে পাঠে তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং উহা তাহাদের নিকট অধিক অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। ফলে বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করে। এক কথায় শিক্ষা এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। একের সহায়তা ছাড়া অপরটি সফল হইতে পারে না। তাই বর্তমানে আমরা শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ

আলাদা আলাদা ভাবে না বলিয়া এক বাক্যাংশ (phrase) হিসাবে একই সঙ্গে শিক্ষা এবং বৃত্তি বিষয়ক কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। এক কথায় শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ বলিতে আমরা বুঝি যে, ছাত্রের বর্তমান শিক্ষাকে তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হিসাবে দেখিতে সাহায্য করা—তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। কার্যতঃ আমরা প্রত্যেক ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকাশের চেষ্টা করি। কোন্ দিকে তাহার ক্ষমতা ও অনুরাগের চরম বিকাশ লাভ হইতে পারে তাহা বুঝিতে তাহাকে সাহায্য করি। কোন্ বিশেষ বিষয় পড়িলে তাহার সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী এবং ঐ বিষয় পড়িলে ভবিষ্যতে সে কি ধরণের কাজ পাইতে পারিবে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহার শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্বন্ধে মনস্থির করিতে সাহায্য করি। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ; আনুষঙ্গিক কার্য হিসাবেই আমরা বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দিয়া থাকি। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নিজ নিজ অনুরাগ ও ক্ষমতা হিসাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষালাভে অধিকতর আগ্রহসৃষ্টি হইবে বলিয়াই আমরা তাহার শিক্ষার অনুকূল ভবিষ্যৎ বৃত্তির বিষয় আলোচনা করি ফলতঃ শিক্ষা এবং বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও অনুরাগ হিসাবে বিশেষ বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া দেওয়া। বহুমুখী বিদ্যালয়ে যে সাতটি বিষয় পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি উচ্চতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কোনও না কোন বৃত্তির জন্য অন্ততঃ কিছুটা প্রস্তুতি হইতেছে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ—স্বভাবতই বহুমুখী বিদ্যালয়ে ছাত্র নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহাকে বিশেষ বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের ধারণা যে, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের কাহার কোন্ বিষয়ে পাঠে আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে তাহা নির্ণয় করিয়া যথাযথ উপদেশ দিলেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। এই সম্বন্ধে প্রথম কথা মনে রাখিতে

হইবে যে, যত বৈজ্ঞানিক ভাবেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হউক না কেন মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং অনুরাগ নির্ভুলভাবে ধরা পড়িবে একথা বলে চলে না। আবার মানুষের কোন বিশেষ দিকে সহজাত ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকিলে তাহাকে চর্চার দ্বারা জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে বাস্তবজীবনে তাহা কার্যকরী হয় না। তাই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ক্ষমতা ও অনুরাগের পরিমাপের চেষ্টার চাইতেও উপযুক্ত সুযোগ ও প্রয়োজন মত সাহায্যের ভিতর দিয়া ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং অনুরাগ জাগাইয়া তোলার উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ সংস্থা অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ছাত্রের ক্ষমতা ও অনুরাগ জাগরিত হইয়া গেলে ইহা ব্যবহারের মধ্য দিয়া এমনভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে কোন্ দিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বা আগ্রহ তাহা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ছাড়াও ধরা পড়িয়া যায়। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে ছাত্র অনেকটা নিজ হইতেই আপন ক্ষমতা ও আগ্রহের অনুকূলে বিশেষ বিষয় বাছিয়া লইতে পারে। নিজ ক্ষমতা ও আগ্রহের অনুকূল কোন বিষয়ের পড়াশুনায় ছাত্র যদি কোন কারণে পিছাইয়া পড়িয়া থাকে, তবে তাহাকে বিশেষ সাহায্য দিয়া অগ্রসর করিয়া না দিতে পারিলে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ তাহার ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে না। ধরা যাক, যে ছাত্র বাংলা বা ইংরাজীতে স্বাভাবিক কারণেই ভাল নহে, অথচ যে ছাত্র বিজ্ঞানে ভাল এবং অঙ্কে যাহার ক্ষমতা আছে সে যদি দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্যই হউক, অঙ্কের শিক্ষকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক অঙ্ক শিক্ষায় পিছাইয়া পড়িয়া থাকে তবে তাহার অঙ্কের জ্ঞানের উন্নতি করার পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ে কোন সার্থক পরামর্শ দেওয়াই চলে না। তাই সহজাত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে সব ছাত্র যে কোন বিষয়ে পিছাইয়া আছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়া ঐ বিষয়ে অগ্রসর করিয়া দেওয়া শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ সংস্থার অন্যতম কাজ। শুধু তাহাই নহে অনেক সময় দেখা যায় যে, ছাত্রের ব্যবহারের পরিবর্তন করিতে না পারিলে তাহার পড়ার উন্নতি করাও সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অমনোযোগ, শিক্ষক-ঠকানো, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি অনভিপ্রেত ব্যবহার দূর করিতে না পারিলে ছাত্রের পড়াশুনায় উন্নতি করা সম্ভব নয়। আবার কোন কোন বিষয়ের (subject) পড়াশুনায় এবং কোন কোন বৃত্তির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন হয়। ধরা যাক, বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে

জিজ্ঞাসু মন এবং খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হয়। তাই বিধিবদ্ধ ভাবে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং তাহাদের অনভিপ্রেত ব্যবহার দূরীকরণের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ সংস্থার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—

১। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে বিশেষ পাঠ্য নির্বাচনে ছাত্রকে তাহার আগ্রহ, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্য করা হইল এই সংস্থার প্রধান কাজ। একাদশ শ্রেণীতে উঠিলে ছাত্রকে তাহার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বৃত্তিবিষয়ে মনস্থির করিতে সাহায্য করাও প্রয়োজন। যে ছাত্র নবম শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না বা যে একাদশ শ্রেণীতে পৌছিল না তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করাও একই সংস্থার কাজ।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ ছাত্রদের প্রত্যেকের সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ সার্থক হইতে পারে না।

৩। ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের অনভিপ্রেত ব্যবহার দূরীকরণ এবং প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলী গঠনকার্যে সাহায্য করিতে না পারিলে উপরোক্ত উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে হইলে নিম্নলিখিতভাবে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে—

১। সর্বপ্রথমেই ছাত্রদের ক্ষমতা ও অনুরাগ বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। "হবি ক্লাবের" (Hobby Club) মাধ্যমে এই চেষ্টা করা যাইতে পারে। যার যে কাজে স্বাভাবিক ক্ষমতা, যার যে কাজ করিতে বিশেষ আগ্রহ, হবিক্লাবে তাহাকে সে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। যাহার কোন কাজেই স্বাভাবিক দক্ষতা বা আগ্রহের প্রকাশ পায় নাই, তাহার সামনে বিভিন্ন ধরণের কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হইলে, ধীরে ধীরে সে কোনও না কোন দিকে আকৃষ্ট হয়—কোনও না কোন দিকে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। এমন লোক খুব কমই আছে যাহার কোন দিকেই স্বাভাবিক আগ্রহ বা দক্ষতা নাই।

বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে যার যে কাজে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের বিকাশ হইতেছে তাহাকে ঐ কাজ সম্বন্ধে আরও জ্ঞান দেওয়ার জন্য নানারকমের বই তাহার হাতের কাছে যোগাইয়া দেওয়া হয়। তাহার মনের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয় এবং কাজে অধিকতর দক্ষতা অর্জনে তাহাকে সাহায্য করা হয়। যে সব স্থানে ঐ সব কাজ উন্নত ধরণে হইতেছে, সেই সব স্থানে তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের ক্ষমতা ও আগ্রহের ক্ষেত্রে কি কি ধরণের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ধরণের শিক্ষাগ্রহণ করিলে কি কি ধরণের কাজকর্ম পাওয়া যাইতে পারে সে সব আলোচনাও ছাত্রদের সঙ্গে করা হয়।

২। তারপরের প্রশ্ন হইল যে, কাহার কোন্ দিকে ক্ষমতা ও আগ্রহের বিকাশ হইতেছে, কে কোন্ বিষয় কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিল, কাহার চরিত্রে কি কি গুণাবলী বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে রক্ষা করা। ছাত্রকে পরামর্শ দিতে হইলে তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য 'কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড' (Cummulative Record Card) রাখার ব্যবস্থা হইতেছে।

৩। শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ে পরামর্শ দিতে হইলে ছাত্র সম্বন্ধে যেমন সংবাদ রাখা প্রয়োজন, দেশে কি কি ধরণের শিক্ষাগ্রহণের এবং বৃত্তি সংগ্রহের সুযোগ আছে সে সংবাদ রাখাও তেমনি প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা বা বৃত্তির জন্য বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। একদিকে ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ ও সংগৃহীত জ্ঞান অপর দিকে ভবিষ্যৎ শিক্ষা বা বৃত্তির প্রয়োজন এই উভয়কে সামনা-সামনি না রাখিলে কি ধরণের শিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহা স্থির করা সম্ভব নহে। তাই দেশে যে যে প্রকার শিক্ষাগ্রহণ ও বৃত্তিসংস্থানের সুযোগ আছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। ছাত্র ও তাহার অভিভাবক যাহাতে ঐ সব সংবাদ জানিতে পারেন নানাভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। ছাত্রদের জন্য 'কেরিয়ার টক' (Career Talk) নামে এক বিশেষ ধরণের আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর 'গাইডেন্স কর্ণার' (Guidance Corner) নাম দিয়া স্কুলের কোন স্থানে স্থায়িভাবে গাইডেন্স সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য

পরিবেশণের ব্যবস্থা করা হয়। অভিভাবকদের জন্যও বিশেষ আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

৪। নবম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ছাত্রের বিশেষ বিষয় নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উপরোক্ত ধরণের কাজ চলিতে থাকে। 'টিচার কাউন্সিলার' (Teacher Counsellor) বা 'কেরিয়ার মাষ্টার' (Career Master) নামে এক বিশেষ ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক স্কুলে ঐ ধরণের কাজের ভার প্রাপ্ত হন। অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে 'টিচার কাউন্সিলার' প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিয়া নিম্ন-মাধ্যমিক পাঠ শেষে কে কি করিবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যাহারা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইয়া যাইবে তাহারা নবম শ্রেণীতে উঠিলে কে কোন্ বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে আসিয়া সব সময়েই টিচার কাউন্সিলারের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে টিচার কাউন্সিলার নিজেই আলোচনার জন্য অভিভাবকদের আমন্ত্রণ করেন। আলোচনাকালে ছাত্র সম্বন্ধে একত্রিত সকল তথ্য এবং দেশে শিক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তি প্রাপ্তির সুযোগ সম্বন্ধে সংগৃহীত সকল সংবাদ টিচার কাউন্সিলার ছাত্র এবং অভিভাবকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ছাত্র ভবিষ্যতে কোন্ বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিবে বা কোন্ বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে ছাত্রের ক্ষমতা, আগ্রহ, অর্জিত জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলীকে একদিকে রাখিয়া অপর দিকে সে যে বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিতে চায় বা যে বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে চায় তাহাতে সফলতা অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করিয়া দেখিতে হয়। ধরা যাউক, কোন ছাত্র বিশেষ বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান পড়িতে চায়। বিজ্ঞান শিক্ষার সফলতা অর্জন করিতে হইলে সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করার ক্ষমতা (Numerical ability), বৈজ্ঞানিক প্রবণতা (Scientific aptitude) গণিতে জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। ছাত্রের ঐসব ক্ষমতা, জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে আছে কিনা বিচার করার পর তাহার বিজ্ঞান পাঠের যোগত্যা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য টিচার কাউন্সিলার কখনও তাঁহার মতামত ছাত্র ও তাহার

অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধে তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি ছাত্র ও অভিভাবকের কাছে উপস্থাপিত করিবেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার মতামতও জানাইবেন। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার দায়িত্ব ছাত্র ও তাহার অভিভাবকের উপরই থাকিবে।

৫। অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্র সম্বন্ধে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও নূতন তথ্য টিচার কাউন্সিলারকে উপরোক্ত আলোচনার জন্য সংগ্রহ করিতে হয়। যেমন, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা জানিবার চেষ্টা করিতে হয় তেমনি ছাত্রের অভিভাবক তাহাকে কোন্ বিশেষ্ বিষয় পড়াইতে ইচ্ছুক প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ লইতে হয়।

৬। ছাত্র নবম শ্রেণীতে উঠিয়া বিশেষ পাঠের বিষয় নির্ধারণ করিয়া লইবার পরও টিচার কাউন্সিলারকে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নবম শ্রেণীতে উঠিলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ব্যবধানে বারবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় যে, যে ছাত্র যে বিশেষ পাঠের বিষয় নির্বাচন করিয়াছে তাহা তাহার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা। নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভুলের সম্ভাবনা একেবারে এড়ানো যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত অসুবিধা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা হয়; কোন ছাত্রের নির্বাচনে ভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিলে নবম শ্রেণীতে পাঠের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে বিশের পাঠের বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ দিতে হয়।

৭। দশম ও একাদশ শ্রেণীতে স্কুল ফাইন্যালের পর কে কি করিবে, কে কোন লাইনে পড়াশুনা করিবে এ বিষয়ে মনস্থির করিবার উদ্দেশ্যে একই পদ্ধতিতে প্রস্তুতি চলে।

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ—শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ-দানের চেষ্টা আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে নূতন ধরণের কাজ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা এবং শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান দুই আলাদা ধরণের কাজ নহে—উহারা একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শের কাজ ভাল ভাবে চলিলে, ইহা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নততর করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। নিজ নিজ

ক্ষমতানুযায়ী পাঠের বিষয় নির্বাচনে ভুল না হইলে পাঠ ছাত্রের পক্ষে সহজতর হইবে এবং স্কুলের পাঠের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে পাঠে তাহার আগ্রহ অনেকগুণে বৃদ্ধি পাইবে। অপর দিকে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড রাখিলে ইহা যেমন ছাত্রকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করিবে, তেমনি শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্যেও কাজে লাগিবে। তারপর বিদ্যালয়ে চারিত্রিক গুণাবলী গঠনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে এবং পিছাইয়া পড়া ছাত্রদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাহায্য দিয়া আগাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে ইহারা যেমন বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নততর করিবে তেমনি শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক সাহায্যদানে কাজে লাগিবে। এক কথায় ছাত্রের শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ একই কাজের দুই দিক ; ইহারা একই সঙ্গে চলিবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়া ইহারা উভয়ই সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে।

শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন।— মুদালিয়র কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ-সংস্থা গঠনে অগ্রণী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক ষ্টেটে একটি করিয়া 'ষ্টেট বুরো অব এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশেন্যাল গাইডেন্স' (State Bureau of Educational & Vocational Guidance) স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন এবং দিল্লীতে 'সেণ্ট্রাল বুরো অব এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশেন্যাল গাইডেন্স' স্থাপন করেন। প্রত্যেক ষ্টেটে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়িয়া তোলার দায়িত্ব প্রধানতঃ ষ্টেট বুরোর উপর ন্যস্ত হয়। সকল ষ্টেটে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই এবং ষ্টেট বুরোও স্থাপিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেট বুরো স্থাপনে আর্থিক সাহায্যদানে অগ্রণী হইবার পূর্বেই পশ্চিম বাংলা সরকার আরও ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া ঐ ধরণের সংস্থা গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। শিক্ষাদান কার্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে না হইলে, শিক্ষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আধুনিকতম যন্ত্রপাতি (Tools) ব্যবহার না করিলে কোন শিক্ষাসংস্কারই সফল হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের সরকার স্থিরনিশ্চয় হন এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজে 'বুরো অব্ এডুকেশন এ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ' স্থাপিত করেন। স্বভাবতই বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করার

২২

দায়িত্ব এই বুরোর উপর ন্যস্ত হয়—উহা তাহার অপরাপর কার্যের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ষ্টেট বুরো অব্ এডুকেশন এ্যাণ্ড ভোকেশেন্যাল গাইডেন্স' হিসাবে কাজ করিতে আরম্ভ করে। সব ষ্টেটের গাইডেন্স বুরো যে একভাবে কাজ করিতেছে এমন নহে। পশ্চিম বাংলার গাইডেন্স বুরো যে সব কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এখানে শুধু তাহারই আলোচনা হইল।

পশ্চিম বাংলার ষ্টেট বুরোর কাজকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) ইহার প্রথম কাজ হইল স্কুলে স্কুলে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শের কাজ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools) প্রস্তুত করা। পশ্চিম বাংলার ষ্টেট্ বুরো সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছে :—

(ক) ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, অর্জিত জ্ঞান ও আগ্রহ মাপিবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। (খ) ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উপযুক্ত পুস্তক রচনা ও (গ) ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক তথ্য পরিবেশনের জন্য পোষ্টার প্রভৃতি এবং ফিল্ম ষ্ট্রিপ্।

(২) শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ দানের কার্যে যে সব কর্মীর প্রয়োজন তাহাদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও ষ্টেট্ বুরোর উপর ন্যস্ত।

(৩) সমগ্র ষ্টেটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্য চলিতেছে কিনা সে দিকেও ষ্টেট বুরোর দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(৪) সর্বশেষে শিক্ষা ও বৃত্তিবিষয়ক পরামর্শদান কার্যে যাহাতে নবতম বৈজ্ঞানিক সত্য এবং উন্নততম যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলিতে পারে তার জন্য ষ্টেট বুরোকে অবিরত গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইতে হয়।

শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান কার্যের সংগঠনে ষ্টেট বুরোর পর আঞ্চলিক বুরোর স্থান। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ কুড়িটি স্কুলের শিক্ষা বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের কার্যে সহযোগিতা করার জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক বুরো স্থাপিত হইবে। আঞ্চলিক বুরোর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ :—

(ক) আঞ্চলিক বুরো হইবে বিদ্যালয় ও ষ্টেট বুরোর মধ্যে যোগসূত্র। ষ্টেট বুরোর প্রস্তুত 'যন্ত্রপাতি' আঞ্চলিক বুরোর প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হইবে।

(খ) আঞ্চলিক বুরো উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শদান সংস্থার বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করিবে। বিদ্যালয়ে গিয়া ঐ সংস্থার কাজে যখন যেমন প্রয়োজন তেমনই সাহায্য দানের চেষ্টা করিবে।

(গ) ষ্টেট বুরোর সহিত ইহা সর্বপ্রকার গবেষণা কার্যে সহযোগিতা করিবে এবং নিজের প্রয়োজন অনুসারে গবেষণাকার্য চালাইবে। পশ্চিম বাংলায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য কলিকাতায় একটি বেসরকারী বুরো ব্যতীত ঐরূপ আঞ্চলিক বুরো এখনও স্থাপিত হয় নাই। আশা করা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সরকার ঐ ধরণের বুরো স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। আঞ্চলিক বুরো স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারীভাবে এখনও গৃহীত না হওয়ার দরুণ ষ্টেট বুরো আঞ্চলিক বুরোর কর্মীদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনও করেন নাই।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের জন্য 'স্কুল গাইডেন্স কমিটি' (School Guidance Committee) নাম দিয়া এক বিশেষ সংস্থা গঠন করা হইতেছে। পশ্চিম বাংলায় স্কুল গাইডেন্স কমিটি নিয়লিখিতরূপে গঠিত হইতেছে :—

১। প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা (সভাপতি)
২। শিক্ষকদের প্রতিনিধি (সভ্য)
৩। অভিভাবকদের প্রতিনিধি (সভ্য)
৪। টিচার কাউন্সিলার (সেক্রেটারী)

শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতিনিধির সংখ্যা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু স্থির হয় নাই। ঐ প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন ইহাও নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। বিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতিনিধির সংখ্যা এবং তাঁহারা নির্বাচিত কি মনোনীত হইবেন তাহা স্থির করিবে।

স্কুল গাইডেন্স কমিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দানের দায়িত্ব বহন করিবে। বৎসরে ইহার অন্যূন তিন বা চার বার অধিবেশন ডাকা হইবে। ঐ সব

অধিবেশনে টিচার কাউন্সিলার ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের গাইডেন্স-সংক্রান্ত কাজকর্মের পরিকল্পনা পেশ করিবেন। পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর টিচার কাউন্সিলার অন্যান্য শিক্ষকের সাহায্যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

অনুশীলনী

1. What are the main types of Schools in India and what are their distinctive functions ? (B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৩২০। See also chapter III.)

Q. 2. Describe fully the present system of Secondary Education in West Bengal, and examine critically the measure that are being adopted by the State for its improvement. (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ৩২০ ; ৩২৪—৩২৬ ; ৩৩০—৩৩৬)

Q. 3. Describe a Multi-purpose School as it is expected to function under favourable circumstances in this country. How have the government of India differed from the recommendations of the Secondary Education Commission in respect of the reorganisation of Secondary Education ? (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৩১৬—৩১৯ ; See also the chapter on Curriculum IV.).

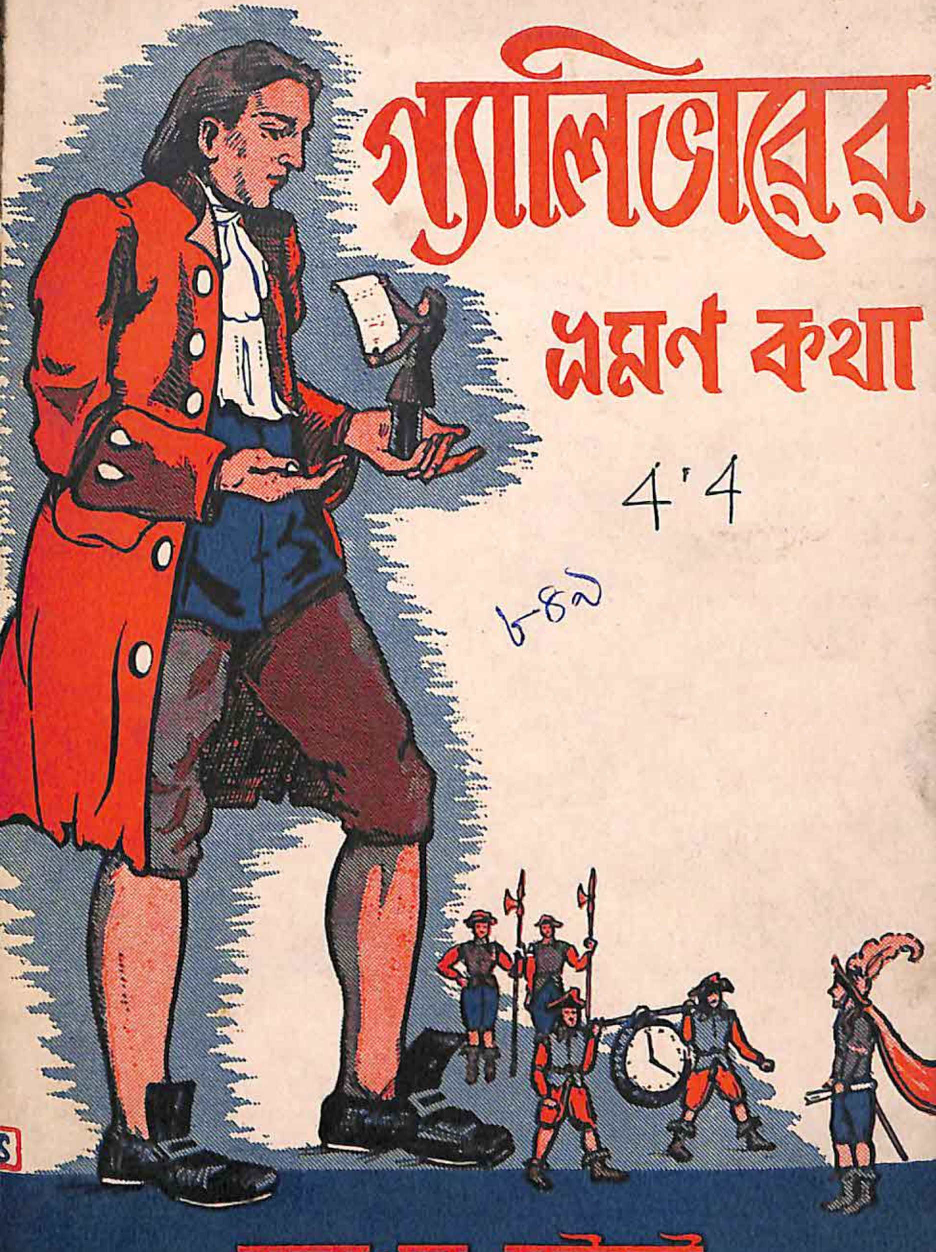
Q. 4. What are the different types of Schools at present in West Bengal ? Indicate briefly their distinctive functions. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৩২০। See also chapter III.)

Q. 5. Indicate the importance of *guidance* in the education of a child. Show that *guidance* is not the work of a few specialists only but rather a service in which the entire school staff as well as the members of the home must co-operate. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৩২৬—৩৩৭)

গ্যালিভারের ভ্রমণ কথা



জনাথন সুইফ্ট